দ্য ভ্যালি অফ ফিয়ার

আর্থার কোনান ডয়েল

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড 3

হুঁশিয়ারি 3

আলোচনায় বসলেন মি. শার্লক হোমস 20

বির্লস্টোন ট্র্যাজেডি 37

অন্ধকার 53

নাটকের পাত্রপাত্রী 73

প্রকাশমান সত্য 96

সমাধান 117

দ্বিতীয় খণ্ড 146

লোকটা 146

বডিমাস্টার 163

লজ ৩৪১, ভারমিসা 197

ভ্যালি অফ ফিয়ার 226

নীরন্ধ্রতম অন্ধকার মুহূর্ত 245
বিপদ 267
ফাঁদে পড়ল বার্ডি এডোয়ার্ডস 286
উপসংহার 304

প্রথম খণ্ড

বির্লস্টোন ট্র্যাজেডি

হুঁশিয়ারি

আমি ভাবতে বাধ্য হচ্ছি যে–বললাম আমি।

অধীর কণ্ঠে বলল শার্লক হোমস–আমিও তাই ভাবতাম।

মরদেহদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশিদিন যন্ত্রণা সয়ে আছি, এ-বিশ্বাস আমার আছে। তাও সেদিনকার শ্লেষবঙ্কিম বাধাপ্রদানে মেজাজ খিচড়ে গেল।

কড়াগলায় বললাম, হোমস, মাঝে মাঝে সত্যিই তোমাকে বরদাস্ত করা যায় না।

হোমস তখন নিজের চিন্তাতেই এমন ঝুঁদ হয়ে রয়েছে যে আমার প্রতিবাদের তক্ষুনি কোনো জবাব দিল না। প্রাতরাশ তখনও মুখে তোলেনি। খাম থেকে সদ্য-বার-করা কাগজের টুকরোটির দিকে অনিমেষে চেয়ে আছে হাতের ওপর ভর দিয়ে। তারপর খামটা তুলে নিল, আলোর সামনে ধরে খুব হিসেবি চোখে বাইরের দিকটা এবং পেটির-মতো-ঝুলে-থাকা আঠা লাগানোর জায়গাটা দেখল।

বলল চিন্তামগ্ন কণ্ঠে, এ যে দেখছি পোর্লকের হাতের লেখা। বারদুয়েক এ হাতের লেখা আগে দেখেছি, তবুও এটা পোর্লকেরই হাতের লেখা–গ্রিক eর বাহারি চুড়োটাই ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এ-চিঠি যদি পোর্লকের হয়, তবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটেছে নিশ্চয়।।

কথাগুলো হোমস যেন আমাকে বলছে না, নিজের মনেই বলে যাচ্ছে। আমার বিরক্তি উবে গিয়ে কৌতূহল হল। কী বলতে চায় হোমস?

জিজ্ঞেস করলাম, পোর্লক লোকটা তাহলে কে?

ওয়াটসন পোর্লক একটা ছদ্মনাম, শনাক্তকরণের নিছক একটা চিহ্ন। কিন্তু এ-নামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে ভারি পিচ্ছিল ফন্দিবাজ একটি ব্যক্তিত্ব। এর আগে একটা চিঠি লিখে স্পষ্টই জানিয়েছিল আমাকে, নামটা তার নিজের নয়–বিরাট এই শহরের লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে লুকিয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়েছে সেই থেকে। পোর্লক গুরুত্বপূর্ণ নিজের জন্যে নয়–বিরাট এক পুরুষের সংস্পর্শে আছে বলেই যা কিছু তার গুরুত্ব। ভয়ংকরের সান্নিধ্যে থেকেও যারা অকিঞ্চিৎকর, সে তাই, যেমন হাঙরের সঙ্গে পাইলট-মাছ, সিংহের সঙ্গে শেয়াল। শুধু ভয়ংকর নয় ওয়াটসন অত্যন্ত করাল বলতে যা বোঝায়, তাই। আর, সেই হিসেবেই আসছে সে আমার আওতায়। প্রফেসর মরিয়ার্টির কথা আমার মুখে শুনেছ মনে আছে?

বিখ্যাত সেই সায়েন্টিফিক ক্রিমিন্যাল তো? বদমাশ জালিয়াতদের মধ্যে অতি বিখ্যাত—

বিড়বিড় করে হোমস বললে, কী লজ্জা! কী লজ্জা! আমার মন্তব্যটা মনে ধরেনি ওর।

আমি বলতে চাইছিলাম–বদমাশ জালিয়াতদের মধ্যে অতি সুবিখ্যাত হয়েও জনসাধারণের কাছে যে এখনও অজ্ঞাত।

শেষটা ভালোই বলেছ, সোল্লাসে বললে হোমস, তবে কী জানো আজকাল তোমার কৌতুকবোধের মধ্যে শঠতার প্যাচ থাকছে ভীষণ চমকে দাও। এখন থেকে দেখছি সাবধান থাকতে হবে। নইলে কুপোকাত হতে হবে। কিন্তু মরিয়ার্টিকে ক্রিমিন্যাল বলে তুমি আইনের চোখে অন্যায় করছ মিথ্যা অপবাদের অপরাধে অপরাধী হচ্ছ–কেননা মরিয়ার্টি নামের সঙ্গে অনেক গৌরব, অনেক বিস্ময় জড়িয়ে আছে। দুনিয়ায় এত বড়ড়া চক্রান্তকারী আর জন্মায়নি, সংসারের যাবতীয় শয়তানি সংগঠনে যার জুড়ি নেই, নীচের মহলের যাবতীয় কর্মকাণ্ড যার অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হয়–এ সেই ব্রেন একটা জাতকে গড়তে পারে, ধ্বংসও করতে পারে–একটা গোটা জাতের ভাগ্যনিয়ন্তা হবার ক্ষমতা রাখে। মরিয়ার্টি সেই লোক। এত করেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে, সাধারণের সন্দেহের ঊর্ধ্বে, গালিগালাজ সমালোচনার নাগাল থেকে অনেক দুরে। নিজেকে ধোয়া তুলসীপাতার মতো পবিত্র রাখতে আর এই বিরাট কাণ্ডকারখানার পরিচালনায় তার দক্ষতা এতই তুঙ্গে পৌঁছেছে যে তোমার এই আলগা মন্তব্যটির দরুন অনায়াসেই সে তোমায় কোর্টে টেনে নিয়ে যেতে পারে এবং চরিত্রে মিথ্যা কলঙ্ক লেপনের অভিযোগে ক্ষতিপূরণ বাবদ তোমার বেশ কয়েক বছরের পেনশন পকেটস্থ করতে পারে। গ্রহাণুপুঞ্জের গতিবিজ্ঞান বইখানা কিন্তু তারই লেখা। অনেক উঁচুদরের অতি সূক্ষ্ম

গণিতবিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছে এই বইটিতে। শোনা যায়, বইখানার ওপর কলম ধরবার মততা, সমালোচনা করার মতো লোকই নাকি বিজ্ঞান সংবাদদাতাদের মধ্যে পাওয়া যায়নি। এহেন লোকের দুর্নাম করা কি সম্ভব? লোকে বলবে ডাক্তার ওয়াটসনটা তো দেখছি নিজে নোংরা! প্রফেসরের গায়ে কালি ছিটোচ্ছেন? ওইরকম একজন প্রতিভার নামে যা মুখে আসে তাই বলছেন? ওয়াটসন, একেই বলে প্রতিভা! যাই হোক, ছুটকো প্রতিভাগুলো যদি আমাকে রেহাই দিত, টক্কর দেওয়া যেত বড়ো প্রতিভাটার সঙ্গে। সেদিন আসবেই জেনো।

আন্তরিকভাবে বললাম, সেদিন যেন আমিও থাকি। কিন্তু তুমি পোর্লক সম্বন্ধে কী বলছিলে যেন?

ও হ্যাঁ, তথাকথিত পোর্লক এই বিরাট শেকলের একটা নগণ্য আংটা। শেকলটা যেখানে লেগে–সেখান থেকে কিছু দূরেই এর অবস্থান। তোমাকেই বলি, আংটা হিসেবে পোর্লক খুব শক্ত নয়। বাজিয়ে দেখেছি, শেকলটার একমাত্র কমজোরি আংটা হোল এই পোর্লক।

তাহলে সে-শেকল যত মজবুতই হোক না কেন–কমজোরি আংটার মতোই তো নিজেও কমজোরি।

ভায়া ওয়াটসন, খাঁটি কথা বলেছ। পোর্লকের অসামান্য গুরুত্ব তো সেই কারণেই। মাঝে মাঝে ওর উচ্চাশার অঙ্কুরে হাওয়া দিই, গোপন ইচ্ছাকে তাতিয়ে তুলি। দশ পাউন্ডের নোট পাঠিয়ে দিই, তাতেই বার-দুয়েক যে-অগ্রিম খবর পাঠিয়েছে তা অপরাধ নিবারণে

বেশ কাজে এসেছে। অপরাধ হয়ে যাওয়ার পর আইনের কাঁটা দিয়ে শোধ তোলার চাইতে যা অনেক বেশি মূল্যবান। গুপ্ত লিখনের সংকেতটুকু ধরতে পারলে কিন্তু এ-চিঠির মধ্যেও ওই ধরনের দামি খবর মিলতে পারে।

এঁটো-না-হওয়া প্লেটের ওপর কাগজটা ফের বিছিয়ে ধরল হোমস। উঠে গিয়ে অদ্ভুত হরফ আর সংখ্যাগুলো দেখলাম আমি।

মানেটা কী হোমস?

গুপ্ত খবর পাচারের চেষ্টা।

কিন্তু গুপ্তসংকেত ছাড়া গুপ্ত লিখন তো অর্থহীন!

এক্ষেত্রে তাই বটে।

এক্ষেত্রে বললে কেন?

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমে অনেক সময়ে এমন অনেক হেঁয়ালি বিজ্ঞাপন বেরোয় যা কার লেখা ধরা মুশকিল। আমি কিন্তু গড় গড় করে তার মানে বলে যেতে পারি। গুপ্তলিখনের এসব স্থূল পদ্ধতি দেখে মজা পাই, ক্লান্ত হই না। এটা কিন্তু একেবারেই

আলাদা ব্যাপার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে একটা বইয়ের পৃষ্ঠায় কতকগুলো শব্দের নির্দেশ রয়েছে। কোন বইয়ের কোন পৃষ্ঠার কথা বলা হয়েছে না-জানা পর্যন্ত আমি অসহায়।

বির্লস্টোন আর ডগলাস শব্দ দুটো বসানো হল কেন?

বইয়ের ওই পৃষ্ঠায় এ-শব্দ নেই বলে।

বইটার নাম তাহলে সংকেতে বলা হল না কেন?

ভায়া ওয়াটসন, তোমার একটা সহজাত ধূর্ততা আছে–যা তোমার বন্ধুবান্ধবের কাছে আনন্দের খোরাক গুপ্তলিখন আর গুপ্তসংকেত একই খামের মধ্যে কি তুমিও পাঠাতে? দৈবাৎ যদি বেহাত হয় তোমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে ভাবো তো? কাজেই আলাদা আলাদা খামেই যাওয়া উচিত গুপ্তলিখন আর গুপ্তসংকেত–তাতে সর্বনাশের সম্ভাবনা থাকছে না। হারিয়ে গেলেও দুটো আলাদা হেঁয়ালি থেকে যাচ্ছে। ক্ষতি কিছুই হচ্ছে না। দু-নম্বর চিঠি আসার সময় কিন্তু হয়ে গেছে। হয় তাতে আরও ব্যাখ্যা থাকবে, না হয় যে-বই সম্পর্কে অঙ্কগুলো বসানো হয়েছে–সোজাসুজি তার উল্লেখ থাকবে। শেষেরটার সম্ভাবনাই বেশি।

হোমসের হিসেব সত্যি হল মিনিট কয়েকের মধ্যেই। যে-চিঠির জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষা, ছোকরা চাকর বিলি সেই চিঠি নিয়ে আবির্ভূত হল ঘরে।

খাম খুলতে খুলতে বললে হোমস, একই হাতের লেখা। চিঠি বার করে উল্লসিত কণ্ঠে, সইও করেছে। ওয়াটসন, কাজ ভালোই এগুচ্ছে দেখছি।

চিঠি পড়েই মেঘাচ্ছন্ন হল ললাট।

সর্বনাশ! হতাশ হলাম। এ-রকমটা তো আশা করিনি! ওয়াটসন, যা ভেবেছিলাম তার কিছুই তো দেখছি হল না। পোর্লক লোকটার সর্বনাশ না-হলেই বাঁচি।

শোননা কী লিখেছে–প্রিয় মি. হোমস, এ-প্রসঙ্গে আর এগুবো না। ভীষণ বিপজ্জনক। আমাকে সন্দেহ করেছেন উনি। স্পষ্ট দেখছি ওঁর সন্দেহ। গুপ্তসংকেতের মূল সূত্রটা পাঠাব বলে এই খামের ওপর আপনার নাম-ঠিকানা লেখবার পরেই দুম করে এসে হাজির হলেন উনি। একেবারেই অপ্রত্যাশিত। কোনোরকমে লুকিয়ে ফেলি খামটা। ওঁর চোখে পড়লে আমার কী হত আমিই জানি। কিন্তু ওঁর চোখে সন্দেহ দেখেছি। গুগুলিখন পুড়িয়ে ফেলবেন–এই পরিস্থিতিতে আপনার কাজে লাগবে নাফ্রেড পোর্লক।

চুপ করে কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইল হোমস। চিঠিখানা দলাইমলাই হতে লাগল আঙুলের ফাঁকে।

তারপর বললে, হয়তো আসলে কিছুই নয়। স্রেফ ছায়া দেখে চমকানি। জ্ঞানপাপী তো, নিজে বিশ্বাসহন্তা বলেই মনে করে সবাই সন্দেহ করছে।

উনি বলতে নিশ্চয় প্রফেসর মরিয়ার্টি?

আর কে। ওদের উনি মানে একজনই–তাবৎ দুনিয়ায় যার জুড়ি নেই।

কিন্তু উনি করবেনটা কী?

হুম! বিরাট প্রশ্ন। ইউরোপের প্রথম শ্রেণির একটা ব্রেন দুনিয়ার সমস্ত অন্ধকার নিজের পেছনে জড়ো করে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে জানবে অনন্ত ঘটনা ঘটতে পারে। যাই হোক ভয়ের চোটে বন্ধুবর পোর্লকের ধাত ছেড়ে গিয়েছে দেখা যাচ্ছে। চিঠির হাতের লেখার সঙ্গে খামের ওপরকার হাতের লেখা মিলিয়ে দেখো। ওঁর করাল আবির্ভাবের ঠিক আগেই লেখা হয়েছিল খামের ঠিকানা স্পষ্টভাবে, দৃঢ়ভাবে। কিন্তু চিঠি লেখা হয়েছে কাঁপা-কাঁপা হাতে পড়াই যাচ্ছে না।

চিঠি লেখার দরকার কী ছিল? না-লিখলেই পারত।

ভয়ের চোটে লিখেছে। ভেবেছিল, প্রথম চিঠি পেয়ে খোঁজখবর নেবই–আরও বিপদে ফেলব বেচারাকে।

তা ঠিক, প্রথমে গুপ্তলিখনটা তুলে নিয়ে বিছিয়ে ধরলাম হাঁটুর ওপর। চেয়ে রইলাম ভুরু কুঁচকে। গুরুত্বপূর্ণ একটা গুপ্ত ব্যাপার সামান্য এই কাগজখানার মধ্যে রয়েছে, অথচ রহস্যভেদ করার ক্ষমতা মানুষের নেই ভাবলেও মাথা খারাপ হয়ে যায়।

প্রাতরাশ একেবারেই মুখে তোলেনি শার্লক হোমস। এখন তা পাশে সরিয়ে দিয়ে নিগুঢ়তম চিন্তার সঙ্গী অখাদ্য পাইপ তুলে নিয়ে অগ্নিসংযোগ করল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কড়িকাঠের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে বললে, আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! রহস্য সমাধানের সূত্র নিশ্চয় আছে কাগজটায়। কিন্তু তোমার ম্যাকিয়াভেলিয়ান*৬ বুদ্ধিমত্তায় তা ধরা পড়েনি। স্রেফ যুক্তির আলোয় গোড়া থেকে বিচার করা যাক হেঁয়ালিটার। লোকটা একখানা বইয়ের উল্লেখ করছে। যুক্তির শুরু হোক এই পয়েন্ট থেকেই।

পয়েন্টটা কিন্তু অস্পষ্ট।

মানছি, কিন্তু দেখাই যাক না পরিসরটাকে সংকীর্ণ করা যায় কিনা। মনটাকে পুরো রাখলাম পয়েন্টের ওপরে রেখেও দেখছি বিলক্ষণ দুর্ভেদ্য। কী ধরনের বই সে-সম্বন্ধে কোনো ইঙ্গিত আছে কি?

না।

বেশ বেশ অতটা হতাশ হবার কারণ দেখছি না। গুপ্ত লিখন শুরু হয়েছে একটা বড়ো সংখ্যা দিয়ে–৫৩৪, তাই না? স্রেফ অনুমিতি হলেও এই তথ্যের ভিত্তিতে এগোনো যাক, ধরে নিলাম ৫৩৪ একটি পৃষ্ঠাসংখ্যা–যে-বইটির কথা বলতে চায় পোর্লক–সেই বইয়ের

পৃষ্ঠাসংখ্যা। তাহলেও দেখ বইটা আয়তনে বেশ বড়ো–এটা কিন্তু কম পাওয়া নয়। বিশাল এই বইটা কী ধরনের সে-সম্বন্ধে আর কোনো ইঙ্গিত আছে কি? পরের চিহ্নটা দেখছি C2। ওয়াটসন, বলো কী বুঝলে?

দ্বিতীয় অধ্যায় নিশ্চয়।

মমাটেই তা নয়। একটা কথা মানছ তো যে, পৃষ্ঠাসংখ্যা দিলে পরিচ্ছদের সংখ্যা দেওয়ার আর দরকার হয় না। আরও দেখো, ৫৩৪ পৃষ্ঠাসংখ্যা যদি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পড়ে, তাহলে প্রথম পরিচ্ছেদটা নিশ্চয় অসহ্য রকমের দীর্ঘ।

কলম! বললাম চিৎকার করে।

ব্রিলিয়ান্ট, ওয়াটসন। আজ দেখছি বুদ্ধি তোমার ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। কলম না-হলে বুঝতে হবে দারুণ ঠকলাম। তাহলে দেখো বইখানা বেশ বড়ো, দু-কলমে ছাপা প্রতিটি পৃষ্ঠা এবং প্রত্যেকটা কলম রীতিমতো লম্বা কেননা একটা শব্দের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে দু-শো তিরানব্বই। যুক্তির দৌড় কি এবার শেষ?

আমার তাই মনে হয়।

নিজের ওপর একটা অবিচার করলে? ভায়া ওয়াটসন, এই নাও আজ একটা চমক। আর একটা মগজ-তরঙ্গ। বইটা অসাধারণ কিছু হলে পাঠিয়েই দিত আমার কাছে। তার

বদলে পোর্লকের ইচ্ছে ছিল খামের মধ্যে সংকেত সূত্র পাঠাবে–প্ল্যান ভন্ডুল হবার আগে ইচ্ছে ছিল তাই। চিঠিতেও দেখো তাই লিখেছে। এ থেকে স্বভাবতই মনে হয়, ও ভেবে নিয়েছিল বইটি পেতে আমার অসুবিধে হবে না। বইখানা তার কাছেই আছে এবং ধরে নিয়েছিল আমার কাছেও আছে। ওয়াটসন, সংক্ষেপে বলি–বইটা অতি মামুলি।

কথাগুলো খুবই সম্ভাব্য মনে হচ্ছে।

তদন্ত তাহলে সংকুচিত হয়ে এল দু-কলমে ছাপা সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী একটা বড়ো বইয়ের ওপর।

বাইবেল! বললাম বিজয়োল্লাসে।

চমৎকার বলেছ ওয়াটসন! তবে কী জানো, খুব চমৎকার বলোনি। অভিনন্দনটা আমি নিজেও যদি নিই, মরিয়ার্টির এক শাকরেদ হাতের কাছে বাইবেল নিয়ে বসে আছে, এমন কথা বলতে পারব কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া বাইবেলের এত অসংখ্য সংস্করণ বেরিয়েছে যে দুটো কপির পৃষ্ঠাসংখ্যা এক হবে এমনটা আশা করা যায় না। সুতরাং এমন একটা বইয়ের কথা বলতে চেয়েছে পোর্লক যা ঘরে ঘরে আছে। সে জানে তার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠা হুবহু মিলে যাবে আমার বইয়ের ৫৩৪ পৃষ্ঠাসংখ্যার সঙ্গে।

কিন্তু ৫৩৪ পৃষ্ঠাওলা বই খুব কমই আছে।

ঠিক কথা। আমাদের নাকানিচোবানির অন্ত তো সেইখানেই। তদন্ত পরিসর তাহলে ছোটো হয়ে এল এমন খানকয়েক নির্ধারিত মানের বইয়ে যা ঘরে ঘরে রাখা যায়, যে-কেউ কিনতে পারে।

ব্র্যাডশ!

একটু অসুবিধে আছে, ওয়াটসন। ব্র্যাডশ-য় যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা সংক্ষিপ্ত, জোরালো, কিন্তু সীমিত। হরেকরকম শব্দের অভাব। সাধারণ খবর পাঠানোর উপযুক্ত শব্দ ওখান থেকে জোগাড় করা কঠিন। ব্র্যাডশ তাই বাদ গেল। একই কারণে অভিধানকে নাকচ করলাম। তাহলে কী রইল বলো তো?

পাঁজি।

অতি চমৎকার বলেছ, ওয়াটসন! পয়েন্টটা ধরতে না-পারলে খুবই অবাক হতাম। পাঁজি! হুইটেকারের পাঁজি নিয়ে বসা যাক। ঘরে ঘরে আছে। পৃষ্ঠাসংখ্যাও প্রচুর। দু-কলমে ছাপা। আগেকার সংস্করণগুলোয় বাকসংযম দেখালেও শেষের দিকে একটু বাচাল হয়েছে জানি। টেবিল থেকে বইখানা তুলে নিল হোমস। এই হল ৫৩৪ পৃষ্ঠা, দু-নম্বর কলম, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পদ-সমৃদ্ধি নিয়ে অনেককিছুই লেখা হয়েছে দেখছি। শব্দগুলো লিখে নাও, ওয়াটসন। তেরো নম্বর হল মারাঠা। শুরুটা খুব শুভ বলে মনে হচ্ছে না। এক-শো সাতাশ শব্দ সংখ্যা হল গভর্নমেন্ট। কিছুটা মানে অবশ্য আছে শব্দটার, তবে আমাদের আর প্রফেসর মরিয়ার্টির দিক থেকে একটু অপ্রাসঙ্গিক

খাপছাড়া। নাও, আবার চেষ্টা করা যাক। মারাঠা গভর্নমেন্ট করছে কী দেখা যাক। আরে গেলে যা। পরের শব্দ দেখছি শুয়োরের খাড়া-খাড়া শক্ত ছোটো চুল। গেল গেল, সব গেল ওয়াটসন! বারোটা বেজে গেল বুদ্ধির খেলার!

ঠাট্টাচ্ছলে বললেও ঘন ভুরুর মুচড়ে-ওঠা দেখে বুঝলাম ভেতরে ভেতরে বেচারি কীরকম হতাশ হয়েছে, মেজাজও তিরিক্ষে হয়েছে। মনটা আমারও খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু আমার তো কিছু করার নেই। অসহায়ভাবে আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর নীরবতা ভঙ্গ হল শার্লক হোমসের আচমকা চিৎকারে। সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠে তিরের মতো ছিটকে গেল তাকের দিকে এবং হলদে মলাট দেওয়া আর একখানা বই নিয়ে ফিরে এল চেয়ারে।

বললে চিৎকার করে, বেশি আধুনিক হয়ে গেছিলাম তো তাই মাশুল দিতে হয়েছে। সময়ের সঙ্গেসঙ্গে তাল মিলিয়ে না-চলে যারা এগিয়ে যায় গুনাগার দিতে হয় তাদেরই– আমরা ব্যতিক্রম নই। আজ হল গিয়ে সাতুই জানুয়ারি, কাজেই নতুন পঞ্জিকা নিয়ে পাতা উলটেছি, কিন্তু পোর্লক নিশ্চয় পুরোনো পঞ্জিকার পৃষ্ঠা দেখে লিখেছে গুপ্তলিখন। সংকেতসূত্র ব্যাখ্যা করার সময়ে অবশ্যই তা বলত। এবার দেখা যাক ৫৩৪ পৃষ্ঠায় কীরকম খবর পাওয়া যায়। তেরো নম্বর শব্দটা দেখছি দেয়ার–অনেক সম্ভাবনাময় শব্দ। এক-শো সাতাশ নম্বর সংখ্যা হল ইজ দেয়ার ইজ– উত্তেজনায় চকচক করতে থাকে হোমসের চোখ; দীর্ঘ সরু, কম্পিত আঙুলে একে-একে গুনে যায় শব্দ ডেঞ্জার। হা! হা! চমৎকার! লিখে নাও, ওয়াটসন। দেয়ার ইজ ডেঞ্জার–মে–কাম–ভেরি–সুন–ওয়ান। তারপর দেখছি একটা নাম ডগলাস রিচ–কান্ট্রি–নাউ অ্যাট–বির্লস্টোন–হাউস–বির্লস্টোন

কনফিডেন্স ইজ–প্রেসিং। দেখলে তো ওয়াটসন। খাঁটি যুক্তির ফসলটা দেখলে ? সবজির দোকানে লরেলের মুকুট-টুকুট যদি পাওয়া যেত, এখুনি কিনতে পাঠাতাম বিলি ছোঁড়াকে।

হোমস গুগুলিখনের মর্মার্থ উদ্ধার করে মুখে-মুখে বলে গেছিল, হাঁটুর ওপর ফুলসক্যাপ কাগজ বিছিয়ে আমি তা লিখে নিয়েছিলাম। এখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম বিচিত্র সেই সংবাদের দিকে।

বললাম, পোর্লক দেখছি বড়ো অদ্ভুতভাবে জোর করে টেনেহিচড়ে মানে বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

হোমস বললে, বরং তার উলটোটাই করেছে, আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছে। খবর পাঠাতে যেসব শব্দ দরকার, তা একটিমাত্র কলমের মধ্যে খুঁজতে গেলে মুশকিল বই কী। সব শব্দ নাও পেতে পারো। তাই সংবাদদাতার ধীশক্তির ওপর কিছুটা না-ছাড়লেই নয়। উদ্দেশ্যটা সুস্পষ্ট। ডগলাস লোকটা যেই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে ঘোর ষড়যন্ত্র চলছে–শয়তানি প্যাচে ফেলার জোগাড়যন্ত্র হচ্ছে। ভদ্রলোক থাকেন মফস্সলে–বড়োলোক। কনফিডেন্স শব্দটা কনফিডেন্ট শব্দের কাছাকাছি বলে লেখা হয়েছে–অর্থাৎ পোর্লক নিশ্চিত যে ভদ্রলোকের সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে। পাকা কারিগরের মতো বিশ্লেষণ করার পর এই হল গিয়ে আমাদের তদন্ত ফলাফল।

আশানুরূপ ফল না-পেলে হোমস যেমন মুখ কালো করে গুমরে মরে, মনের মতো ফল দেখা দিলে তেমনি খাঁটি শিল্পীর মতোই নৈর্ব্যক্তিক আনন্দে ঝলমলিয়ে ওঠে। সাফল্যের আনন্দে তাই আপন মনেই হাসতে লাগল খুকখুক করে। এমন সময়ে দরজা খুলে ধরল বিলি ঘরে ঢুকলেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

আলেক ম্যাকডোনাল্ড এখন দেশজোড়া নাম কিনেছে। কিন্তু অষ্টদশ শতাব্দীর শেষে দিকে আলেক ম্যাকডোনাল্ডের কর্মজীবনের শুরুতে কেউ তাকে চিনত না। গোয়েন্দাবাহিনীর তরুণ কিন্তু আস্থাভাজন অফিসার হিসেবে কয়েকটা কেসের সন্তোষজনক সমাধান করেছিলেন সেই বয়েসেই। চওড়া হাড় দিয়ে তৈরি লম্বা কাঠামোয় ছিল অসামান্য শারীরিক ক্ষমতার ছাপ। বিশাল করোটি আর নিবিড় ভুরুর তলায় গভীরভাবে গাঁথা চকচকে চোখজোড়া থেকে বিচ্ছুরিত হত আতীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা। নীরব প্রকৃতির চুলচেরা স্বভাবের জেদি পুরুষ–উচ্চারণে কর্কশ অ্যাবারডোনিয়ান টান। দু-বার হোমসের সাহায্য নিয়ে কর্মজীবনে সুনাম কিনেছে–হোমস পেয়েছে কেবল কঠিন সমস্যা সমাধানের আনন্দ ধীশক্তির পরিতৃপ্তিই তার একমাত্র পুরস্কার। শখের সতীর্থকে এই কারণেই যুগপৎ সমীহ করত আর ভালোবাসত স্কচম্যান এবং সব রকমের সমস্যায় হোমসের পরামর্শ নেওয়ার সময়ে তা খোলাখুলি প্রকাশ করতে দ্বিধা করত না। মাঝারি গুণ সম্পন্ন লোক নিজের চাইতে উচ্চগুণ সম্পন্ন ব্যক্তির মেধা ধরতে পারে না। কিন্তু রতনে রতন চেনে। এক ধীমানকে নিমেষে চিনে নেয় আর এক ধীমান! সেক্ষেত্রে ম্যাকডোনাল্ডও ধীমান পুরুষ। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আর স্বীয় অভিজ্ঞতা বলে যে-মানুষটি সারা ইউরোপে অনন্য হয়ে উঠেছে, তার সাহায্য নেওয়ার মধ্যে যে তিলমাত্র অবমাননা

নেই–এ-বোধ তার ছিল। বন্ধুত্ব করার প্রবণতা হোমসের মধ্যে না-থাকলেও বিশালকায় স্কচম্যানকে সে আমল দিত। তাই মৃদু হাসল ম্যাকডোনাল্ডকে দেখে।

বলল, আপনি দেখছি ভোরের পাখি হয়ে গেছেন, মি. ম্যাক। কপাল খুলে যায় ছোটোখাটো ব্যাপারেও। লটঘট কিছু ঘটেছে বলেই নিশ্চয় এই আগমন?

কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে ইনস্পেকটর, আমার মনের কথাই প্রায় বলে দিলেন দেখছি। ভোরের কনকনে ঠান্ডাটা একটু কমাননা যাক। না, না ধন্যবাদ, চুরুট খাব না। সাত সকালে একটা তদন্তে বেরিয়েছি। জানেন তো সকালের কেসই শেষ পর্যন্ত মূল্যবান কেস হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু কিন্তু

বলতে বলতে বিমূঢ় বিস্ময়ে টেবিলের ওপর রাখা একতাড়া কাগজের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল ইনস্পেকটর এই সেই কাগজ যার ওপর একটু আগেই হেঁয়ালি-ভরা খবরটা আমি লিখেছি।

বলল তোতলাতে তোতলাতে, ড–ডগলাস! বি–বির্লস্টোন! ব্যাপার কী, মি. হোমস? ডাকিনী বিদ্যে নাকি! এসব নাম আপনি পেলেন কোথায়?

একটা গুপ্তলিখনের পাঠোদ্ধার করলাম এইমাত্র আমি আর ডা. ওয়াটসন। কিন্তু কেন বলুন তো? নাম দেখে আঁতকে উঠলেন কেন?

হতচকিত বিস্ময়ে পর্যায়ক্রমে আমার আর হোমসের মুখ অবলোকন করে ইনস্পেকটর।

বলে, কেন উঠলাম জানেন? বির্লস্টোন ম্যানর হাউসের মি. ডগলাস বীভৎসভাবে খুন হয়েছেন আজই সকালে।

———–-

* ম্যাকিয়াভেলিয়ান – ম্যাকিয়াভেলি ছিলেন ইতালির প্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ। নীতিজ্ঞানহীন।

আলোচনায় বসলেন মি. শার্লক হোমস

এইসব নাটকীয় মুহূর্তের জন্যেই যেন ওত পেতে থাকে বন্ধুটি। বিস্ময়কর ঘোষণাটি শুনে সে চমকে উঠেছিল বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে–এমনকী উত্তেজিতও হয়নি! দীর্ঘকাল অতি-উত্তেজনার মধ্যে থাকার ফলেই যেন কড়া পড়ে গিয়েছে ভেতরটা। তার অসাধারণ চরিত্রের মধ্যে ক্রূরতার ছিটেফোঁটাও নেই–অথচ চোখ-মুখ এই কারণেই এত সহানুভূতিহীন। আবেগের ধার ভোতা হলে কী হবে, ধীশক্তিগ্রাহ্য অনুভূতি শানিয়ে উঠেছিল অতিরিক্ত মাত্রায়। ভয়ংকর অথচ ছোট্ট ঘোষণাটি শুনে আমি শিউরে উঠলেও এই কারণেই হোমসের চোখে-মুখে ভয়াবহতার ছায়াপাতও ঘটল না। প্রশান্ত কৌশলে নিবিড় হয়ে এল মুখমণ্ডল–অতি-সংপৃক্ত দ্রবণ থেকে ক্রিস্টাল স্বস্থানে পড়তে থাকলে রসায়নবিদের চোখে-মুখে যে-কৌতূহল দেখা যায় ঠিক সেইরকম।

বলল, আশ্চর্য। সত্যিই আশ্চর্য!

আশ্চর্য হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু।

কৌতূহলী হয়েছি, মি. ম্যাক, কিন্তু খুব একটা আশ্চর্য হইনি। হব কেন বলতে পারেন? বিশেষ একটা গুরুত্বপূর্ণ মহল থেকে একখানা উড়ো চিঠিতে হুঁশিয়ারি পেলাম–বিশেষ এক ব্যক্তির সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে। একঘণ্টাও গেল না, জানলাম সর্বনাশটা সত্যিই

এসে গেছে এবং লোকটি মারা গেছে। তাই কৌতূহলী হয়েছি কিন্তু আশ্চর্য হয়নি ঠিকই লক্ষ করেছেন।

সংক্ষেপে দু-চার কথায় চিঠি আর গুপ্ত লিখনের বৃত্তান্ত ইনস্পেকটরকে বলল হোমস। হাতের ওপর কনুই রেখে তন্ময়চিত্তে শুনল ইনস্পেকটর হলদেটে লাল প্রকাণ্ড ভুরুজোড়া জট পাকিয়ে একটা হলদে ত্রিকোণে পরিণত হল ।

বলল, সকালবেলাই গিয়েছিলাম বির্লস্টোন। যাবার পথে এখানে এসেছিলাম আপনারা যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু আপনার কথা শুনে এখন মনে হচ্ছে লন্ডন শহর থেকেই শুরু করা উচিত কাজ।

আমার তা মনে হয় না, বললে হোমস।

কী যে বলেন না, মি. হোমস। চিৎকার করে বললে ইনস্পেকটর। দু-এক দিনের মধ্যেই দৈনিকগুলো গরম হয়ে উঠবে বির্লস্টোন হত্যারহস্য খবরে। কিন্তু রহস্য তো এখানে–এই লন্ডন শহরে–এই শহরেরই একজন খুন হওয়ার আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল খুন হতে চলেছে। সেই লোকটিকেই এখন গ্রেপ্তার করা দরকার–সুতো টানলেই বাকি জট আপনি খুলে যাবে।।

খাঁটি কথা, মি. ম্যাক। কিন্তু তথাকথিত পোর্লককে গ্রেপ্তার করবেন কী করে?

হোমসের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে উলটে দেখল ম্যাকডোনাল্ড।

কাম্বারওয়েলের ডাকঘরে ফেলা হয়েছে দেখছি–খুব একটা সুবিধে তাতে হবে না। নামটা বলছেন ছদ্মনাম। বাস্তবিকই এগোনোর মতো মালমশলা তেমন নেই। পোর্লককে টাকা পাঠিয়েছিলেন বলেছিলেন না?

দু-বার পাঠিয়েছি।

কীভাবে!

ক্যাম্বারওয়েলে পোস্ট অফিসে–নোটে।

নোট নিতে কে আসে কখনো দেখতে যাননি?

না।

অবাক হয়ে গেল ইনস্পেকটর–ধাক্কা খেয়েছে মনে হল।

কেন যাননি?

বিশ্বাসের মর্যাদা দিই বলে। প্রথম চিঠিতে সে আমাকে লিখেছিল–আমি যেন তাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা না-করি। কথা দিয়েছিলাম, করব না।

আপনার কি মনে হয় লোটার পেছনে একজন লোক আছে?

মনে হয় কেন বলছেন? আমি জানি একজন আছে।

প্রফেসর যার কথা বলছিলেন?

একেবারে ঠিক বলেছেন।

হাসল ইনস্পেকটর। তাকাল আমার দিকে। দেখলাম, চোখের পাতা কাঁপছে।

মি. হোমস সি-আই-ডিতে আপনার এই মাথার পোকাটা নিয়ে প্রায় আমরা হাসিঠাট্টা করি আপনার কাছে না-লুকিয়ে বলেই ফেলি–প্রফেসরের নামে আপনি এমন সব উদ্ভট কল্পনা করেন যে বলবার নয়। আমি নিজে ওঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি। ভদ্রলোক খুব মান্যগণ্য ব্যক্তি মনে হয়েছে। পণ্ডিত এবং রীতিমতো প্রতিভাবান।

প্রতিভাকে এতদূর চিনে ফেলেছেন দেখে খুশি হলাম!

কী আশ্চর্য! এ-প্রতিভার কদর না-করে থাকা যায় কি? ভদ্রলোক সম্বন্ধে আপনার মতামত শোনবার পর থেকেই ঠিক করেছিলাম একদিন দেখা করতে হবে। গ্রহণ সম্পর্কে গল্প আরম্ভ হল–কী করে যে গ্রহণ প্রসঙ্গে এসে গেলাম বলতে পারব না। উনি কিন্তু একটা রিফ্লেক্টর লণ্ঠন আর একটা গ্লোব নিয়ে এক মিনিটেই পরিষ্কার করে দিলেন ব্যাপারটা। একটা বইও পড়তে দিয়েছিলেন। কিন্তু কী জানেন, আবারভীন চালে মানুষ কি হবে, বইটায় দাঁত ফোটাতে পারিনি–মাথায় কিছুই ঢোকেনি। কথা বলেন ধীর নম্র গলায়। চুলেও পাক ধরেছে। মুখখানি বেশ পাতলা। মন্ত্রী হিসেবে খাসা মানাতেন কিন্তু। চলে আসবার সময়ে এমনভাবে হাত রাখলেন আমার কাঁধের ওপর যেন মনে হল নিষ্ঠুর বাস্তবের মধ্যে পুত্রকে পাঠানোর আগে আশীর্বাদ করছেন পিতা।

খুক-খুক করে শুকনো হেসে দু-হাত ঘষতে লাগল হোমস।

বলল, গ্রেট! সত্যিই দারুণ! এবার বলুন তো বন্ধুবর ম্যাকডোনাল্ড, মর্মস্পর্শী মনোরম এই সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল কোথায়? প্রফেসরের পড়ার ঘরে নিশ্চয়?

ঠিক ধরেছেন।

ঘরটা সুন্দর, তাই না?

অত্যন্ত সুন্দর–ছিমছাম।

আপনি বসেছিলেন প্রফেসরের লেখবার টেবিলের সামনে?

হ্যাঁ।

আপনার চোখে রোদ পড়েছিল, ওঁর মুখ ছিল ছায়ায়?

তখন সন্ধে, তবে মনে আছে আলোটা ফিরিয়ে রাখা হয়েছিল আমার মুখের ওপর।

রাখতেই হবে। প্রফেসরের মাথার ওপর একটা ছবি লক্ষ করেছিলেন?

খুব সম্ভব ও-গুণ আপনার কাছ থেকেই পেয়েছি আমার চোখ এড়িয়ে যাওয়া এত সোজা নয়। হ্যাঁ, দেখেছি ছবিটা। একজন তরুণী মহিলা হাতে মাথা রেখে আড়চোখে দেখছেন আমাকে।

তৈলচিত্রটা জাঁ ব্যাপতিস্তি গ্রুজের আঁকা।

আগ্রহী হওয়ার প্রয়াস পেল ইনস্পেকটর।

চেয়ারে ভালোভাবে হেলান দিয়ে আঙুলগুলো ডগায় ডগায় ঠেকিয়ে হোমস বললে, জ ব্যাপতিস্তি গ্রুজ একজন ফরাসি চিত্রকর। ১৭৫০ সালের মধ্যে তার সমৃদ্ধি। আমি বলব

শুধু তার কর্মজীবনের কথা। সমসাময়িকরা ওর সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন–একই ধারণা দেখা যাচ্ছে আধুনিক সমালোচকদের মধ্যেও।

উদাসীন হয়ে এল ইনস্পেকটরের দুই চক্ষু।

বলল, আমরা বরং–

আসছি সে-পয়েন্টে, বাধা দিয়ে বললে হোমস। আপনি যাকে বির্লস্টোন হত্যারহস্য বলছেন তার সঙ্গে এইমাত্র যা বললাম তার সরাসরি এবং গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রয়েছে। এমনকী একদিক দিয়ে হত্যারহস্যের কেন্দ্রবিন্দুও বলা চলে এই ব্যাপারটাকে।

ম্লান হেসে কাতর চোখে আমার দিকে চাইল ম্যাকডোনাল্ড।

মি. হোমস আপনি বড়ো তাড়াতাড়ি ভাবেন নাগাল ধরতে পারি না। দু-এক জায়গায় ফাঁক রেখে গেছেন–টপকাতে পারছি না। বির্লস্টোন রহস্যের সঙ্গে মৃত চিত্রকরের কী সম্পর্ক মাথায় আসছে না।

সব খবরই এক সময়ে কাজে লাগে গোয়েন্দাদের, মন্তব্য করল হোমস। ১৮৬৫ সালে পোর্টালিসে গ্রুজের আঁকা La Jeune Fill a lagneau২ নামে একটা ছবি চার হাজার পাউন্ডে বিক্রি হওয়ার মতো সামান্য একটা সংবাদও আপনার মনে অনেক চিন্তার ছায়া ফেলতে পারে।

সত্যিই তা ফেলল। অকৃত্রিম কৌতূহল ফুটে উঠতে দেখা গেল ইনস্পেকটরের চোখে-মুখে।

জের টেনে নিয়ে হোমস বললে, প্রফেসরের বেতন কত, তা খানকয়েক নির্ভরযোগ্য বই ঘাঁটলেই জানা যায়। বছরে সাতাশ পাউন্ড।

তাহলে ও-ছবি উনি কিনলেন কী করে—

আমিও তাই বলি, কিনলেন কী করে?

চিন্তাকুটিল চোখে বললে ইনস্পেকটর–আশ্চর্য ব্যাপার তো! বলে যান, মি. হোমস। বেশ লাগছে শুনতে। ফাইন বলেছেন।

খাঁটি শিল্পীর বৈশিষ্ট্য হল অকপট প্রশংসায় গলে যাবে হোমস তার ব্যতিক্রম নয়। প্রশস্তি শুনে হাসল।

বলল, বির্লস্টোনের ব্যাপারটা বলুন শুনি।

এখনও সময় আছে, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে ইনস্পেকটর। দোরগোড়ায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসেছি–ভিক্টোরিয়া পৌঁছোতে মিনিট কুড়ি লাগবে। কিন্তু এই ছবিটা আপনার মুখে শুনেছিলাম মি. হোমস, আপনি নাকি কখনো প্রফেসারের সামনাসামনি হননি?

না, জীবনে না।

তাহলে ঘরের মধ্যে কোথায় কী আছে জানলেন কী করে?

সেটা আরেকটা ব্যাপার, ওর ঘরে গেছিলাম তিনবার। দু-বার দু-রকমের দুটো অছিলা নিয়ে–বেরিয়ে পড়েছিলাম উনি ফিরে আসার আগেই। আর একবার ব্যাপারটা অবশ্য সরকারি গোয়েন্দার সামনে বলাটা সমীচীন হবে না–শেষের বারেই ওঁর কাগজপত্র হাঁটকেছিলাম এবং অপ্রত্যাশিত ফল পেয়েছিলাম।

গালে চুনকালি দেওয়ার মতো কিছু পেয়েছিলেন বোধ হয়?

কিছুই পাইনি। অবাক হয়েছিলাম সেই কারণেই। যাই হোক, ছবির ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হল তো? এ-ছবি ওই দামে কিনেছেন যখন তখন নিশ্চয় ভদ্রলোক বিরাট বড়োলোক। এত টাকা পেলেন কীভাবে? বিয়ে করেননি। পশ্চিম ইংলন্ডে স্টেশনমাস্টারের কাজ করেন ওঁর ছোটোভাই। ওঁর নিজের চেয়ারের দাম বছরে সাতাশ পাউন্ড। তা সত্ত্বেও উনি গ্রুজ পেন্টিংয়ের মালিক।

তারপর?

তারপরের সিদ্ধান্তটা দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট।

আপনি বলতে চান রোজগার ওঁর অনেক এবং বিরাট এই রোজগার আসে বেআইনি পথে?

হ্যাঁ, ঠিক তাই বলতে চাই। মাকড়সার জালের ঠিক মাঝখানে বিষাক্ত যে-প্রাণীটা চুপচাপ বসে থাকে শিকারের আশায়, আঠা চটচটে বহু তন্তুর মাধ্যমেই পৌঁছানো যায় তার কাছে। এ-কথা বলার কারণ আছে বলেই বললাম। কিন্তু এই বিশেষ গুরুজ ঘটনাটি বললাম আপনি নিজে তা লক্ষ করেছিলেন বলে।

মি. হোমস আপনার কথাগুলো কৌতূহল জাগানো। শুধু কৌতূহলই জাগায় না, তাজ্জব করে দেয়। তবে যদি আর একটু পরিষ্কার করে বলেন আমাকে তো সুবিধে হয়। কী করেন উনি ? জাল নোট ? জাল টাকা? চুরিডাকাতি? টাকাটা আসে কোন পথে?

জোনাথন ওয়াইল্ডের নাম শুনেছেন?

নামটা চেনা-চেনা লাগছে। উপন্যাসের কোনো চরিত্র কি? নাটক নভেলের ডিটেকটিভদের খুব একটা পাত্তা দিই না আমি। এরা শুধু নিজেরাই বাহাদুরি দেখিয়ে

যায়–কী করে দেখাচ্ছে কাউকে বুঝতে দেয় না। ওসব পড়তে ভালো লাগে কাজে লাগে না।

জোনাথন ওয়াইল্ড ডিটেকটিভ নয়, নাটক নভেলের চরিত্রও নয়। লোকটা একটা ক্রিমিন্যাল অপরাধী সম্রাট। গত শতাব্দীতেই তার কীর্তিকাহিনির শুরু এবং শেষ ১৭৫০-এর ধারেকাছে।

তাহলে ও-লোককে নিয়ে আমার কাজ হবে না। আমি প্র্যাকটিক্যাল মানুষ বাস্তব নিয়ে কারবার করি।

মি. ম্যাক, আপনার জীবনে সবচেয়ে প্র্যাকটিক্যাল কাজ কী হওয়া উচিত জানেন? মাস তিনেক বাড়ি থেকে না-বেরিয়ে দিনে বারো ঘণ্টা হিসেবে রোজ শুধু অপরাধ ইতিহাস পড়া। সব কিছুই জানবেন ঘুরে ফিরে আসে—এমনকী এই প্রফেসর মরিয়ার্টিও। লন্ডন ক্রিমিন্যালদের শক্তির গুপ্ত উৎস ছিল জোনাথন ওয়াইল্ড শতকরা পনেরো টাকা দস্তুরির বিনিময়ে ধার দিত নিজের ব্রেন আর সংগঠন। চাকা ঘুরছে, সেই একই পাটি আবার ফিরে এসেছে। আগে যা-যা ঘটেছে, এখন তার প্রতিটি ফের ঘটবে। প্রফেসর মরিয়ার্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা শুনলে হয়তো আপনার আগ্রহের সঞ্চার ঘটতে পারে।

আপনার সব কথাতেই আমার আগ্রহ জাগে।

এই যে শেকল, এর একদিকে রয়েছে শ-খানেক তাসের জুয়াড়ি, ব্ল্যাকমেলার, পকেটমার, গুন্ডা এবং সবরকম অপরাধী–আর একদিকে গোল্লায় যাওয়া নেপোলিয়ন সমান প্রফেসর মরিয়ার্টি এই শেকলের পয়লা নম্বর আংটাটিকে আমি চিনি। মরিয়ার্টির ডান হাত হল কর্নেল সিবাসটিয়ান মোরান–আইনের ধরাছোঁয়ার একদম বাইরে। আইনই বরং তাকে আগলে রেখে দিয়েছে। পালের এই গোদাটিকে মরিয়ার্টি কত মাইনে দেয় জানেন?

শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বছরে ছ-হাজার। এই হল মার্কিন ব্যবসার নীতি উপযুক্ত মগজের উচিত দাম। মাইনের ব্যাপারটা হঠাৎ জানতে পারি। প্রধানমন্ত্রীও এত টাকা পান না। এ থেকেই বুঝবেন মরিয়ার্টির লাভ কী বিপুল এবং কী ব্যাপক তার কার্যকলাপ। আরেকটা পয়েন্ট। সম্প্রতি মরিয়ার্টির খানকয়েক চেক খুঁজে খুঁজে বের করেছিলাম–গেরস্থালির বিল মিটানোর নির্দোষ চেক। কিন্তু চেকগুলো কাটা হয়েছে ছ-টা আলাদা ব্যাঙ্কের ওপর। এ থেকে কী মনে হয় আপনার বলুন।

অদ্ভুত নিশ্চয়। কিন্তু এ থেকে আপনার কী মনে হয়?

নিজের টাকা নিয়ে গুলতানি হোক, এটা তার ইচ্ছে নয়। বিশেষ একজন যেন না-জানে কত টাকা আছে প্রফেসর মরিয়ার্টির। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তার কুড়িটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে–বিরাট সম্পত্তির বেশির ভাগটাই অবশ্য আছে বিদেশের ব্যাঙ্কে–Deutsche ব্যাঙ্কে

অথবা Credit Lyonnais-এ। যদি কখনো দু-এক বছর ছুটি পান, প্রফেসর মরিয়ার্টিকে নিয়ে গবেষণা করবেন।

নিজের আগ্রহেই নিজে কুঁদ হয়ে গিয়েছিল ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড। যতই কথা এগিয়েছে, ততই যেন প্রত্যেকটা শব্দ গভীরভাবে দাগ কেটে বসে গেছে ভেতরে। কিন্তু শেষকালে জাগ্রত হল স্বচ্ছ বুদ্ধি–ঝাঁকি দিয়ে এল হাতের কাজে।

কৌতূহল জাগানো টীকাটিপ্পনী দিয়ে অন্য কথায় এনে ফেললেন মি. হোমস। মরিয়ার্টি এখন থাকুক। আসল কথা হল মরিয়ার্টির সঙ্গে বির্লস্টোন রহস্যের সম্পর্ক–যা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন আপনি। হুঁশিয়ারি পেয়েছিলেন পোর্লক নামধারী একটি লোকের কাছ থেকে। এই সম্বন্ধেই যদি আরও কিছু বলেন তো হাতের কাজের সুবিধে হয়।

অপরাধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা খাড়া করা যেতে পারে। আপনার প্রথম মন্তব্য অনুসারে ধরে নিচ্ছি, খুনের মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। এখন যদি ধরা যায়, অপরাধটার উৎস আমরা যা সন্দেহ করছি সেইখানে–তাহলে খুনের দুটো আলাদা উদ্দেশ্য পাচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, দলের লোকদের লোহার ডান্ডা নিয়ে শাসনে রাখে মরিয়ার্টি। কড়া নিয়মানুবর্তিতার অধীন প্রত্যেকেই। শাস্তির বিধান একটাই–মৃত্যু। এই ডগলাস লোকটাও হয়তো কোনোরকমে বিশ্বাসঘাতকতা করে ফেলেছিল দলের সর্দারের সঙ্গে। সর্দারের সঙ্গী স্যাঙাতদের মধ্যে কেউ টের পায়, শাস্তিস্বরূপ মরতে চলেছে ডগলাস। যাইহোক, মরতেই হল ডগলাসকে দুনিয়ার সবাই এবার জানবে তার মৃত্যুকাহিনি–ভয়ে সিঁটিয়ে থাকবে দলের অন্য লোকজন।

এটা তো গেল একটা অনুমান।

আর একটা অনুমান হল এই : মরিয়ার্টি নিজেই খুনটা ঘটিয়েছে গতানুগতিক ব্যাবসা সূত্রে। ডাকাতি-টাকাতি কিছু হয়েছে?

শুনিনি।

যদি হয় তাহলে নাকচ হয়ে যাবে প্রথম অনুমিতিটা টিকে যাবে শেষেরটা। হয় লুঠের মালের বখরার প্রতিশ্রুতি পেয়ে, আর না হয় মোটা টাকার বিনিময়ে খুনটা ঘটিয়েছে মরিয়ার্টি। দুটোই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যেটাই সত্যি হোক না কেন, এমনকী দুটোর কোনোটাই না হয় যদি অন্য কারণেও আসরে অবতীর্ণ হয় মরিয়ার্টি, তাহলেও আমাদের এখুনি যাওয়া দরকার বির্লস্টোনে। সমাধান সেখানে লন্ডনে নয়। প্রফেসরকে আমি চিনি! লন্ডন শহরে এমন সূত্র ফেলে ছড়িয়ে রাখবে না যা ধরে তার কাছে যাওয়া যায়।

তাহলে চলুন বির্লস্টোনেই যাওয়া যাক। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সোল্লাসে বললে ম্যাকডোনাল্ড। আরে সর্বনাশ! বড্ড দেরি হয়ে গেল যে। পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দেওয়া যাবে না আপনাদের–চটপট তৈরি হয়ে নিন।

পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট আমাদের কাছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ড্রেসিং গাউন খুলে কোট পরতে পরতে বললে হোমস। মি. ম্যাক, যেতে যেতেই বলবেন পুরো ব্যাপারটা।

পুরো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অতি সামান্য–হতাশ হতে হল শুনে। তা সত্ত্বেও যেটুকু শুনলাম তার মধ্যেই দেখা গেল এমন অনেক পয়েন্ট রয়েছে যা বিশেষজ্ঞদের নজর কাড়বার পক্ষে যথেষ্ট। সামান্য কিন্তু আশ্চর্য খুঁটিনাটি শুনতে শুনতে দু-হাত কচলে খুশিতে ঝলমলে হয়ে উঠল হোমস। বেশ কয়েক হপ্তা বেকার কেটেছে নিষ্ফল দিনযাপনের গ্লানি সুদে-আসলে পুষিয়ে নেওয়ার মোক্ষম সুযোগ এসেছে। এ-সংসারে ঈশ্বরের দেওয়া আশ্চর্য শক্তি নিয়ে অনেকে জন্মায়। কিন্তু সেই শক্তির ধারে মরচে পড়তে থাকলে, কারো কাজে না-লাগলে তখন তা শক্তির মালিককেই ভেতর থেকে কুরে কুরে খেতে থাকে। খুরের মতো ধারালো ব্রেনও দীর্ঘদিন নিষ্ক্রিয় থাকলে মরচে পড়ে ভোতা হবার উপক্রম হয়। কাজের ডাক এলে তাই শার্লক হোমসের দু-চোখ জ্বলে ওঠে, পাণ্ডুর গালে রক্তিমাভা দেখা দেয়, সাগ্রহ মুখখানার পরতে পরতে অন্তরের কন্দর থেকে রোশনাই ছিটকে পড়ে! ভাড়াটে গাড়ির কোণে হেলান দিয়ে বসে সে একাগ্রচিত্তে শুনে গেল ম্যাকডোনাল্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা–সাসেক্স রহস্যের কাহিনি। ইনস্পেকটর নিজে একটা খবরের ওপর বেশি ঝুঁকছে। দ্রুত হাতে কাগজে লেখা খবরটা তার কানে পৌঁছে দিয়ে গেছে ভোরের দুধের ট্রেন। গাঁয়ের পুলিশ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কাছে সাহায্য চাইলে বিধিবদ্ধভাবে সে-খবর ম্যাকডোনাল্ডের কাছে পৌঁছতে দেরি হত। কিন্তু স্থানীয় পুলিশ অফিসার হোয়াইট ম্যাসোন ম্যাকডোনাল্ডের প্রাণের বন্ধু বলে খবর পাঠিয়েছে সরাসরি। তবে এ ধরনের নিরুত্তাপ রহস্যভেদের জন্যে শহরের পুলিশ বিশেষজ্ঞদের সচরাচর তলব পড়ে না।

চিঠি পড়ে শোনালো ম্যাকডোনাল্ড প্রিয় ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড, সরকারিভাবে আপনার সাহায্য চাইছি পৃথক লেফাফায়। এ-চিঠি ব্যক্তিগতভাবে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। সকালের কোন ট্রেনে বির্লস্টোন আসছেন টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানিয়ে দেবেনসেইমতো আপনাকে স্টেশনে নিতে আসব, অথবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে আর কাউকে পাঠিয়ে দেব। কেসটাকে একটা তুমুল ঝড় বলা চলে। রওনা হতে একমুহূর্তও নষ্ট করবেন না। মি. হোমসকে যদি আনতে পারেন ভালো হয় –ওঁর মাথার খোরাক পাবেন। মাঝে একজন যারা না-গেলে ভাবতেন পুরো ব্যাপারটাই যেন নাটক করার জন্যে সাজানো। বিশ্বাস করুন, এ-কেসকে তুমুল ঝড় ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

হোমস মন্তব্য করল, আমার বন্ধুকে বোকা বলে মনে হচ্ছে না।

বোকা সে মোটেই নয়। আমার বিচারে হোয়াইট ম্যাসোন রীতিমতো করিতকর্মা পুরুষ।

আর কিছু পেয়েছেন?

দেখা হলে খুঁটিনাটি ওর মুখেই শোনা যাবে।

মি. ডগলাস বীভৎসভাবে খুন হয়েছেন এ-খবরটা তাহলে পেলেন কোথায়?

আলাদা লেফাফায় সরকারি রিপোর্টে ছিল। বীভৎস কথাটা বলা হয়নি, সরকারি ভাষায় ও-শব্দের চল নেই। নাম লেখা হয়েছে জন ডগলাস। বলা হয়েছে চোটটা লেগেছে

মাথায়–শর্টগানের গুলি। জানাজানি কখন হয়েছে, সে-সময়টাও আছে রিপোর্টে–গতরাত্রে বারোটা নাগাদ। আরও বলা হয়েছে, কেসটা নিঃসন্দেহে খুনের কেস–কিন্তু কাউকে গ্রেপ্তার কার হয়নি এবং বেশ কতকগুলো মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো অসাধারণ এবং অত্যন্ত গোলমেলে বৈশিষ্ট্য আছে কেসটায়। মি. হোমস এ ছাড়া আপাতত আর কিছু পাওয়া যায়নি।

তাহলে বিষয়টা এইখানেই মুলতুবি রাখা যাক। পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ না-নিয়ে অকাল সিদ্ধান্ত খাড়া করার লোভ আমাদের পেশায় কিন্তু বিষতুল্য–যতকিছু সর্বনাশের কারণ। আপাতত দুটো জিনিস নিশ্চিত দেখতে পাচ্ছি : লন্ডনের এক বিরাট ব্রেন আর সাসেক্সে এক মৃতব্যক্তি। আমরা যাচ্ছি এই দুইয়ের মাঝের শেকলটা খুঁজতে।

বির্লস্টোন ট্র্যাজেডি

পাঠকের অনুমতি নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে এবার আমার অতি-নগণ্য ব্যক্তিত্ব সরিয়ে রাখছি কাহিনির মধ্যে থেকে। আমরা খবর পেয়ে দৌড়েছিলাম অকুস্থল অভিমুখে। কিন্তু তার আগে ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছিল হুবহু সেইভাবে বর্ণনা করছি। তাতে পাঠকেরই সুবিধে। অদ্ভুত এই রহস্যে যারা জড়িত তাদের চিনতে পারবেন। কী ধরনের দৃশ্য আর পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র এই রহস্য-নাটিকা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা আঁচ করতে পারবেন।

বির্লস্টোন গ্রামটা সাসেক্স প্রদেশের উত্তর সীমান্তে খুব সেকেলে খানকয়েক কাঠের গুড়ি দিয়ে তৈরি কুঁড়ে নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোট্ট গ্রাম। কয়েকশো বছরেও গ্রামটার কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু গত কয়েক বছরের মধ্যে জায়গাটার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়ে বেশ কিছু বিত্তবান ব্যক্তি ভিলা বানিয়েছেন চারপাশের জঙ্গলের মধ্যে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, উত্তর দিকে চকখড়ি উপত্যকার দিকে আস্তে আস্তে পাতলা হয়ে গিয়েছে যে সুবিশাল উইল্ড অরণ্য, জঙ্গল তারই প্রত্যন্ত কিনারা। গায়ে লোক বাড়তেই তাদের চাহিদা মেটাতে ছোটো ছোটো অনেকগুলো দোকানেরও পত্তন ঘটেছে। ফলে, অদূর ভবিষ্যতে সুপ্রাচীন গ্রামটি আধুনিক নগরের রূপ নিতে পারে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সাসেক্স প্রদেশের বেশ খানিকটা অঞ্চলের কেন্দ্রে রয়েছে এই বির্লস্টোন। সবচেয়ে কাছের গুরুত্বপূর্ণ লোকালয় বলতে টানব্রিজ–মাইল দশ বারো পুবে, কেন্টের সীমান্তের ওপারে।

নগর থেকে আধমাইলটাক দূরে প্রকান্ড বীচগাছের জন্যে বিখ্যাত একটা প্রাচীন বাগানে অবস্থিত বির্লস্টোনের সুপ্রাচীন ম্যানর হাউস। সুপ্রাচীন ভবনের কিছু অংশ নির্মিত হয়েছে প্রথম ধর্মযুদ্ধের সময়ে। হিউগো দ্য ক্যাপাসকে বেশ কিছু জায়গা দিয়েছিলেন রেড কিং। জমিদারির মাঝামাঝি জায়গায় একটা খুদে দুর্গ নির্মাণ করেন ক্যাপাস। ১৫৪৩ সালে আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায় দুর্গা। জ্যাকবের আমলে ধোঁয়ায় কালো কিছু ভিতের পাথর নিয়ে সুপ্রাচীন সামন্ত কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তুপের ওপর নির্মিত হয় ইটের গ্রাম্য-ভবন। এই হল গিয়ে বির্লস্টোনের ম্যানর হাউস। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভবন-নির্মাতা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেও এখনও বাড়িতে রয়ে গেছে অসংখ্য ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা তিনকোনা দেওয়াল। অসমকোণী শার্সি বসানো ছোটো ছোটো জানলা। পূর্বসূরি যোদ্ধার জীবনযাপন করেছিলেন। ম্যানর হাউস ঘিরে একজোড়া পরিখা খুঁড়েছিলেন। বর্তমান মালিক বাইরের পরিখার জল–ছেড়ে শুকিয়ে এনেছেন এবং সেখানে পাকশালা-উদ্যানের চাষ হয়েছে। ভেতরের পরিখাটা এখনও আছে। চওড়ায় চল্লিশ ফুট, কিন্তু গভীরতায় মাত্র কয়েক ফুট। পুরো বাড়িটাকে ঘিরে আছে এই পরিখা। ছোট্ট একটা স্রোতস্বিনীর জলে পুষ্ট হওয়ায় পরিখার জল ঘোলা হলেও অস্বাস্থ্যকর নয়, নালার মতোও নয়। স্রোতস্বিনীর জল পরিখার একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একতলার জানলাগুলোর এক ফুট দূরেই পরিখার জল। একটিমাত্র ড্রব্রিজ সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে হয় বাড়িতে ওঠানো নামানো যায় এ-সেতু। চরকি-কল আর শেকল বহুদিন আগেই মরচে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। ম্যানর হাউসের বর্তমান বাসিন্দারা প্রাণবন্ত করিতকর্মা ব্যক্তি। চটপট মেরামত করে নেন চরকি-কল আর শেকল। ড্রব্রিজ এখন আগের মতোই যে শুধু ওঠানো যায় তা নয়–প্রতিদিন সন্ধে হলেই সত্যিসত্যিই ওঠানো হয় এবং ভোর হলে নামানো হয়। সেকেলে সামন্ত রাজাদের কায়দায় ম্যানর হাউসকে এইভাবে সুরক্ষিত

করার ফলে রাত হলেই এ-বাড়ি এখন একটা জল ঘেরা দ্বীপ হয়ে যায়। ঘটনাটা গুরুত্বপূর্ণ। অচিরেই যে-রহস্য সারা ইংলন্ডের টনক নড়িয়েছে, সে-রহস্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এই ঘটনার।

বাড়িটায় অনেক বছর কেউ বাস করেনি। নয়ন সুন্দর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হচ্ছিল একটু একটু করে। এই সময়ে বাড়ির দখল নিলেন ডগলাস পরিবার। পরিবারের মানুষ বলতে শুধু দু-জনই, জন ডগলাস এবং তার স্ত্রী। চরিত্র এবং চেহারা উভয় দিক দিয়েই ডগলাস অসাধারণ পুরুষ; বয়স পঞ্চাশের ধারেকাছে, শক্ত চোয়াল, রুক্ষ তেজি অসমান মুখ, ধূসর গোঁফ, অদ্ভুত ধারালো ধূসর চক্ষু এবং মাংসপেশি বহুল বলিষ্ঠ গঠন–যৌবনের শক্তি এবং তৎপরতার কোনো ঘাটতিই নেই সেই শরীরে। আমুদে এবং সবার প্রতি অমায়িক হলেও আচার আচরণ কেমন যেন শিষ্টাচারহীন, দেখে মনে হয় সাসেক্সের গ্রাম্যসমাজের চাইতে দূর নিম্নদিগন্তের সামাজিকতাই এ-জীবনে তিনি বেশি দেখেছেন। কৃষ্টি সংস্কৃতিতে অনেক বেশি উন্নত প্রতিবেশীরা ওঁর প্রতি কৌতূহল আর তুষ্ণীভাব বজায় রাখলেও গ্রামবাসীদের কাছে তিনি দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। গাঁয়ের সব ব্যাপারেই মোটা চাঁদা দিতেন, গানবাজনা ধুমপানের আড্ডায় যোগদান করতেন। কোনো অনুষ্ঠানই বাদ দিতেন না। গলার স্বর ছিল পুরুষের মতো চড়া, আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধ। গলা ছেড়ে চমৎকার গান গেয়ে আসর মাত করতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। দেখে শুনে মনে হত দেদার টাকা আছে তার। সে-টাকা নাকি এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সোনার খনি থেকে। তার নিজের এবং স্ত্রীর কথাবার্তা শুনেও বোঝা যেত জীবনের কিছু অংশ কাটিয়েছেন আমেরিকায়। বদান্যতা আর সবার সঙ্গে সমানভাবে মেশবার ক্ষমতার জন্যে এমনিতেই তার সম্বন্ধে ধারণা ভালো হয়ে গিয়েছিল গাঁ-সুদ্ধ লোকের। এই ধারণা বেড়ে গিয়েছিল তাঁর আর

একটি গুণের জন্যে বিপদ-টিপদ একদম পরোয়া করতেন না ভদ্রলোক। ঘোড়া চালাতেন যাচ্ছেতাই, তা সত্ত্বেও সবক-টা ঘোড় দৌড়ে আশ্চর্য রকমের আছাড়-টাছাড় খেয়েও দেখা যেত সব সেরা ঘোড়সওয়ারের সমান সমান যাচ্ছেন। গিঞ্জেয় আগুন লেগেছিল একবার। স্থানীয় দমকল আগুন নেভানো অসম্ভব দেখে হাল ছেড়ে দিলে। কিন্তু অকুতোভয় এই জন ডগলাস জ্বলন্ত বাড়ির মধ্যে ঢুকেছিলেন দামি জিনিসপত্র উদ্ধারের জন্যে। এই ঘটনার পরেই বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে ওঠেন ভদ্রলোক। এইভাবেই পাঁচ বছরের মধ্যেই বির্লস্টোনে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেন ম্যানর হাউসের জন ডগলাস।

স্ত্রীও খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বাড়ি বয়ে লোক আসত অবশ্য খুবই কম। ইংরেজ রীতিই তাই। বহিরাগতের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে না। কিন্তু যাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদের মনের মানুষ হতে পেরেছিলেন ভদ্রমহিলা। গায়ে পড়ে আলাপ না-করলেও অবশ্য কিছু এসে যেত না তাঁর। কেননা স্বামী আর সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন দিবারাত্র। গেরস্থালির দিকেই নজর থাকত বেশি। স্বভাবটাও সেইরকম। জানা যায়, ভদ্রমহিলা জাতে ইংরেজ। লন্ডনে আলাপ জন ডগলাসের সঙ্গে তখন তিনি বিপত্নীক ছিলেন। খুব সুন্দরী, দীর্ঘাঙ্গী, জল হাওয়ায় গাঢ় রং, কৃশকায়া। স্বামীর চেয়ে বিশ বছরের ছোটো। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের পরিতৃপ্তি তাতে বিঘ্নিত হয়নি। যারা একটু বেশি খবর রাখে, তাদের মুখে অবশ্য শোনা যেত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বোঝাঁপড়াটা কিন্তু পরিপূর্ণ নয় বলেই মনে হয়। স্বামীর পূর্ব জীবন সম্বন্ধে নাকি একদম কথা বলতে চাইতেন না স্ত্রী অথবা এমনও হতে পারে যে তাঁকে পূর্ব বৃত্তান্ত জানানো হয়নি। কিছু কিছু চোখ-খোলা লোকের মুখে এমন মন্তব্যও শোনা গেছে যে স্বামীর অনুপস্থিতিতে বিশেষ করে স্বামী একটু বেশি রাত করে ফেরার দরুন অস্বস্তিতে ভুগতেন মিসেস ডগলাস লক্ষণ দেখে

মনে হত যেন ভয় আর উৎকণ্ঠায় ভুগছেন। শহরতলির নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় গুজব জিনিসটা বেশি ছড়ায়–একটুতেই ফিসফাস আরম্ভ হয়ে যায়। ম্যানর হাউসের ভদ্রমহিলার এই দুর্বলতা নিয়েও বিলক্ষণ মন্তব্য করা হয়েছে। পরের পর ঘটনা আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পরেই প্রসঙ্গটা বিশেষ তাৎপর্য পেয়েছে এবং জনগণের স্মৃতির তারে বেশি করে ঘা দিয়েছে।

ম্যানর ভবনে মাঝে মাঝে আস্তানা নিতেন আরও এক ব্যক্তি। যে বিচিত্র ঘটনা এখন বিবৃত করা হবে, ইনি সেই ঘটনার মধ্যে হাজির ছিলেন। তাই জনগণের কাছে তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। এর নাম সিসিল জেমস বার্কার। নিবাস হ্যামসটিডের হেল্স লজে। ম্যানর হাউসে তিনি হামেশাই আসতেন এবং সাদর অভ্যর্থনা পেতেন। বির্লস্টোনের পথেঘাটে তার দীর্ঘ ঢিলেঢালা আকৃতি দেখেছে অনেকেই। ইংলিশ শহরতলিতে আস্তানা নেওয়ার আগে মি. ডগলাসের অজ্ঞাত অতীত জীবনে তিনিই যে একমাত্র বন্ধু ছিলেন, এমনটিই যেন বেশি করে চোখে পড়েছে স্থানীয় লোকের। বার্কার নিজে কিন্তু নিঃসন্দেহে ইংরেজ। কিন্তু কথাবার্তায় বোঝা গেছে ডগলাসের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় আমেরিকায় এবং সেখানেই ঘনিষ্ঠভাবে থেকেছেন দু-জনে। লক্ষণ দেখে বোঝা গেছে বার্কার রীতিমতো বিত্তবান এবং ডাকসাইটে চিরকুমার। বয়েসের দিক দিয়ে ডগলাসের চেয়ে একটু ছোটোই–বড়োজোর পঁয়তাল্লিশ। মাথায় লম্বা, খাড়া চেহারা, চওড়া বুক, পরিষ্কারভাবে দাড়ি-গোঁফ কামানো, বাজি জেতা লড়াকুর মতো মুখমণ্ডল, পুরু, কড়া, কালো ভুরু এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক এমন একজোড়া কৃষ্ণচক্ষু যার দাপটে শক্তিঠাসা দুই হাতের বল প্রয়োগ ছাড়াই মারমুখো ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা তিনি রাখেন। ঘোড়ায় তিনি চড়তেন না, বন্দুকবাজিও করতেন না। প্রাচীন গ্রামের চারধারে মনোরম

পরিবেশে বেড়াতেন গাড়ি চড়ে। মুখে থাকত পাইপ, পাশে কখনো ডগলাস নয়তো ডগলাসের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী। খাস চাকর অ্যামিস বলত, ভদ্রলোক শান্তিপ্রিয়, মুক্তহস্ত পুরুষ। হইচই একদম ভালোবাসতেন না। তবে রেগে গেলে আর রক্ষে নেই। আমি অন্তত তখন সামনে যাচ্ছি না। ডগলাসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রাণের এবং অন্তরঙ্গতার। অন্তরঙ্গ ছিলেন তার স্ত্রী সঙ্গেও এবং এই বন্ধুত্বই নাকি মাঝে মাঝে মেজাজ খিচড়ে দিত জন ডগলাসের লক্ষ করেছে চাকরবাকররা। অনর্থটা ঘটবার সময়ে এহেন ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবারের মধ্যে। সুপ্রাচীন ভবনের অন্যান্য বহু অধিবাসীদের মধ্যে দু-জনের নাম করলেই যথেষ্ট। একজন ফিটফাট, মর্যাদাসম্পন্ন, গেরস্থালির কাজে পোক্ত। নাম অ্যামিস। আর একজন গোলগাল, হাসিখুশি মহিলা–মিসেস অ্যালেন–সংসারের অনেক ঝক্কি নিজের হাতে নিয়ে রেহাই দিয়েছিলেন কর্ত্রীঠাকরুনকে। ৬ জানুয়ারি নিশীথরাত্রের ঘটনার সঙ্গে বাড়ির অন্য ছ-জন চাকরের কোনো সম্পর্ক নেই।

দুঃসংবাদটা প্রথম পৌঁছোয় রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। স্থানীয় থানায় সাসেক্স কন্সট্যাবুলারির সার্জেন্ট উইলসন ডিউটিতে ছিলেন তখন। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে গিয়ে দরজার ঘণ্টা ধরে সাংঘাতিক জোরে টানাটানি করেছিলেন মিস্টার সিসিল বার্কার। ভয়ংকর ব্যাপার ঘটেছে ম্যানর হাউসে সাংঘাতিক ট্র্যাজেডি। নিহত হয়েছেন মি. জন ডগলাস। নিরুদ্ধ নিশ্বাসে শুধু এই খবরটাই বলে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন ভদ্রলোক, মিনিট কয়েকের মধ্যেই পেছন পেছন ছুটেছিল পুলিশ-সার্জেন্ট—গুরুতর কিছু একটা ঘটে গেছে এই মর্মে কর্তৃপক্ষকে খবর দিয়ে অকুস্থলে পৌঁছেছিল বারোটার একটু পরেই।

ম্যানর হাউসে পৌঁছে সার্জেন্ট দেখলে ড্রব্রিজ নামানো, জানলাগুলো আলোকিত এবং সারাবাড়ি জুড়ে চলেছে তুমুল হট্টগোল আর বিভ্রান্তি। নীরক্ত-মুখে চাকরবাকররা জড়ো হয়েছে হল ঘরে চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত কচলাচ্ছে ভয়ার্ত খাসচাকর। সংযমী স্থিতধী পুরুষ শুধু একজনই–সিসিল বার্কার। সদর দরজার সবচেয়ে কাছে একটা দরজা খুলে ধরে সার্জেন্টকেই ইশারায় ডেকে নিয়ে গেছেন পেছন পেছন। ঠিই সেই সময়ে এসে গেছেন গাঁয়ের সবরকম চিকিৎসায় দক্ষ চটপটে ডাক্তার উড। ভয়ানক কাণ্ডের ঘরটিতে প্রবেশ করেছেন এই তিনজনে–পেছন পেছন ঢুকেছে আতঙ্কে-নীল খাসচাকর এবং দরজা বন্ধ করে দিয়েছে যাতে অন্য চাকররা বীভৎস সেই দৃশ্য দেখতে না-পায়।

ঘরের ঠিক মাঝখানে হাত পা ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে মৃত ব্যক্তি। রাত্রিবাসের ওপর গোলাপি ড্রেসিং-গাউন। নগ্ন পায়ে কার্পেট স্লিপার। পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন ডাক্তার। টেবিলের ওপর থেকে হ্যান্ড ল্যাম্প নিয়ে ধরলেন মুখের ওপর। এক নজরেই বুঝলেন তার আর থাকার দরকার নেই। তিনি রোগ তাড়ান, মৃত্যুকে নয়। বীভৎসভাবে জখম করা হয়েছে জন ডগলাসকে। বুকের ওপর ন্যস্ত একটি অদ্ভুত অস্ত্র একটা শটগান কিন্তু নলটা ট্রিগারের ফুটখানেক তফাতে করাত দিয়ে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, হাতিয়ারটা সোজা তার মুখের ওপরেই ছোড়া হয়েছে–মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। ট্রিগার দুটো তার দিয়ে বাঁধা–যাতে একসাথে দুটো কার্তুজই আরও ধ্বংসাত্মক হতে পারে।

ঘাবড়ে গিয়েছিল গাঁয়ের পুলিশ ভদ্রলোক। অকস্মাৎ এহেন সাংঘাতিক দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় বিচলিতও হয়েছিল।

বীভৎস মাথাটার দিকে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় শুধু বলেছিলওপরওলা না-আসা পর্যন্ত কেউ কিছু ছোঁবে না।

সিসিল বার্কার বলেছিলেন, এখনও কেউ কিছুতে হাত দেয়নি। সে-জবাব আমি দেব। ঠিক যেভাবে আপনি দেখেছেন, আমিও দেখেছি সেইভাবে!

নোটবই বার করে সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করেছিল, কখন দেখেছিলেন?

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটার সময়ে। তখনও ধড়াচুড়ো ছাড়িনি, শোবার ঘরে আগুনের ধারে বসেছিলাম, এমন সময়ে শুনলাম, বন্দুকের আওয়াজ। খুব জোর আওয়াজ নয়–চেপে দেওয়া আওয়াজ। দৌড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। বড়োজোর তিরিশ সেকেন্ড লেগেছে এ-ঘরে পৌঁছোতে।

দরজা খোলা দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, খোলাই ছিল। যেভাবে এখন দেখছেন, ডগলাস বেচারা পড়েছিল ঠিক ওইভাবে। টেবিলের ওপর জ্বলছিল ওর শোবার ঘরের মোমবাতি। মিনিট কয়েক পরে ল্যাম্পটা আমিই জ্বালাই।

কাউকে দেখেননি?

না। পায়ের আওয়াজে বুঝলাম মিসেস ডগলাস আমার পেছন পেছন দৌড়ে নেমে আসছেন। তাই তক্ষুনি ছুটে বেরিয়ে গিয়ে পথ আটকালাম ওঁর ভয়ংকর এই দৃশ্য যাতে দেখতে না-পান। হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন এসে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ওঁকে। ততক্ষণে অ্যামিস এসে গেছে। ওকে নিয়ে ফের ছুটে ঢুকলাম ঘরে।

কিন্তু আমি যে শুনেছি সারারাত ড্রব্রিজ ভোলা থাকে?

তাই থাকে। তোলাও ছিল। আমি গিয়ে নামাই।

তাহলে খুনি পালায় কেমন করে? সে-প্রশ্নই ওঠে না। মি. ডগলাস নিশ্চয় নিজেই নিজেকে গুলি করেছেন।

আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এই দেখুন, বলে পর্দা টেনে সরালেন বার্কার– দেখা গেল অসমকোণী হীরক-সদৃশ শার্সি বসানো লম্বা জানলা দু-হাত করে খোলা। এদিকে দেখুন! ল্যাম্পটা নামিয়ে ধরলেন গোবরাটের ওপর। এক ধ্যাবড়া রক্ত লেগে সেখানে। ঠিক যেন বুট জুতোর সুখতলার ছাপ। গোবরাট মাড়িয়ে বাইরে গেছে কেউ। দেখলেন তো গোবরাটে পা দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে ছিল ঘর থেকে বেরোনোর জন্যে।

তাহলে কি বলতে চান কাদা ঠেলে পরিখা পেরিয়েছে হত্যাকারী?

ঠিক তাই বলতে চাই।

তার মানে খুনের আধ মিনিটের মধ্যে আপনি যখন এ-ঘরে, সে তখন পরিখায় ?

কোনো সন্দেহই নেই তাতে। সেই মুহূর্তে জানালার সামনে দৌড়োনো উচিত ছিল আমার। কিন্তু পর্দা টানা ছিল বলে জানলা খোলা বুঝতে পারিনি। সম্ভাবনাটা মাথাতেও আসেনি। তারপরেই মিসেস ডগলাসের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। বেরিয়ে গেলাম যাতে ঘরে ঢুকে না-পড়েন, বীভৎস এ-দৃশ্য সইতে পারতেন না।

বীভৎস তো বটেই। খণ্ডবিখণ্ড মাথা ঘিরে ভয়ংকর চিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন ডাক্তার। বির্লস্টোন রেল অ্যাক্সিডেন্টের পর এ-রকমভাবে জখম হতে কাউকে দেখিনি।

খোলা জানলার-রহস্য থেকে মন্থর গ্রাম্যবুদ্ধিকে তখনও সরিয়ে আনতে পারেনি পুলিশ সার্জেন্ট। বললে, পরিখার কাদা ঠেলে পালিয়েছে বলছেন। বলে তো দিলেন। কিন্তু ব্রিজ যখন ভোলা ছিল তখন ভেতরে এল কী করে?

প্রশ্ন তো সেইটাই, বললেন বার্কার।

ক-টার সময়ে ভোলা হয়েছিল ব্রিজ?

ছ-টার সময়ে জবাব দিলে খাসচাকর অ্যামিস।

আমি তো শুনেছি সূর্য যখন অস্ত যায়, ব্রিজ তখন তোলা হয়। বছরের এ সময়ে সূর্য অস্ত যায় সাড়ে চারটে নাগাদ ছ-টায় নয়।

অ্যামিস বললে, মিসেস ডগলাস চায়ের মজলিশে বসেছিলেন অতিথিদের নিয়ে। ওঁরা–যাওয়া পর্যন্ত ব্রিজ তোলা যায়নি। তারপর আমি নিজে গিয়ে তুলে দিয়েছিলাম।

সার্জেন্ট বললে, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই বাইরে থেকে কেউ যদি এসেই থাকে, তাদের আসতে হয়েছে ব্রিজ তোলার আগেই ছ-টার আগে এসে লুকিয়ে ছিল কোথাও, মি. ডগলাস এগারোটা নাগাদ ঘরে ঢুকতেই চড়াও হয়েছে তাঁর ওপর।

ঠিক বলছেন। শুতে যাওয়ার আগে প্রতিদিন রাতে সারাবাড়ি টহল দিয়ে মি. ডগলাস দেখেন আলোগুলো ঠিক আছে কিনা। এ-ঘরেও এসেছিলেন সেই কারণে। ওত পেতে ছিল লোকটা ঘরে ঢুকতেই সটান গুলি করেছে মুখের ওপর। তারপর বন্দুক ফেলে বেরিয়ে গেছে জানলা দিয়ে। এভাবে ছাড়া আর কোনোভাবে সাজানো যায় না ঘটনাগুলো।

মৃত ব্যক্তির পাশে মেঝের ওপর একটা কার্ড পড়েছিল, তুলে নিল সার্জেন্ট। বদখত ধ্যাবড়াভাবে কালি দিয়ে কার্ডে লেখা একটা নামের আদ্যাক্ষর-V. V., এবং তলায় লেখা একটা সংখ্যা—৩৪১।

এটা কী? শুধোয় কার্ডটা তুলে ধরে।

কৌতূহলে উন্মুখ হয়ে কার্ডের দিকে তাকান বার্কার।

বললে, আগে লক্ষ করিনি। খুনি নিশ্চয় ফেলে রেখে গেছে।

V. 341.–মানে বুঝলাম না।
মোটা মোটা আঙুলে কার্ডখানা নাড়াচাড়া করতে থাকে সার্জেন্ট।

V. মানে কী? নিশ্চয় কারো নামের প্রথম অক্ষর। ড. উড, কী দেখছেন?
আগুনের চুল্লির ধারে কম্বলের ওপর পড়ে একটা হাতুড়ি বেশ বড়োসড়ো, কারিগরের হাতের হাতুড়ি। ম্যান্টেলপিসের ওপর একটা বাক্স দেখালেন সিসিল বার্কার বাক্সের মধ্যে তামার মাথাওলা অনেকগুলো পেরেক।

বললেন, কাল রাতে ছবি এদিক-ওদিক করছিলেন মি. ডগলাস। নিজেই চেয়ারে দাঁড়িয়ে বড়ো ছবিটা দেয়ালে টাঙাচ্ছিলেন। আমি দেখেছি। হাতুড়ি পড়ে আছে সেইজন্যেই।

হতবুদ্ধি সার্জেন্ট মাথা চুলকে বললে, যেখানকার হাতুড়ি সেখানেই রেখে দেওয়া ভালো। এ-রহস্যের শেষ দেখতে হলে দেখছি পুলিশ ফোর্সের সেরা ব্রেনের দরকার হবে। লন্ডনের লোক আনা দরকার। হাত-লক্ষ তুলে ধরে আস্তে আস্তে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত স্বরে, আরে! আরে! একী ? পর্দা সরানো হয়েছিল ক-টার সময়ে বলুন তো?

লক্ষ যখন জ্বালানো হয়েছিল তখন। চারটের একটু পরেই। বললে খাসচাকর।

নিশ্চয় কেউ লুকিয়ে ছিল এখানে। লম্ফটা নীচু করে ধরল সার্জেন্ট, কাদা-মাখা জুতোর চাপ স্পষ্ট দেখা গেল ঘরের কোণে। মি. বার্কার, আপনার অনুমানই ঠিক হল দেখছি। পর্দা সরানো হয়েছিল চারটের সময়ে, ব্রিজ ভোলা হয়েছে ছ-টার সময়ে লোকটা বাড়িতে ঢুকেছে চারটের পর কিন্তু ছ-টার আগে। এই ঘরটাই প্রথম চোখে পড়ছে বলে ঢুকে পড়েছিল। এই কোণ ছাড়া লুকোনোর জায়গা নেই বলে লুকিয়েছিল এইখানেই। এইতো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। এসেছিল চুরিচামারি করতে, মি. ডগলাস হঠাৎ তাকে দেখে ফেলেছিলেন–তাই তাকে খুন করে পালিয়েছে।

বার্কার বললেন, আমারও মনে তাই হয়েছে বটে। কিন্তু খামোখা সময় নষ্ট করছি কেন বলতে পারেন? এখানে দাঁড়িয়ে না-থেকে বেরিয়ে পড়লে কাজ দিত–দেশ ছেড়ে লম্বা দেওয়ার আগেই তাকে ধরা যেত।

প্রস্তাবটা মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করে সার্জেন্ট।

বলে, সকাল ছ-টার আগে আর ট্রেন নেই। কাজেই রেলপথে সে পালাতে পারবে না। ট্যাঙস ট্যাঙস করে রাস্তা ধরে যদি হাঁটতে শুরু করে, রক্তের ফোটা পড়বে রাস্তার লোকের চোখে পড়বে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই অন্য অফিসার না-আসা পর্যন্ত যেতে পারছি না আমি। আপনারা কেউ যাবেন না।

লম্ফর আলোয় লাশ পরীক্ষা করলেন ডাক্তার।

বললেন, এ-দাগটা কীসের? খুনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি?

ড্রেসিং গাউনের ডান হাতা থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল মৃত ব্যক্তির হাত–অনাবৃত হয়ে গিয়েছিল কনুই পর্যন্ত। বাহুর মাঝমাঝি জায়গায় একটা অদ্ভুত বাদামি নকশা বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ জ্বলজ্বল করছে শুয়োরের চর্বি রঙের চামড়ার ওপর।

চশমার মধ্যে দিয়ে চোখ পাকিয়ে দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন, উল্কি নয়। এ-রকম উল্কি জীবনে দেখিনি। গোরুছাগলকে যেমন দাগানো হয়, একে দাগানো হয়েছিল কোনো এক সময়ে। মানেটা কী?

সিসিল বাকার বললেন–মানেটা আমারও জানা নেই। তবে গত দশ বছর এ-দাগ ডগলাসের হাতে আমি দেখেছি।

আমিও দেখেছি, বললে খাসচাকর। আস্তিন গুটোলেই চোখে পড়েছে, মানে বুঝিনি।

সার্জেন্ট বললে, তাহলে খুনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা কিন্তু যাচ্ছেতাই! এ-কেসের সব কিছুই যাচ্ছেতাই। আবার কী হল?

সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে মৃতব্যক্তির ছড়ানো হাতের দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে খাসচাকর।

বললে দম আটকানো স্বরে, বিয়ের আংটিটা নিয়ে গেছে।

কী!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিয়ের আংটি উধাও হয়েছে! বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে পরতেন সাদাসিদে গড়নের সোনার আংটিটা। বিয়ের আংটি। এই দেখুন সোনার গুটি, এই দেখুন সাপ, নেই বিয়ের আংটি।

বলেছে ঠিক, বললেন বার্কার।

সার্জেন্ট বললেন, তাহলে বলছেন বিয়ের আংটি তলায় ছিল?

সবসময়েই তাই থাকে!

তাহলে খুনি যেই হোক না কেন, আগে খুলেছে গুটিপাকানো সাপ আংটি, তারপরে বিয়ের আংটি, শেষকালে সাপ আংটি ফের পরিয়ে দিয়েছে আঙুলে!

ঠিক তাই।

মাথা নাড়তে থাকে সুবিবেচক গ্রাম্য পুলিশ।

বলে, দেখছি যত তাড়াতাড়ি লন্ডনে খবর পাঠানো যায় ততই মঙ্গল। হোয়াইট ম্যাসোন তুখোড় লোক। স্থানীয় কোনো সমস্যাই তাঁর কাছে সমস্যা নয়। এখুনি এসে যাবেন তিনি। কিন্তু রহস্যভেদ করতে গেলে আমার তো মনে হয় লন্ডনের দ্বারস্থ হতে হবে। তবে হ্যাঁ, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এই ধরনের গোলমেলে কেসে আমার মাথা তেমন খোলে না।

অন্ধকার

বির্লস্টোনের সার্জেন্ট উইলসনের জরুরি তলব পেয়ে চিফ সাসেক্স ডিটেকটিভ রাত তিনটের সময় এক-ঘোড়ার হালকা গাড়ি চেপে দ্রুত গতি নিরুদ্ধ-নিশ্বাস ঘোড়ার পেছন পেছন এসে পৌঁছোলেন অকুস্থলে। আলো ফুটতেই পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনে খবর পাঠালেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্যে বির্লস্টোনে স্টেশনে হাজির রইলেন বারোটার সময়ে। হোয়াইট ম্যাসোন লোকটা শান্তশিষ্ট প্রকৃতির স্বচ্ছন্দ-চেহারার মানুষ। পরনে ঢিলেঢালা টুইড স্যুট। পরিষ্কার কামানো গাল, লাল-লাল মুখ, বলিষ্ঠ বপু। হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত চামড়ার পটি দিয়ে মোড়া পা-জোড়া একটু বাকা কিন্তু শক্তিশালী। দেখলে মনে হয় অবসরপ্রাপ্ত শিকারের জন্তুরক্ষক অথবা ছোটোখাটো কৃষক। ভূলোকের যেকোনো শ্রেণির মানুষ হিসেবে তাকে কল্পনা করা যায়–আদর্শ প্রাদেশিক ক্রিমিন্যাল অফিসারের উপযুক্ত নিদর্শন বলে মনে হয় না মোটেই।

সত্যিই একটা তুমুল ঝড় বলা চলে কেসটাকে, মি. ম্যাকডোনাল্ড। বারে বারে একই কথা বলে চলে ম্যাসোন। খবর ছড়িয়ে পড়লেই দেখবেন মাছির মতো ভন ভন করবে খবরের কাগজের লোকগুলো। ওরা এসে সূত্র-টুত্র নষ্ট করে ফেলার আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলতে চাই। এ-রকম কাণ্ড আর দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। মি. হোমস, আপনার অনেক খোরাক পাবেন। ডা. ওয়াটসন, আপনিও পাবেন–ডাক্তারি শাস্ত্রের দরকার আছে তদন্তটায়। ওয়েস্টভিল আর্মস-এ আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

থাকার জায়গা আর নেই–তবে শুনেছি জায়গাটা ভালো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আপনাদের ব্যাগ নিয়ে যাবে এই লোকটা। এইদিকে আসুন!

ভদ্রলোক ভারি চটপটে, দৌড়ঝাঁপে ওস্তাদ এবং অতিশয় অমায়িক। দশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম যে-যার ঘরে। পরের দশ মিনিটে সরাইখানার বারান্দায় বসে শুনলাম সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জি আগের অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে। মাঝে মাঝে পয়েন্ট লিখে নিলেন ম্যাকডোনাল্ড। কিন্তু তন্ময়চিত্তে সব শুনে গেল হোমস ভাবে-ভঙ্গিতে ফুটে রইল বিস্ময়, ভক্তি আর প্রশংসা–দুর্লভ এবং দুমূর্ল প্রস্ফুটিত পুষ্প অবলোকনের সময়ে যেমনটি দেখা যায় উদ্ভিদবিদের চোখে-মুখে।

গল্প শেষ হলে বললে, চমৎকার! সত্যিই অতি চমৎকার আর কোনো কেসে এত আশ্চর্য আর অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আমি দেখিনি।

ভীষণ খুশি হয়ে হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, আমি জানতাম আপনি তাই বলবেন মি. হোমস। সাসেক্সে আমরাও পেছিয়ে নেই। রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে সার্জেন্ট উইলসনের কাছ থেকে কেসটা বুঝে নেওয়ার সময়ে কী পরিস্থিতি দেখেছি আপনাকে তা বলেছি। বুড়ো ঘোড়াটাকে যা জোর ছুটিয়েছি যে বলবার নয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার দরকার ছিল না। সার্জেন্ট উইলসন সব ঘটনা লিখে রেখেছে। আমি মিলিয়ে দেখেছি। ভেবেছি। দেখলাম বাড়তি পয়েন্ট দু-চারটে জোড়া যায়।

যেমন? সাগ্রহে শুধোয় হোমস।

হাতুড়িটাকে সবার আগে পরীক্ষা করেছিলাম। ড. উড সাহায্য করেছিলেন। মারপিটের চিহ্ন নেই হাতুড়িতে। ভেবেছিলাম মেঝের ওপর ফেলে দেওয়ার আগে নিশ্চয় হাতুড়ি মেরে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন মি. ডগলাস। হত্যাকারীকে হয়তো মেরেওছেন। কিন্তু কোনো দাগ নেই।

তাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণিত হয় না। মন্তব্য করলেন ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড। হাতুড়ি-হত্যা তো বড়ো কম হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই হাতুড়িতে দাগ থাকে না।

তা ঠিক। আদৌ হাতুড়ি মারা হয়েছে কিনা দাগ না-থাকলে তা বলা যায় না ঠিকই। কিন্তু দাগ থাকলেও থাকতে পারত, সেক্ষেত্রে আমাদের কাজের সুবিধে হত। কিন্তু আদতে সে-রকম কোনো দাগ নেই। তারপর পরীক্ষা করলাম বন্দুকটা। হরিণ মারা বড়ো গুলির খোল রয়েছে ভেতরে এবং ট্রিগার দুটো তার দিয়ে বাঁধা–সার্জেন্ট উইলসন যেমনটি দেখেছিলেন। ফলে পেছনের ট্রিগার টিপলেই দুটো নল থেকেই গুলি বেরিয়ে যায়। এভাবে ট্রিগার বেঁধে জোড়া-গুলি ছোড়ার ব্যবস্থা যে করেছে, সে মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল গুলি ফসকালে চলবে না–মারতেই হবে যে করে হোক। করাত দিয়ে কাটা বন্দুকটা লম্বায় দু-ফুটের বেশি নয়–কোটের তলায় লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। বন্দুক নির্মাতার পুরো নাম কোথাও নেই। দুটো নলের মাঝের খাঁজে PEN এই তিনটি অক্ষর কেবল রয়ে গেছে বাদবাকি নাম করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে।

P-টা বড়ো, মাথার দিকে কারুকাজ–E আর N-টা তার চাইতে ছোটো, তাই না? শুধোয় হোমস।

একেবারে ঠিক।

পেনসিলভানিয়া স্মল আর্ম কোম্পানি-নাম করা আমেরিকান সংস্থা। বললে হোমস।

গাঁইয়া ডাক্তার যে-অসুখ ধরতে না-পেরে নাকের জলে চোখের জলে হন, সেই অসুখের নাম, নিদান এবং চিকিৎসা এক কথাতেই হার্লে স্ট্রিট চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ যখন বলে দেন, তখন গেঁইয়া ডাক্তারটি চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞের পানে যে-চোখে তাকান, সেই চোখে হোয়াইট ম্যাসোন তাকালেন আমার বন্ধুটির দিকে।

চমৎকার বলেছেন, মি. হোমস! ওয়ান্ডারফুল! ওয়ান্ডারফুল! কথাটা খুব কাজে লাগবে আমাদের। আপনি কি পৃথিবীর সমস্ত বন্দুক নির্মাতাদের নামধাম মুখস্থ করে রেখেছেন?

তাচ্ছিল্য ভরে হাত নেড়ে প্রসঙ্গ বাদ দিল হোমস।

বলে চললেন হোয়াইট ম্যাসোন, বন্দুকটা আমেরিকান শট গানই বটে। কোথায় যেন পড়েছি আমেরিকায় কোথাও কোথাও করাত দিয়ে কাটা শট-গান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নলচেতে লেখা নামটা ছাড়াই সম্ভাবনাটা মাথায় এসেছিল আমার। তাহলে

একটা প্রমাণ পাওয়া গেল, বাড়ির মধ্যে যে এসেছিল বাড়ির মালিককে খুন করতে সে আমেরিকান।

মাথা নেড়ে ম্যাকডোনাল্ড বললেন, ওহে, তুমি দেখছি বড্ড তাড়াতাড়ি এগুচ্ছো। বাড়ির মধ্যে আদৌ বাইরের লোক ঢুকেছিল কিনা এখনও কিন্তু সে-প্রমাণ আমি পাইনি।

খোলা জানলা, গোবরাটে রক্ত, অদ্ভুত কার্ড, কোণে বুটজুতোর ছাপ, বন্দুক।

এর মধ্যে এমন কিছু নেই যা আগে থেকে সাজিয়ে রাখা যায় না। মি. ডগলাস নিজে হয়তো আমেরিকান ছিলেন, অথবা হয়তো আমেরিকায় দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন। মি. বার্কারও ছিলেন আমেরিকায় দীর্ঘদিন। আমেরিকান কাণ্ডকারখানা প্রমাণ করবার জন্যে বাড়ির বাইরে থেকে আমেরিকান আদমি আমদানি না-করলেও চলবে।

খাসচাকর অ্যামিস—

লোকটা কি বিশ্বাসী?

স্যার চার্লস চান্ডােজের চাকরিতে ছিল দশ বছর নিরেট পাথরের মতোই বিশ্বাসী। পাঁচ বছর আগে ম্যানর হাউসে মি. ডগলাস আসার পর থেকেই সঙ্গে আছে। এ-বন্দুক বাড়ির মধ্যে কখনো দেখেনি।

লুকিয়ে রাখবার জন্যে নল কাটা হয়েছিল বন্দুকের। যেকোনো বাক্সের মধ্যে রেখে দিলে কারো চোখে পড়ার কথা নয়। কাজেই বাড়ির মধ্যে এ-বন্দুক কখনো ছিল না, দিব্যি গেলে এ-কথা বলছে কী করে?

যাই হোক, বন্দুকটা ও কখনো দেখেনি।

ম্যাকডোনাল্ড তার গোঁয়ার স্কচ মাথা নেড়ে বললে, বাড়ির মধ্যে কেউ এসেছিল এমন প্রমাণ কিন্তু এখনও আমি পেলাম না। বলতে বলতে উচ্চারণে অ্যাবারডোনিয়ান টান এনে ফেললেন ভদ্রলোক। কথায় ডুবে গেলেই যা হয় আর কী। Consider-কে বললেন Conseeder. বাইরে থেকে এ-বন্দুক বাড়ির মধ্যে আনা হয়েছিল এবং বাইরের লোক বাড়িতে ঢুকে কাজ সেরে লম্বা দিয়েছে–উঃ ভাবাও যায় না। সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তা সম্ভব নয়। মি. হোমস, আপনি তো সব শুনলেন, আপনিই এখন বিচার করে দেখুন না কেন।

বিচারপতিসুলভ মুখ করে হোমস বললে–বেশ তো মি. ম্যাক, বলুন আপনার কেস।

বাড়িতে কেউ ঢুকেছিল যদি ধরেও নেওয়া যায়, তাহলে সে আর যাই হোক, চোর ছাচোড় নয়। আংটির ব্যাপার আর কার্ডখানা দেখেই বোঝা যায় খুনটা পূর্বপরিকল্পিত– কারণটা ব্যক্তিগত। বহুত আচ্ছা। খুন করার পাক্কা অভিসন্ধি নিয়ে তাহলে বাড়ি ঢুকল একটা লোক। বাড়ি ঘিরে পরিখা থাকার ফলে সে জানে, আদৌ যদি কিছু সে জেনে থাকে যে খুন-টুন করে পালাবার সময়ে মুশকিলে পড়তে হবে, তখন কী ধরনের অস্ত্র

সে বাছবে বলুন তো? যে-অস্ত্রে কোনো আওয়াজই হয় না, কেমন ? তাহলেই বরং খুন করার পর জানলা গলে বাইরে বেরিয়ে ধীরেসুস্থে জল কাদা ঠেলে পেরিয়ে যেতে পারবে পরিখা। তার একটা মানে হয়। কিন্তু তা না-করে যে-অস্ত্রে কানফাটা আওয়াজে চক্ষের নিমেষে লোকজন ছুটে আসবে খুনের জায়গায় এবং পরিখা পেরোনোর আগেই চোখে পড়ে যাবে বাড়ির লোকের সে-অস্ত্র নিয়ে খুন করতে আসার কোনো মানে তো আমার মাথায় ঢুকছে না। আপনিই বলুন মি. হোমস এমন কি সম্ভব?

চিন্তিত মুখে হোমস বললে, বললেন তো ভালোই–ফাঁক নেই কোথাও। মি. হোয়াইট ম্যাসোন, একটা প্রশ্ন : বাড়ি এসেই কি পরিখার ওপর পাড় দেখে এসেছিলেন? জল থেকে কেউ উঠলে তীরে চিহ্ন থাকার কথা কিন্তু।

সে-রকম কোনো চিহ্ন ছিল না মি. হোমস। তা ছাড়া পাড়টা পাথর দিয়ে বাঁধানো চিহ্নর আশা করা যায় না।

কোনোরকম পায়ের ছাপ-টাপ?

কিস্‌সু না।

বটে! মি. হোয়াইট ম্যাসোন, এখুনি বাড়ির দিকে গেলে কি আপত্তি আছে আপনার? ছোটোখাটো দু-একটা পয়েন্ট হয়তো কাজে লাগতে পারে।

আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম মি. হোমস। যাওয়ার আগে ভাবছিলাম সব ঘটনা শুনিয়ে রাখি। যদি কোথাও খটকা লাগে–দ্বিধাগ্রস্তভাবে শখের গোয়েন্দার পানে তাকান হোয়াইট ম্যাসোন।।

মি. হোমসের সঙ্গে এর আগেও কাজ করেছি আমি। যা করবার উনিই করবেন। বললেন ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

হাসল হোমস। বলল, আমার কাজের অবশ্য একটা নিজস্ব ধরন আছে। আমি কেস হাতে নিই বিচার বিভাগ আর পুলিশের কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। সরকারি বাহিনী থেকে যদিও-বা কখনো আমাকে সরে থাকতে দেখা যায়–জানবেন সরিয়ে রাখা হয়েছে বলেই সরে থেকেছি। ওঁদের মেহনত নিয়ে নিজে বাহাদুরি কিনতে চাই না। সেইসঙ্গে এও জেনে রাখবেন, মি. হোয়াইট ম্যাসোন, আমি কাজ চালাই আমার নিজস্ব পদ্ধতিতে ফলাফল জানাই যখন সময় হয়েছে বুঝি তখন পুরোটাই একবারে জানাই বারে বারে অল্প অল্প করে নয়।

অমায়িক কণ্ঠে হোয়াইট ম্যাসসান বললেন, আপনি এসে আমাদের ধন্য করেছেন, মি. হোমস। যা জানি সব আপনাকে দেখিয়ে সম্মানিত বোধ করব নিজেদের। আসুন ড. ওয়াটসন, সময় হলে আপনার গল্পের বইতে আমাদের ঠাঁই পাওয়ার আশা রইল।

অদ্ভুতদর্শন গেঁয়ো পথ মাড়িয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। দু-পাশে চুড়োহীন মুড়ো এলম গাছের সারি। ঠিক তারপরেই দুটো সুপ্রাচীন পাথরের থাম, রোদেজলে বাতাসে মলিন,

শ্যাওলায় ঢাকা। চুড়োয় দুটো বেঢপ আকার-বিহীন পাথরের মূর্তি–এককালে পাথরের সিংহ-মূর্তি ছিল নিশ্চয় সামনের থাবা মেলে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বির্লস্টোনের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে। আঁকাবাঁকা পথ ধরে একটু হাঁটতে হল–চারিপাশে কেবল সবুজ ঘাসে ছাওয়া জমি আর ওক গাছ–ইংল্যান্ডের পল্লিঅঞ্চলের যা সম্পদ। তারপরেই রাস্তা আচমকা মোড় নিয়ে শেষ হয়েছে একটা মান্ধাতা আমলের বাড়ির সামনে। জ্যাকেবিয়ান হাউস। টানা, লম্বা, নীচু। বিবর্ণ, যকৃৎ রঙিন ইট। দু-পাশে ডাল-পালাকাটা চিরসবুজ ইউ গাছ এবং সেকেলে ধাঁচের বাগান। আর একটু এগোতেই দেখা গেল কাঠের তৈরি ড্রব্রিজ আর ভারি সুন্দর চওড়া পরিখা। শীতের রোদে স্থির চকচক করছে পারদের মতো। এই সেই সুপ্রাচীন ম্যানর হাউস যার মাথার ওপর দিয়ে গেছে তিন-তিনটে শতাব্দীর অনেক ইতিহাস। কত নতুন প্রাণ জন্ম নিয়েছে এই ইটের ভবনে। বিদেশি সফর শেষ করে ফিরে এসেছে কত দুর্দান্ত ব্যক্তি, কত গ্রাম্য নাচের আসর আর শিয়াল-শিকারিদের মিলন-উৎসব বসেছে এই ইমারতের চৌহদ্দিতে। এত বয়েসে এমন একটা সম্ভ্রান্ত অট্টালিকার দেওয়ালে কুচক্রীর করাল ছায়াপাত ঘটেছে ভাবতে কেমন যেন অবাক লাগে। তবুও বলব অনেক ভয়ানক ক্রূর ষড়যন্ত্রের আলয় যেন ওই অদ্ভুতদর্শন সূচালো ছাদ আর ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা দেওয়ালের বিচিত্র তিনকোনা উপরিভাগ। ভেতরে ঢোকানো জানলা আর ম্যাড়মেড়ে রঙের জল-ছলছলানে টানা লম্বা সামনের দিকটা দেখেই মনে হল এ বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপযুক্ত এর চাইতে ভালো জায়গা আর আছে কিনা সন্দেহ।

হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, এই সেই জানালা–ড্রব্রিজ থেকে নেমেই ডান দিকে। কাল রাতে যেভাবে খোলা ছিল–এখনও খোলা রয়েছে সেইভাবে।

মানুষ গলার পক্ষে বড্ড সরু জানলা দেখছি।

লোকটা আর যাই হোক, মোটকা নয়। আপনার অবরোহ সিদ্ধান্ত ছাড়াই কিন্তু ও-কথা বলতে পারি। তবে আপনি বা আমি গলে যেতে পারি।

পরিখার পাড়ে হেঁটে গেল হোমস, তাকাল ওপরে। তারপর খুঁটিয়ে দেখল পাথরের পাড় আর পাশে ঘাসের বর্ডার।

হোয়াইট ম্যাসসান বললেন, আমি ভালো করেই দেখেছি মি. হোমস। দাগ-টাগ কিছু নেই। জল ঠেলে ওঠার কোনো চিহ্ন নেই। তা ছাড়া চিহ্নই-বা সে রাখতে যাবে কেন?

ঠিক বলেছেন। চিহ্ন রাখতে যাবে কেন? জল কি এ-রকম বরাবর ঘোলা?

সাধারণত এইরকম রং থাকে। স্রোতের সঙ্গে কাদামাটি আসে।

গভীরতা?

পাড়ের কাছে ফুট দুয়েক–মাঝামাঝি জায়গায় ফুট তিনেক!

পরিখা পেরোতে গিয়ে ডুবে মরেছে, এ-সম্ভাবনা তাহলে নাকচ করা যায়?

নিশ্চয়। বাচ্চার পক্ষেও জলে ডুবে মরা সম্ভব নয়।

ড্রব্রিজ হেঁটে পেরিয়ে এলাম। পথ দেখিয়ে ভেতরে নিয়ে গেল অদ্ভুত চেহারার শুকনো খটখটে টাইপের গাঁটযুক্ত একটা লোক খাসচাকর অ্যামিস। বুড়ো বেচারা ভয়ে সাদা হয়ে গেছে–কাঁপছে ঠক-ঠক করে। খুনের ঘরে তখনও ডিউটি দিচ্ছিল গ্রাম্য সার্জেন্ট–বিষণ্ণবদন, দীর্ঘকায়, শিষ্টাচারনিষ্ঠ। বিদায় নিয়েছেন কেবল ডাক্তার।

তাজা খবর কিছু আছে নাকি, সার্জেন্ট উইলসন? শুধোলেন হোয়াইট ম্যাসোন।

আজ্ঞে না।

তাহলে তুমি বাড়ি যাও। যথেষ্ট করেছ। দরকার পড়লে ডেকে পাঠাবখন। খাসচাকর বাইরে অপেক্ষা করুক। ওকে দিয়ে খবর পাঠাও মি. সিসিল বার্কার, মিসেস ডগলাস আর হাউস-কিপারের কাছে শিগগিরই ডাকতে পারি। এবার আমার যা মনে হয়েছে আগে তাই বলি–তাতে আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হবে।

ভদ্রলোক গাঁইয়া বিশেষজ্ঞ হলে কী হবে, মনে দাগ রেখে যায়। প্রত্যেকটা ঘটনার খবর তিনি রাখেন, মাথাটিও ঠান্ডা, পরিষ্কার এবং সহজ বুদ্ধিতে ঠাসা ফলে এ-পেশায় জীবনে অনেক উন্নতি করবেন। সরকারি বড়ো গোয়েন্দা ঘনঘন অসহিষ্ণুতা দেখালেও হোমস তন্ময়চিত্তে সব কথা শুনল–এতটুকু অসহিষ্ণুতা দেখাল না।

আমাদের প্রথম প্রশ্ন হল, এটা হত্যা না, আত্মহত্যা–তাই নয় কি জেন্টলম্যান? আত্মহত্যা যদি হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে ইনি প্রথমে বিয়ের আংটি খুলে লুকিয়ে রেখেছেন, তারপর ড্রেসিং গাউন পরে এই ঘরে নেমে এসেছেন, পর্দার আড়ালে ঘরের কোণে কাদা-মাড়ানো জুতোর ছাপ রেখেছেন যাতে মনে হয় ওত পেতে ছিল কেউ, জানালা খুলেছেন, গোবরাটে রক্ত রেখেছেন—

আত্মহত্যার সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যেতে পারে, বললে ম্যাকডোনাল্ড।

আমারও তাই মনে হয়। সুইসাইডের প্রশ্নই ওঠে না। তাহলে এটা হত্যা। এখন প্রথমে বার করতে হবে হত্যাকারি বাইরের লোক না ভেতরের লোক।

শোনা যাক তোমার যুক্তি।

অসুবিধে দু-দিকেই আছে। তা সত্ত্বেও দুটোর একটা হতে হবে। প্রথমে ধরে নেওয়া যাক বাড়ির কেউ বা কয়েকজন এ-কাজ করেছে। এমন সময়ে এঁকে নীচে নামিয়ে এনেছে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ, অথচ কেউ ঘুমোয়নি। তারপর এমন একটা অদ্ভুত আওয়াজওলা অস্ত্র দিয়ে কাজ সেরেছে যার আওয়াজে চক্ষের নিমেষে জেনে গেছে ব্যাপারটা কী–অথচ সে-অস্ত্র বাড়িতে আগে দেখা যায়নি। সূচনাটা নিশ্চয় সম্ভবপর মনে হচ্ছে না, তাই নয় কি?

না মোটেই মনে হচ্ছে না।

তাহলে সবাই মানছেন যে আওয়াজটা হওয়ার এক মিনিটের মধ্যে বাড়িসুষ্ঠু লোক জড়ো হয়েছিল এখানে অ্যামিস থেকে আরম্ভ করে সবাই। তাহলে কি বলতে চান এইটুকু সময়ের মধ্যে অপরাধী কোণে দাগ ফেলেছে, জানলার পাল্লা খুলেছে, গোবরাটে রক্ত লাগিয়েছে, মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নিয়েছে এবং তারপরেও অনেক কাণ্ড করেছে? অসম্ভব!

হোমস বললে, ভারি সুন্দর বলেছেন। জলের মতো পরিষ্কার। একমত আপনার সঙ্গে!

তাহলে ফিরে আসতে হচ্ছে থিয়োরিতে লোকটা এসেছিল বাইরে থেকে। অসুবিধে এখনও অনেক রয়েছে, কিন্তু সেসবকে আর অসম্ভব বলা যায় না। লোকটা বাড়ি ঢুকেছে সাড়ে চারটে থেকে ছ-টার মধ্যে তার মানে সন্ধে যখন হচ্ছে তখন থেকে ড্রব্রিজ ওঠানোর মধ্যে। বাড়িতে অতিথি ছিলেন, দরজা খোলা ছিল, কাজেই বাধা পাওয়ার কথাও নয়। হয়তো সে মামুলি চোর ছাচোড় অথবা আগে কোনো কারণে রাগ ছিল মি. ডগলাসের ওপর। ব্যক্তিগত আক্রমণের থিয়োরিটা অনেক বেশি সম্ভবপর দুটি কারণে প্রথমত, মি. ডগলাস জীবনের বেশির ভাগ কাটিয়েছেন আমেরিকায়। দ্বিতীয়ত শটগানটা মনে হচ্ছে আমেরিকার তৈরি। এই ঘরটাই আগে পড়ে বলে সুট করে জানলা খুলে ঢুকল ভেতরে, লুকিয়ে রইল পর্দার আড়ালে। রইল রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত। ওই সময়ে ঘরে ঢুকলেন মি. ডগলাস। কথাবার্তা হয়েছে খুবই কম আদৌ যদি হয়ে থাকে।

কেননা মিসেস ডগলাস বলছেন মি. ডগলাস তার কাছ থেকে চলে আসার পর বন্দুকের আওয়াজ শোনা পর্যন্ত সময়টা কয়েক মিনিটের বেশি নয়।

মোমবাতিও তাই বলে, বললে হোমস।

ঠিক বলেছেন। মোমবাতিটা নতুন, কিন্তু আধ ইঞ্চির বেশি পোড়েনি। আক্রান্ত হওয়ার আগেই টেবিলে রেখেছিলেন মোমবাতি, নইলে ঠিকরে পড়ত মেঝেতে। এ থেকেই বোঝ যাচ্ছে ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয়নি আততায়ী। মি. বার্কার ঘরে ঢুকে লক্ষ জ্বেলেছিলেন।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

বেশ, এখন এই লাইনেই ঘটনাগুলো তৈরি করে নেওয়া যাক। মি. ডগলাস ঘরে ঢুকলেন। মোমবাতি টেবিলে রাখলেন। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। হাতে তার শট গান। বিয়ের আংটিটা সে খুলে দিতে বললে–ভগবান জানেন কেন বললে–কিন্তু আংটিই চাওয়া হয়েছিল। আংটি দিলেন মি. ডগলাস। তারপরই হয় ঠান্ডা মাথায়, আর না হয় ধস্তাধস্তির ফলে এইরকম বীভৎসভাবে ডগলাসকে গুলি করল লোকটা মাদুরের ওপর পড়ে থাকা হাতুড়ি তুলে হয়তো মারতে গিয়েছিলেন। ডগলাস বন্দুক ফেলে দিয়ে অদ্ভুত কার্ডটা রাখল পাশে কার্ডে লেখা V. V. 341-এর মানে যাই হোক না কেন–পালিয়ে গেল জানলা দিয়ে–সিসিল বার্কার যখন এ-ঘরে মৃতদেহ আবিষ্কার

করছেন, ঠিক তখনই সে পরিখা পেরোচ্ছে। কীরকম লাগল বলুন, মি. হোমস। অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং, কিন্তু একটু কম বিশ্বাসযোগ্য।

ফেটে পড়ল ম্যাকডোনাল্ড এক্কেবারে ননসেন্স কথাবার্তা। খুন একজন করেছে ঠিকই কিন্তু তুমি যেভাবে বললে সেভাবে ছাড়াও যে খুনটা হতে পারে, পরিষ্কার প্রমাণ করে দিতে পারি আমি। পালানোর পথ বন্ধ করে তার লাভ? নিস্তব্ধতাই যখন তার চম্পট দেওয়ার একমাত্র সুযোেগ, শট-গান ছুঁড়ে সেই সুযোগ নষ্ট করে তার লাভ? মি. হোমস, আপনিই পথ দেখান নিজেই তো বললেন মি. হোয়াইট ম্যাসোনের যুক্তি আপনার মনে ধরেনি।

তন্ময় হয়ে কথা শুনছিল হোমস। সজাগ কানে প্রতিটি শব্দ ধরে রেখেছে, তীক্ষ্ণ চোখে ডাইনে-বাঁয়ে সমানে ঘুরিয়েছে এবং গ্রন্থিল ললাটে দূর-কল্পনা ফুটিয়ে তুলেছে।

এখন হাঁটু গেড়ে বসল মৃতদেহের পাশে। বলল, মি. ম্যাক, আরও কিছু ঘটনা হাতে না-এনে থিয়োরি খাড়া করাটা ঠিক হবে না। আরে সর্বনাশ! চোটগুলো দেখছি সত্যিই বীভৎস! খাসচাকরকে একটু ডাকা যাবে?... অ্যামিস, ডগলাসের হাতে বৃত্তের মাঝে ত্রিভুজের এই অত্যন্ত অদ্ভুত দাগটা নাকি প্রায়ই তোমার চোখে পড়ত?

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

দাগটার মানে কী হতে পারে, এই ধরনের আন্দাজি কথাবার্তা কানে এসেছে?

আজ্ঞে , না।

দাগটা দেওয়ার সময়ে নিশ্চয় যন্ত্রণাও খুব হয়েছিল। নিঃসন্দেহে পোড়ানোর দাগ। মি. ডগলাসের চোয়ালের কোণে ছোট্ট এক টুকরো প্লাস্টার দেখেছি। উনি বেঁচে থাকার সময়ে এ-প্লাস্টার দেখেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গতকাল সকালে দাড়ি কামাতে গিয়ে কেটে ফেলেছিলেন।

এর আগে কখনো দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কেটে ফেলতে দেখেছ?

অনেক দিন হল দেখিনি।

প্রণিধানযোগ্য? বললে হোমস। নিছক কাকতালীয় হতে পারে, অথবা ঘাবড়ে থাকার লক্ষণও হতে পারে–আসন্ন বিপদাশঙ্কার ভয়ে সিটিয়ে থাকার লক্ষণ। অ্যামিস, গতকাল ওঁর ব্যবহারে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছিলেন?

একটু অস্থির আর উত্তেজিত দেখেছিলাম।

আচ্ছা! আক্রমণটা তাহলে হয়তো অপ্রত্যাশিত নয়। একটু এগাতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে নয় কি? মি. ম্যাক, জেরাটা নিশ্চয় আপনিই করবেন?

না, মি. হোমস। আমার চেয়ে ভালো লোকের হাতে জেরার ভার তো রয়েছে।

বেশ, বেশ, তাহলে এই কার্ডটা নিয়ে কথা বলা যাক– V.V. 341... এবড়োখেবড়ো কার্ডবোর্ড। এ ধরনের বোর্ড বাড়ির মধ্যে আছে?

মনে তো হয় না।

ডেস্কের সামনে গেল হোমস। দুটো দোয়াত থেকেই একটু করে কালি শুষে নিল ব্লটিংপেপারে। বললে, এ-ঘরে এ-লেখা হয়নি। এটা কালো কালি, বোর্ডের লেখাটা একটু বেগুনি। মোটা কলমে লেখা–এ-কলমগুলোর নিব দেখছি বেশ সরু। না, এ অন্য কোথাও লেখা হয়েছে। অ্যামিস, লেখা দেখে তোমার কিছু মনে হচ্ছে?

আজ্ঞে না, একদম না।

মি. ম্যাক, আপনার কী মনে হয়?

গুপ্তসমিতি-টমিতি গোছের কিছু একটা ব্যাপার এর মধ্যে আছে মনে হচ্ছে। তাদের এই ব্যাজটাও সেই সমিতির চিহ্ন।

আমারও তাই ধারণা, বললেন হোয়াইট ম্যাসোন।

কাজ চালানোর অনুমিতি হিসেবে ধারণাটা গ্রহণ করা যেতে পারে। তারপর দেখা যাবেখন অসুবিধাগুলো অদৃশ্য হয় কতখানি। এই ধরনের একটা সমিতির একজন চর ঢুকল বাড়িতে, ওত পেতে রইল মি. ডগলাসের জন্যে, মাথা উড়িয়ে দিল এই অস্ত্র দিয়ে, পালিয়ে গেল পরিখার জলকাদা ঠেলে তার আগে মৃতব্যক্তির পাশে রেখে দিল এই কার্ডখানা, যাতে খবরটা সংবাদপত্রে ছাপা হলেই সমিতির অন্য সদস্যরা জেনে যায় যে প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেছে। সব তো হল। বেশ খাপ খেয়ে গেল। কিন্তু দুনিয়ার এত অস্ত্র থাকতে এ-অস্ত্রটা আনা হল কেন?

ঠিক বলেছেন।

আংটিটাই-বা খোয়া গেল কেন?

ঠিকই তো।

কেউ ধরাই-বা পড়ল না কেন? দুটো বেজে গেছে। ধরে নিচ্ছি, ভোর থেকেই চল্লিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি কনস্টেবল হন্যে হয়ে খুঁজছে জলে-ভেজা একজন আগন্তুককে।

তা ঠিক, মি. হোমস।

কাজেই যদি কোথাও লুকিয়ে না-পড়ে অথবা জামাকাপড় পালটে ভোল ফিরিয়ে না-নেয়, তাহলে কিন্তু তার ধরা পড়ে যাওয়া উচিত। পুলিশের চোখে পড়তই। তা সত্ত্বেও দেখুন, এখনও পর্যন্ত সে পুলিশের চোখে পড়েনি। জানালার সামনে গিয়ে আতশকাচ দিয়ে গোবরাটের রক্তচিহ্ন দেখতে দেখতে বললে হোমস। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে জুততার ছাপ। আশ্চর্য রকমের চওড়া–চ্যাপটা বলা চলে। অদ্ভুত তো। কোণের এই কাদার ছাপ থেকে এইটুকুই শুধু ধরা যাচ্ছে যে শুকতলার আকারটা ভালো। ছাপগুলো কিন্তু অত্যন্ত অস্পষ্ট। সাইড টেবিলের তলায় এটা আবার কী?

মি. ডগলাসের ডাম্বেল, বললে অ্যামিস।

ডাম্বেল একটাই তো দেখছি। আর একটা কোথায়?

জানি না, মি. হোমস। একটাই হয়তো আছে। অনেকদিন দেখিনি ডাম্বেল দুটো।

একটা ডাম্বেল–সিরিয়াস হোমসের কণ্ঠ, কিন্তু কথা শেষ হওয়ার আগেই জোরালো টোকা পড়ল দরজায়। সটান আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম দীর্ঘকায় এক পুরুষকে, রোদেপোোড়া মুখ, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামাননা, শক্তসমর্থ ক্ষিপ্র আকৃতি। যাঁর কথা শুনেছি, ইনিই যে সেই সিসিল বার্কার তা বুঝতে দেরি হল না আমার। কর্তৃত্বব্যঞ্জক দুই চোখের জিজ্ঞাসাপূর্ণ দৃষ্টি পিচ্ছিল মসৃণ গতিতে ঘুরে গেল আমাদের প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে।

বললে, কথায় বাগড়া দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু সর্বশেষ ঘটনাটা আপনাদের জানা দরকার।

ধরা পড়েছে?

অদৃষ্ট অতটা প্রসন্ন নয়! তবে তার সাইকেলটা পাওয়া গেছে। সাইকেল ফেলেই পালিয়েছিল। আসুন না, এসে দেখে যান। বেশি দূর নয়, সদর দরজা থেকে এক-শো গজের মধ্যে।

চিরহরিৎ ঝোপঝাড়ের লুকোনো জায়গা থেকে সাইকেলটা টেনে বার করে রাস্তায় রেখে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন সহিস আর নিষ্কর্মা ব্যক্তি। রাজ-হুইটওয়ার্থ সাইকেল, বহু ব্যবহারে জীর্ণ, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কর্দমাক্ত। একটা ঝোলার মধ্যে তেলের টিন আর স্প্যানার যন্ত্র মালিক সম্বন্ধে এ ছাড়া আর সূত্র নেই।

ইনস্পেকটর বললেন, পুলিশের দারুণ কাজে লাগবে। নম্বর লাগিয়ে খাতায় লিখে রাখা যাক। জিনিসটা পেয়ে আমাদের উপকার হবে ঠিকই, কোন চুলোয় সে গেছে জানতে–পারলেও কোত্থেকে এসেছে এবার জানা যাবে। কিন্তু এমন একটা জিনিস ফেলে যাওয়ার কারণটা তো বুঝছি না। এটা ফেলে রেখেই-বা সে গেল কোথায়? মি. হোস, মাথায় কিছুই ঢুকছে না।

তাই নাকি? চিন্তা নিবিড় মুখে বলে বন্ধুবর। ভারি আশ্চর্য তো।

নাটকের পাত্রপাত্রী

বাড়িতে ফিরে আসার পর হোয়াইট ম্যাসোন জিজ্ঞেস করলেন, পড়ার ঘরের সব কিছু দেখেছেন তো?

ইনস্পেকটর বলল, এখনকার মতো যা দেখবার দেখছি। মাথা নেড়ে নীরবে সায় দিল হোমস।

এবার নিশ্চয় বাড়ির লোকের জবানবন্দি নেবেন? ডাইনিংরুমে বসা যাক। অ্যামিস, আগে তোমার পালা। বলো কী জানো।

খাসচাকরের বক্তব্য সরল এবং পরিষ্কার। আন্তরিকতার জন্য বিশ্বাস জাগায়। মি. ডগলাস পাঁচ বছর আগে বির্লস্টোনে আসেন। তখন থেকেই সে কাজে বহাল হয়েছে। এইটুকু সে বুঝেছে যে মি. ডগলাস অনেক টাকার মালিক এবং টাকা তিনি রোজগার করেছেন আমেরিকায়। মনিব হিসেবে দয়ালু, বিচক্ষণ ঠিক যেরকম মনিবের সঙ্গে আগে ঘর করেছে অ্যামিস, সে-রকমটি না-হলে চমৎকার–তা ছাড়া সবকিছুই একসঙ্গে সবার ভাগ্যে জোটে না। মি. ডগলাসকে কখনো ভয়ে কুঁচকে থাকতে সে দেখেনি বরং উলটোটাই দেখেছে–জীবনে এমন নির্ভীক পুরুষ সে কখনো দেখেনি। রাত হলেই ড্রব্রিজ তুলে রাখার নির্দেশ মি. ডগলাসেরই কেননা এ-বাড়ির পুরোনো প্রথা তাই। লন্ডনে কদাচিৎ যেতেন মি. ডগলাস, গাঁ ছেড়ে প্রায় বেরোতেন না। তবে খুন হওয়ার আগের দিন

টানব্রিজ ওয়েলস-এ বাজার করতে গেছিলেন। সেইদিন অ্যামিস মি. ডগলাসকে একটু উত্তেজিত অবস্থায় দেখেছিল–ধৈর্য হারিয়ে ফেলছিলেন, মেজাজ খারাপ করছিলেন–যা তার স্বভাব নয়। সে-রাতে অ্যামিস তখনও ঘুমোতে যায়নি–বাড়ির পেছনদিকে খাবারদাবার রাখার ঘরে রুপপার কাঁটা চামচ সাজাচ্ছিল, এমন সময়ে ভীষণ জোরে বেজে উঠল দরজার ঘণ্টা। বন্দুকের আওয়াজ শোোনা যায়নি, না শোনাটাই স্বাভাবিক। কেননা রান্নাঘর আর ভাড়ার ঘর বাড়ির একদম পেছন দিকে মাঝে অনেকগুলো বন্ধ দরজা আর টানা লম্বা গলিপথ আছে। ওইরকম ভীষণ জোরে ঘণ্টা বাজানো শুনেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিল হাউসকিপার। দুজনে একসঙ্গে গিয়েছিল বাড়ির সামনের দিকে। সিঁড়ির গোড়া পর্যন্ত যেতেই দেখেছে ওপর থেকে নেমে আসছেন মিসেস ডগলাস। না, তরতর করে নামেনি খুব একটা উত্তেজিত হয়ে তাড়াহুড়ো করে নামছেন বলে মনে হয়নি অ্যামিসের। সিঁড়ির নীচের ধাপে পৌঁছোতেই ভাড়ার ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন মি. বার্কার। পথ আটকালেন মিসেস ডগলাসের–কাকুতি-মিনতি করে বললেন ওপরে চলে যেতে।

চিৎকার করে বলেছিলেন, দোহাই তোমার, ঘরে যেয়ো না! জ্যাক বেচারা মারা গেছে। তোমার কিছু করার নেই। ঈশ্বরের দোহাই, ফিরে যাও।

সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে এইভাবে কিছুক্ষণ বোঝানোর পর মিসেস ডগলাস ওপরে চলে গেলেন। চেঁচাননি। কোনোরকম হাহাকার করেননি। হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন ওঁকে ওপরে নিয়ে যায়–ওঁর সঙ্গেই শোবার ঘরে থাকে। তারপর অ্যামিস আর মি. বার্কার ফিরে আসেন পড়ার ঘরে–পুলিশ যা দেখেছে, ওরাও তাই দেখেছে। তখন মোমবাতিটা জ্বলছিল

না, জ্বলছিল লম্ফ! জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মিশমিশে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাননি, শুনতে পাননি। ছুটতে ছুটতে হল ঘরে এসেছেন দু-জনে, ড্রব্রিজ নামানোর চরকি কল ঘুরিয়ে দিয়েছে অ্যামিস। দৌড়ে বেরিয়ে গেছেন মি. বার্কার পুলিশকে খবর দিতে।

সংক্ষেপে, এই হল গিয়ে খাসচাকরের জবানবন্দি।

হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন যা বলল, তা অ্যামিসের কথারই সমর্থন। অ্যামিস কাজ করছিল ভাঁড়ার ঘরে সে-ঘর থেকে হাউসকিপারের ঘর বাড়ির সামনের দিকের অনেকটা কাছে। শুতে যাচ্ছে, এমন সময়ে ভীষণ জোরে ঘণ্টা বেজে ওঠায় খটকা লাগে। মিসেস অ্যালেন কানে একটু কম শোনে? সেই কারণেই বোধ হয় গুলির আওয়াজ কানে যায়নি তা ছাড়া পড়ার ঘরটাও বেশ দূরে। দড়াম করে দরজা বন্ধ করার মতো একটা শব্দ যেন কানে এসেছিল। তাও ঘণ্টা বাজার প্রায় আধঘণ্টা আগে। মি. অ্যামিস সদর দরজার দিকে ছুটে যেতেই মিসেস অ্যালেনও গিয়েছিল পেছন পেছন। দেখেছিল ভীষণ ফ্যাকাশে আর উত্তেজিতভাবে পড়ার ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসছেন মি. বার্কার। বেরিয়ে এসেই পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন মিসেস ডগলাসের–উনি তখন নামছিলেন সিঁড়ি বেয়ে। কাকুতি-মিনতি করে বলেছিলেন ফিরে যেতে কথা শুনেছিলেন মিসেস ডগলাস–কিন্তু কী বলেছিলেন, তা শোনা যায়নি।

মি. বার্কার তখন বলেছিলেন মিসেস অ্যালেনকে ওপরে নিয়ে যাও। সঙ্গে থাকো।

মিসেস অ্যালেন তখন মিসেস ডগলাসকে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে অনেক সান্ত্বনার কথা বলে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল। ভীষণ উত্তেজিত হয়েছিলেন মিসেস ডগলাস, পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপছিল ঠকঠক করে। কিন্তু নীচে নামার আর চেষ্টা করেননি। শোবার ঘরের আগুনের পাশে ড্রেসিংগাউন পরে বসে দু-হাতে মুখ ঢেকেছিলেন। প্রায় সারারাত কাছে কাছে ছিল মিসেস অ্যালেন। অন্য চাকরবাকররা শুয়ে পড়েছিল–পুলিশ আসবার আগে পর্যন্ত টের পায়নি কী সর্বনাশ হয়ে গেল। বাড়ির একদম পিছনে ঘুমোয় ওরা আওয়াজ-টাওয়াজ সেইজন্যেই কানে যায়নি।

জেরা করে এর বেশি আদায় করা গেল না হাউসকিপারের পেট থেকে হা-হুতাশ আর ভ্যাবাচাকা ভাব ছাড়া।

মিসেস অ্যালেনের পর সাক্ষী হিসেবে এলেন মি. সিসিল বার্কার। আগের রাতের ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশের কছে দেওয়া জবানবন্দির বাড়তি কথা একটিও বললেন না। উনি নিজে বিশ্বাস করেন, হত্যাকারী চম্পট দিয়েছে জানলা গলে। রক্তের দাগটাই তার মোক্ষম প্রমাণ। এ ছাড়াও ড্রব্রিজ ওঠানো থাকায় পালাবার আর পথ নেই। তারপর গুপ্তঘাতক কোথায় গেল, সাইকেল যদি বাস্তবিকই তার হয়, ফেলেই-বা গেল কেন–এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে অবশ্য পারলেন না। পরিখার জলে ডুবে মরাও সম্ভব নয়–কেননা জল কোনো জায়গাতেই তিন ফুটের বেশি গভীর নয়!

খুন সম্বন্ধে তার নিজের মনের মধ্যে নিদিষ্ট একটা অনুমিতি আছে। ডগলাস ছিল স্বল্পবাক পুরুষ। জীবনের কিছু অধ্যায় সম্বন্ধে কদাপি মুখ খুলত না। আয়ারল্যান্ড থেকে

আমেরিকায় গিয়েছিল খুব অল্প বয়সে। সেখানে বেশ দু-পয়সা করেছিল। ডগলাস বার্কারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ কালিফোর্নিয়ায়। সেখানে বেনিটো ক্যানিয়ন বলে একটা জায়গা আছে। দু-জনে অংশীদার হয়ে খনির কারবারে নামে এবং আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়। বেশ দু-পয়সা হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ নিজের অংশ বিক্রি করে দিয়ে ডগলাস ইংলন্ডে চলে যায়। তখন সে বিপত্নীক। পরে বার্কার নিজের টাকা আদায় করে নিয়ে লন্ডনে থাকতে আসেন। পুরোনো বন্ধুত্ব নতুন করে মাথাচাড়া দেয়। ডগলাস প্রায় বলত, তার মাথার ওপর বিপদের খাঁড়া ঝুলছে। এই বিপদের ভয়েই আচমকা ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে ইংলন্ডে এমন নিরিবিলি জায়গায় বাড়ি ভাড়া করে সে রয়েছে। বার্কারের মনে হয়েছিল গুপ্তসমিতি জাতীয় কিছু একটা ছায়ার মতো লেগে রয়েছে ডগলাসের পেছনে। ক্ষমাহীন এই নির্দয় সংস্থা ওকে খুন না-করা পর্যন্ত পেছন ছাড়বে না। ডগলাসের ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা মন্তব্য থেকেই এই ধারণা এসেছিল বার্কারের মাথায় কিন্তু গুপ্তসংস্থাটি কী এবং কেনই-বা তাদের বিষ নজরে পড়েছে, ডগলাস কখনো তা বলেনি। তবে বার্কারের বিশ্বাস, বিজ্ঞপ্তিতে লেখা কিংবদন্তির মধ্যে গুপ্তসংস্থার নিশ্চয় কোনো উল্লেখ আছে।

ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞেস করল, ক্যালিফোর্নিয়ায় ডগলাসের সঙ্গে আপনি কদ্দিন ছিলেন?

সবসুদ্ধ পাঁচ বছর।

উনি তখন বিয়ে করেননি বললেন না?

বিপত্নীক ছিল।

প্রথম স্ত্রী কোন দেশের মেয়ে কখনো শুনেছিলেন?

না। তবে একবার যেন বলেছিল ভদ্রমহিলার ধমনীতে সুইডিশ রক্ত আছে–ছবিও দেখেছিলাম। অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা। আমার সঙ্গে ডগলাসের প্রথম দেখা হওয়ার আগের বছর টাইফয়েড়ে মারা যান।

আমেরিকায় বিশেষ কোনো অঞ্চলের সঙ্গে ওঁর অতীত জীবনের যোগসূত্র বার করতে পারেন?

শিকাগো সম্পর্কে ওকে কথা বলতে শুনেছি। শহরটা ওর নখদর্পণে কাজও করেছে সেখানে। কয়লা আর লোহার জেলা সম্পর্কেও গল্প করতে শুনেছে। বয়সকালে প্রচুর দেশভ্রমণও করেছে।

রাজনীতিবিদ ছিলেন কি? রাজনীতি নিয়ে ক্ষুব্ধ কি গুপ্তসংস্থা?

না। রাজনীতির ধার ধারত না ডগলাস!

ক্রিমিন্যাল বলে কখনো মনে হয়েছে আপনার বন্ধুকে?

ঠিক উলটোটাই মনে হয়েছে। জীবনে এমন সোজা মানুষ দেখিনি।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ওর জীবন সম্পর্কে অদ্ভুত কোনো ঘটনা জানেন?

বেশির ভাগ সময় পাহাড়ে আমাদের খনিতে থেকে কাজ করতে পছন্দ করত ডগলাস। পারলে পাঁচজনের মধ্যে কখনো যেতে চাইত না। সেই কারণে প্রথমে ভেবেছিলাম নিশ্চয় ওর পেছন নিয়েছে কেউ। সন্দেহটা আর সন্দেহ রইল না, বিশ্বাস হয়ে গেল যখন বলা নেই কওয়া নেই দুম করে চলে গেল ইউরোপে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেউ হুশিয়ার-টুশিয়ার করেছিল বলেই পালিয়েছিল। কেননা, চলে যাওয়ার পরে সাতদিনও গেল না–জনাছয়েক লোক এসে খোঁজ করেছে ডগলাসের।

কী ধরনের লোক?

দুঁদে টাইপের। পেটাই লোহার মতো ভীষণ চেহারা। খনিতে এসে জিজ্ঞেস করেছিল ডগলাস কোথায়। বললাম, ইউরোপ গেছে, ঠিকানা জানি না। কথাবার্তা শুনেই বুঝেছিলাম জামাই-আদর করার জন্য খুঁজছে না ডগলাসকে।

লোকগুলো কি আমেরিকান–ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা?

ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষ সম্বন্ধে খুব একটা খবর আমি রাখি না–আমেরিকান এইটুকু বলতে পারি। খনির লোক নয়। তারা যে কে তা জানি না–চলে যাওয়ার পর হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম।

এ-কাণ্ড ঘটেছিল ছ-বছর আগে?

প্রায় সাত বছর আগে।

তখন আপনারা দু-জনে বছর পাঁচেক আছেন ক্যালিফোর্নিয়ায় তার মানে সব মিলিয়ে কম করেও ব্যাবসা করেছেন এগারো বছর?

হ্যাঁ।

এত বছর ধরে ঝাল পুষে রাখা মানে কারণটা খুবই গুরুতর। ছোটোখাটো ব্যাপার নয় মোটেই।

আমার তো মনে হয় সারাজীবনটাই এই করাল ছায়ার তলায় কাটিয়েছে ডগলাস। এক মুহূর্তের জন্যেও মন থেকে সরাতে পারেনি।

কিন্তু যে-লোক জানে মাথায় বিপদের খাড়া ঝুলছে, বিপদটা কী তাও যখন তার অজানা নয়–তখন কি বাঁচবার জন্যে পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ছিল না তার?

বিপদটা হয়তো এমন ধরনের যার খপ্পর থেকে পুলিশ তাকে বাঁচাতে পারবে না। এটা জেনেই পুলিশকে জানায়নি। একটা ব্যাপার আপনাদের জানা দরকার। সবসময়ে সশস্ত্র থাকত ডগলাস। অষ্টপ্রহর রিভলবার রাখত পকেটে। কিন্তু কপাল খারাপ তাই গতরাতে ড্রেসিংগাউন পরার ফলে শোবার ঘরে রেখে এসেছিল রিভলবার, ব্রিজ তুলে ফেলার পরেই নিজেকে নিরাপদ মনে করত বলেই মনে হয়।

তারিখগুলো আর একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই, বলল ম্যাকডোনাল্ড। ডগলাস ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়েছেন ঠিক ছ-বছর আগে। পরের বছর আপনিও তাই করেছেন, কেমন?

হ্যাঁ।

পাঁচ বছর আগে মি. ডগলাস যখন বিয়ে করেন, তখন থেকেই ওঁর কাছে আছেন?

বিয়ের একমাস আগে থেকে। আমি ওর নিতবর হয়েছিলাম।

বিয়ের আগে মিসেস ডগলাসকে চিনতেন?

না, চিনতাম না! ইংলন্ড ছেড়েছিলাম বছর দশেক।

কিন্তু বিয়ের পর থেকেই দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হত?

কঠোর চোখে ডিটেকটিভের পানে তাকালেন বার্কার।

ডগলাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ প্রায় হত! মিসেস ডগলাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে থাকলে জানবেন স্ত্রী সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বাদ দিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব নয় বললেই হয়। অন্য কোনো সম্পর্ক যদি কল্পনা করে থাকেন—

কিছুই কল্পনা করিনি, মি. বার্কার। কেস সম্পর্কে সব কিছুর খোঁজে খবর নিতে বাধ্য কিন্তু অপমান করার অভিপ্রায় নেই।

কিছু তদন্ত অপমানকরই হয়। রাগত কণ্ঠে জবাব দিলেন বার্কার।

আমাদের দরকার শুধু ঘটনার। আপনার এবং মামলায় জড়িত সবার স্বার্থে ঘটনাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। স্ত্রীর সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব অনুমোদন করেছিলেন মি. ডগলাস?

ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন বার্কার। বিরাট বলিষ্ঠ হাত দুটোয় যেন খিঁচ ধরল মুঠি পাকালেন প্রচণ্ডভাবে।

বললেন গলা চড়িয়ে, এ-কথা জিজ্ঞেস করার অধিকার আপনার নেই। যা তদন্ত করতে এসেছেন, তার সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?

প্রশ্নটা আবার করছি।

আমিও জবাব দেব না বলছি।

জবাব না হয় না-দিলেন, কিন্তু না-দেওয়াটাই জানবেন আপনার জবাব। লুকোনোর মতো খবর আছে বলেই জবাব দিতে চাইছেন না।

মুহূর্তের জন্য কঠিন মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন বার্কার। নিবিড় চিন্তায় গুটিয়ে রইল কালো ভুরু জোড়া। তারপর চোখ তুলে হাসলেন!

ঠিক আছে, আপনারা যখন নিছক কর্তব্য করছেন, বাধা দেওয়ার অধিকার আমার নেই। তবে একটা কথা যথেষ্ট ধকল চলেছে মিসেস ডগলাসের ওপর। এই মুহূর্তেই এ-প্রসঙ্গ নিয়ে তাকে আর বিব্রত করবেন না। শুনে রাখুন, একটাই দুর্বলতা ছিল ডগলাসের ঈর্ষা। আমাকে যেভাবে ভালোবাসত ডগলাস, বন্ধুর প্রতি তার চাইতে বেশি ভালোবাসা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। স্ত্রীকেও ভালোবাসত খুব। ও চাইত আমি আসি এখানে, ডেকেও পাঠাত। তা সত্ত্বেও স্ত্রীর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলে, অথবা দু-জনের মধ্যে একটু সহানুভূতির সুর লক্ষ করলে ঈর্ষায় জ্বলে যেত, মাথা ঠিক রাখতে পারত না, দুম করে অনেক সাংঘাতিক কথা বলে ফেলত। এই কারণে বহুবার ঠিক করেছি আর

আসব না। কিন্তু এমন কাকুতিমিনতি করে চিঠি লিখত ডগলাস যে না-এসে পারতাম না। তবে আমার শেষ কথা শুনে রাখুন এইরকম পতিব্রতা সতী স্ত্রী সংসারে দেখা যায় না, আমার মতো বিশ্বাসী বন্ধুও এ-দুনিয়ায় দেখা যায় না।

আবেগ অনুভূতির এমন কথা শোনবার পরেও দেখা গেল প্রসঙ্গটা বাদ দিতে পারছে না। ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

বলল, জানেন তো মৃত ব্যক্তির আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে নেওয়া হয়েছে?

সেইরকমই মনে হচ্ছে, বললেন বার্কার।

মনে হচ্ছে, বললেন কেন? আপনি জানেন এটা একটা ঘটনা। মনে হওয়ার মতো তো নয়।

আংটি না-থাকার ফলে, সে যেই সরাক না কেন, প্রত্যেকেই কিন্তু ধরে নেবে বিয়ের সঙ্গে এই ট্র্যাজেডির একটা সম্পর্ক আছে ঠিক কিনা বলুন?

গুলিয়ে ফেললেন যেন বার্কার, কী বলা উচিত ভেবে পেলেন না।

মনে হচ্ছে বলেছি অন্য একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে। আংটিটা নিজেও তো খুলে রাখতে পারে।

প্রশস্ত দুই কাঁধ ঝাঁকালেন বার্কার।

বললেন, কে কী ধরে নেবে তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে যদি আপনারা ধরে নেন যে এর ফলে এই ভদ্রমহিলার সম্মান নিয়ে টানাটানি পড়বে বলতে বলতে মুহূর্তের জন্যে দপ করে জ্বলে উঠল বার্কারের চোখ; প্রবল চেষ্টায় সামলে নিলেন আবেগের বহিঃপ্রকাশকে তাহলে কিন্তু বলব ভুল পথে চলেছেন।

ঠান্ডা গলায় ম্যাকডোনাল্ড বললেন, আপনাকে জিজ্ঞেস করার মতন আর কিছু তো দেখছি না।

মন্তব্য শোনা গেল শার্লক হোমসের, একটা বিষয় ছাড়া। আপনি যখন ঘরে ঢোকেন, তখন তো একটাই মোমবাতি জ্বলছিল টেবিলে, তাই নয়?

হ্যাঁ, তাই।

সেই আলোয় আপনি দেখলেন যে একটা অতি ভয়ংকর কাণ্ড ঘটেছে?

ঠিক বলেছেন।

তক্ষুনি ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড়ো করলেন?

হ্যাঁ।

খুবই তাড়াতাড়ি এসে গেল সবাই?

মিনিটখানেকের মধ্যে।

ওইটুকু সময়ের মধ্যে এসেও তারা দেখলে মোমবাতি নিভে গেছে, লম্ফ জ্বালানো হয়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু আশ্চর্য রকমের।

গোলমালে পড়েছেন মনে হল বার্কার।

একটু থেমে বললেন, খুব একটা আশ্চর্য বলে তো আমার মনে হয় না, মি. হোমস। মোমবাতির অতি যাচ্ছেতাই আলোয় ভালো দেখা যাচ্ছিল না। প্রথমেই তাই ভাবলাম ভালো আলোর ব্যবস্থা করা যাক। লম্ফটা টেবিলের ওপরেই ছিল বলে জ্বালিয়ে ফেললাম।

তারপর মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন?

ঠিক তাই।

হোমস আর প্রশ্ন করল না। কীরকম যেন বেপরোয়া, তোয়াক্কা-না-করা গোছের চাহনি পর্যায়ক্রমে আমাদের ওপর বুলিয়ে নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বার্কার।

মিসেস ডগলাসের সঙ্গে তার ঘরেই দেখা করতে চান, এই মর্মে চিরকুট লিখে পাঠিয়েছিল ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড, মিসেস ডগলাস জবাব দিয়েছিলেন তার চাইতে বরং ডাইনিং রুমেই দেখা করবেন আমাদের সঙ্গে। এখন ঘরে ঢুকলেন তিনি। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী। বয়স তিরিশ। চাপা স্বভাবের এবং বিপদেও আশ্চর্য রকমের স্থির, সংযত বিষাদময়ী, উন্মত্তপ্রায়, যে চিত্র এঁকেছি তার ঠিক উলটো। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত সহ্য করলে মুখ যেরকম পাণ্ডুর এবং অস্বাভাবিক হয়ে যায়–ওঁর মুখভাবও সেইরকম ঠিকই, কিন্তু হাবভাব সংযত এবং সুগঠিত হাতটি টেবিলে রাখার পর দেখা গেল আমার হাতের মতোই তা নিষ্কম্প। বিষণ্ণ, মিনতিপূর্ণ দুই চোখের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুসন্ধিৎসুভাব জাগিয়ে পর্যায়ক্রমে তাকালেন আমাদের সকলের মুখের ওপর। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সহসা রূপান্তরিত হল আচমকা কথার মধ্যে।

কিছু পেয়েছেন?

আমার কল্পনা কিনা জানি না, কিন্তু আশার বদলে যেন ভয় ধ্বনিত হল প্রশ্নের মধ্যে?

ইনস্পেকটর বললেন, যা করবার সবই করেছি মিসেস ডগলাস। নিশ্চিত থাকতে পারেন–কিছুই বাদ যাবে না।

যত টাকা লাগে লাগুক, মৃতবৎ উত্থানপতনহীন কণ্ঠে বললেন মিসেস ডগলাস। আমি চাই–যা করবার সব যেন করা হয়।

আপনার কথা শুনলে হয়তো কিছু জানা যাবে।

মনে তো হয় না। তবে যা জানি সব বলব।

মি. সিসিল বার্কারের মুখে শুনলাম, শোচনীয় ঘটনাটা যে-ঘরে ঘটেছে, সে-ঘরে আপনি এখনও ঢোকেননি–স্বচক্ষে কিছু দেখেননি?

না, দেখিনি। সিঁড়ি থেকেই ফিরিয়ে দিলেন। কাকুতিমিনতি করে বললেন ঘরে ফিরে যেতে।

ঠিক তাই। গুলির আওয়াজ আপনি শুনেছিলেন, শুনেই তৎক্ষণাৎ নেমে এসেছিলেন?

ড্রেসিংগাউন পরেই নেমে এসেছিলাম।

গুলির আওয়াজ শোনবার কতক্ষণ পরে সিঁড়ির নীচে মি. বার্কার পথ আটকে ছিলেন আপনার?

মিনিট দুয়েক হতে পারে। এ-রকম সময়ে সময়ের হিসেব রাখা খুব কঠিন। মিনতি করে বললেন আর যেন না-এগোই। বললেন, আমার কিছু করার নেই। তারপর হাউসকিপার মিসেস অ্যালেন ওপরে নিয়ে গেল আমাকে। সবটাই যেন একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

গুলির আওয়াজ শোনবার আগে পর্যন্ত কতক্ষণ আপনার স্বামী একতলায় গিয়েছিলেন বলতে পারবেন কি?

না পারব না। ড্রেসিংরুম থেকে কখন বেরিয়ে গিয়েছিল শুনতে পায়নি। বাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে এই ভয়ে প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার আগে গোটা বাড়ি টহল দেওয়ার অভ্যেস ছিল। এই একটাই ব্যাপারে ওকে যা ভয় পেতে দেখেছি আমি আর কোনো ব্যাপারেই নার্ভাস হতে দেখেনি।

মিসেস ডগলাস, ঠিক এই বিষয়টাতেই আসতে চাইছি আমি। আপনার স্বামীকে শুধু এই ইংলন্ডেই আপনি দেখেছেন, তাই না?

হ্যাঁ। বিয়ে হয়েছে পাঁচ বছর।

আমেরিকায় থাকার সময়ে এমন কোনো ঘটনার কথা বলতে শুনেছেন যে-ঘটনার ফলে উনি বিপদগ্রস্ত?

আন্তরিকভাবে ভাবলেন মিসেস ডগলাস, জবাব দিলেন তারপরে।

হ্যাঁ শুনেছি। মাথার ওপর বিপদ ঝুলছে, এ-রকমটাই সবসময়ে মনে হয়েছে তার। কিন্তু কী বিপদ, তা নিয়ে কিছুতেই কথা বলতে চাইত না আমার সঙ্গে। বিশ্বাস করত না বলে বলত না ভাববেন না যেন–গভীর ভালোবাসত আমাকে, গোপন বলে কিছু ছিল না আমার কাছে–কিন্তু বিপদ-আপদের ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইত না, পাছে ভেবে মরি বলে। তাই চুপ করে থাকত।

তাহলে আপনি জানলেন কী করে?

চকিত হাসির ছটায় আলোকিত হল মিসেস ডগলাসের মুখচ্ছবি।

স্ত্রীর কাছে সারাজীবন কোনো কথা কি স্বামী লুকিয়ে রাখতে পারে? স্বামী যার নয়নের মণি, সন্দেহ কি তার হয় না? আমিও জেনেছিলাম নানাভাবে। আমেরিকায় থাকার সময়ে ওর জীবনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে একদম কথা বলতে চাইত না বলে জেনেছিলাম। কতগুলো ব্যাপারে ওর সতর্কতা দেখে জেনেছিলাম। মুখ ফসকে কিছু কথা বেরিয়ে পড়ায় জেনেছিলাম। অপ্রত্যাশিত আগন্তুকদের দিকে ওর চাউনি লক্ষ করে জেনেছিলাম। স্পষ্ট বুঝেছিলাম ওর পেছনে শক্তিশালী শত্রু ঘুরছে, ও জানে ওরা তাকে খুঁজছে, সেইজন্যেই সবসময়ে তৈরি থাকত টক্কর দেওয়ার জন্যে। এসব জেনেছিলাম বলেই এতগুলো বছর কোনোদিন বেশি রাত করে বাড়ি ফিরলে ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম।

হোমস জিজ্ঞেস করে, কী-কী কথা শুনে আপনার খটকা লেগেছিল শুনতে পারি?

ভ্যালি অফ ফিয়ার, বললেন ভদ্রমহিলা। আমার প্রশ্নের উত্তরে একবার বলেছিল, আতঙ্ক-উপত্যকায় ছিলাম–এখনও বেরোতে পারিনি। অস্বাভাবিক সিরিয়াস হয়ে গেছে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম–আতঙ্ক-উপত্যকা থেকে কখনোই কি বেরোতে পারবে না? ও বলেছিল–মাঝে মাঝে মনে হয় তাই কখনোই আর বেরোতে পারব না আমরা।

আতঙ্ক-উপত্যকা বলতে কী বুঝিয়েছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন নিশ্চয়?

করেছিলাম। কিন্তু খুব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, মাথা নেড়ে বলেছিল–আমাদের একজন যে এর ছায়ায় রয়েছে। এটাই খুব খারাপ। ভগবান করুন যেন ছায়াটা আমাদের গ্রাস–করে। বেশ বুঝেছিলাম, সত্যিকারের একটা উপত্যকায় ও থেকে এসেছে এবং তখন ভয়ংকর কিছু ওর ঘটেছে কিন্তু সেটা যে কী, তা জানি না।

কখনো কারো নাম বলেননি?

বলেছে, বছর তিনেক আগে শিকারে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় পড়ে। জ্বর হয়। প্রলাপ বকত। একটা নাম বার বার আওড়াত। ভয়ে বলত, রেগে বলত। নামটা ম্যাকগিন্টি–বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি। সেরে ওঠার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টি আবার কে? কার বডির মাস্টার সে? হেসে বলেছিল ও, আমার নয় ভগবান বাঁচিয়েছেন। আর কোনো কথা বার করতে পারিনি পেট থেকে। তবে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, ভ্যালি অফ ফিয়ারের সঙ্গে বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টির সম্পর্ক আছে।

পরে একটা বিষয় জিজ্ঞেস করব, বললেন ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড। মি. ডগলাসের সঙ্গে আপনার প্রথম সাক্ষাৎ হয় লন্ডনের একটা বোর্ডিং হাউসে বিয়ের কথাও হয় সেখানে, তাই না? বিয়ের ব্যাপারে কোনো রোমান্স, গুপ্ত ব্যাপার বা রহস্য কিছু ছিল কি?

রোমান্স ছিল–সবসময়েই রোমান্স ছিল–রহস্য কিছুই ছিল না।

মি, ডগলাসের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী?

না, আর কারো সঙ্গে প্রেম বা বিয়ের ব্যাপার ঘটেনি আমার।

শুনেছেন নিশ্চয়, ওঁর বিয়ের আংটি সরানো হয়েছে। শুনে কিছু মনে হচ্ছে? ধরুন পুরোনো জীবনের কোনো শত্রু খুঁজে খুঁজে ওকে বার করে খুন করেছে, কিন্তু বিয়ের আংটি নিয়ে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?

দিব্যি গেলে বলতে পারি পলকের জন্য হাসির একটা হালকা ছায়া ভেসে গেল সুন্দরীর অধরের ওপর দিয়ে!

বললেন, সত্যিই আমি জানি না। খুবই অসাধারণ ব্যাপার।

ইনস্পেকটর বললেন, আর আটকে রাখব না আপনাকে। এ সময়ে এইভাবে কষ্ট দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। আরও কিছু বিষয় অবশ্য আছে, কিন্তু সময় এলে তা উত্থাপন করব।

উঠে দাঁড়ালেন রূপসী মহিলা। আবার আমার মনে হয়, ঘরে ঢুকেই যেরকম চকিত জিজ্ঞাসু চাহনি নিয়ে নিরীক্ষণ করেছিলেন আমাদের, ঠিক সেইভাবেই চাইলেন ফের : আমার জবানবন্দি শুনে আমার সম্বন্ধে কী ধারণা করলেন শুনি? প্রশ্নটা মুখে বললেও বুঝি এত স্পষ্ট হত না। পর মুহূর্তেই মাথা হেলিয়ে অভিবাদন করে বেগে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর চিন্তাকুটিল ললাটে বলল ম্যাকডোনাল্ড, ভদ্রমহিলা সুন্দরী। বার্কার লোকটা প্রায় আসত এখানে। ও-রকম চেহারা দেখলে সব মেয়েই মজে যায়। নিজের মুখেই তো বলে গেল, ঈর্ষাকাতর ছিল ডগলাস–ঈর্ষাটা কী নিয়ে তাও ও জানত। তারপর এই বিয়ের আংটি। এইসব তো উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মড়ার আঙুল থেকে যে আংটি ছিনিয়ে নিয়ে যায় আপনি কী বলেন, মি. হোমস?

দুই করতলে মাথা ডুবিয়ে সুগভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল বন্ধুবর। এখন উঠে দাঁড়াল, ঘণ্টা বাজাল। খাসচাকর ঘরে ঢুকতেই বললে–অ্যামিস, মি. সিসিল বার্কার এখন কোথায়?

দেখে আসছি, স্যার।

ক্ষণপরেই ফিরে এসে বললে, বাগানে রয়েছেন মি. বার্কার।

অ্যামিস কাল রাতে পড়ার ঘরে ঢুকে মি. বার্কারের পায়ে কী দেখেছিলে মনে আছে?

আছে মি. হোমস। শোবার ঘরের চটি। আমি বুট এনে দিলে সেই পরে পুলিশ ডাকতে যান।

চটিজোড়া এখন কোথায়?

হল ঘরে চেয়ারের নীচে।

বেশ, বেশ। কোন পায়ের ছাপ মি. বার্কারের আর কোনটা বাইরে থেকে এসেছে জানতে হলে চটির খবর নেওয়া দরকার।

ঠিক বলেছেন, স্যার। ওর চটিতে রক্ত লেগেছিল দেখেছি আমার চটিতেও লেগেছে।

তা তো লাগবেই ঘরের যা অবস্থা। ঠিক আছে, অ্যামিস। দরকার হলে ঘণ্টা বাজাব।

মিনিট কয়েক পরে এলাম পড়ার ঘরে। হল ঘর থেকে কার্পেট স্লিপার জোড়া নিয়ে এসেছে হোমস। অ্যামিস ঠিকই দেখেছে, সুখতলায় কালো হয়ে রয়েছে রক্ত।

অদ্ভুত! জানালার সামনে আলোয় দাঁড়িয়ে চুলচেরা চোখে শুকতলা দেখতে দেখতে বললে হোমস। সত্যিই খুব অদ্ভুত!

বেড়ালের মতো একলাফে চটি হাতে রক্তের দাগের সামনে পৌঁছালো বন্ধু এবং মিলিয়ে দেখল গোবরাটের রক্ত-চিহ্নের সাথে। মিলে গেল হুবহু। নিঃশব্দে হাসল সতীর্থদের পানে চেয়ে।

উত্তেজনায় চেহারা পালটে গেল ইনস্পেকটরের। রেলিংয়ে ছড়ি টানলে যেমন কড়মড় আওয়াজ হয়, সেইরকম কড়মড় শব্দে বেরিয়ে এল জন্মগত উচ্চারণ।

কী, আর তো সন্দেহ নেই। জানালায় নিজেই ছাপ রেখে গেছে বার্কার। যেকোনো বুটের ছাপের চেয়ে অনেক চওড়া ছাপ। আপনি বলেছিলেন বটে পা খুব চ্যাটালো–এইবার তো বোঝা গেল। কিন্তু খেলাটা কী মি. হোমস?–এ আবার কী খেলা?

তাই তো বটে! এ আবার কী খেলা? চিন্তা-নিবিড় চোখে পুনরাবৃত্তি করল বন্ধুবর।

কাষ্ঠ হেসে মোটা মোটা হাত কচলে পেশাগত সন্তোষ প্রকাশ করলেন হোয়াইট ম্যাসোন।

বললেন উচ্চকণ্ঠে, বলেছিলাম না এক একটি তুমুল ঝড়! সত্যিই তুমুল ঝড়!

প্রকাশমান সত্য

ছোটোখাটো অনেক বিষয় তদন্ত করার ছিল তিন গোয়েন্দার। আমি তাই–গ্রাম্য সরাইখানার দীনহীন আস্তানায় একাই ফিরে এলাম। আসার আগে প্রাচীন ভবনসংলগ্ন অদ্ভুতদর্শন পুরোনো আমলের বাগানে একটু পায়চারি করে নিলাম। বাগান ঘিরে সারি সারি অতি প্রাচীন ইউ গাছ–অদ্ভুত সব ডিজাইন কাটা ডালপালা। মাঝখানে সবুজ ঘাস ছাওয়া সুন্দর একফালি। মাঠ... ঠিক মাঝখানে একটা মান্ধাতার আমলের সূর্যঘড়ি। সব মিলিয়ে এমন একটা শান্তির জায়গা যে আমার ক্ষতবিক্ষত স্নায়ু যেন জুড়িয়ে গেল। নিবিড় প্রশান্তিঘেরা এ-জায়গায় এলে অন্ধকার পড়ার ঘরে মেঝের ওপর চিৎপাত রক্তমাখা ওই মূর্তির কথা আর মনে থাকে না–ফ্যানটাসটিক দুঃস্বপ্নর মতোই মনে হয়। তা সত্ত্বেও স্নিগ্ধ পরিবেশে পায়চারি করে আত্মাকে প্রশান্তির মধ্যে নিমগ্ন রাখতে গিয়ে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়লাম যে বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হল ট্র্যাজেডিটার মধ্যে করাল ছায়াপাত ঘটল মনের মধ্যে।

একটু আগেই বলেছি, সুসজ্জিত ইউ-গাছের মালা ঘেরা ছিল বাগানটা। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে ইউ-গাছের সারি যেখানে শেষ হতে চলেছে, গাছগুলো গায়ে গা দিয়ে একটানা ঝোপ হয়ে গিয়েছে। বাড়ির দিক থেকে এই ঝোঁপের দিকে এগোলে দেখা যায় না ঝোঁপের আড়ালে রয়েছে একটা পাথরের বসবার জায়গা। আমি সেইদিকেই যাচ্ছি, এমন সময়ে কানে ভেসে এল কথাবার্তার আওয়াজ। গভীর পুরুষ কণ্ঠের জবাবে ঝরনার মতো মেয়েলি হাসির টুকরো। পরমুহূর্তেই ঝোঁপের কিনারায় এসে দাঁড়ালাম, চোখ গিয়ে

পড়ল মিসেস ডগলাস আর বার্কার লোকটার ওপর ওরা কিন্তু তখনও দেখেনি আমাকে। ভদ্রমহিলার চেহারা দেখে আহত হলাম। ডাইনিং রুমে ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, সতর্ক। এখন কিন্তু শোকের ভান পুরোপুরি অপসৃত হয়েছে মুখাবয়ব থেকে। প্রাণের আনন্দ জ্বলজ্বল করছে দুই চোখে পুরুষ সঙ্গীর মন্তব্যে কৌতুক উজ্জ্বলিত হয়ে রয়েছে মুখের রেখায় রেখায়–হাসির কাঁপন তখনও মিলোয়নি মুখ থেকে। সামনে ঝুঁকে বসে রয়েছেন বার্কার, দুই করতল একত্রবদ্ধ, হাত হাঁটুর ওপর, প্রত্যুত্তরের হাসি ভাসছে প্রশস্ত, সুশ্রী মুখে। আমাকে দেখার সঙ্গেসঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু সেই একটা মুহূর্তেও দেরি করা ঠিক হয়নি ওঁদের গম্ভীর হয়ে গেল মুখ, ফিরে এল মুখোশ! দ্রুতকণ্ঠে কী যেন বলাবলি করে নিলেন দু-জনে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বার্কার এগিয়ে এলেন আমার দিকে।

বললেন, মাপ করবেন, আমি কি ডা. ওয়াটসনের সঙ্গে কথা বলছি?

এমন নিরুত্তাপভাবে মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম যে স্পষ্ট হয়ে গেল আমার মনের ভাব।

ধরেছি ঠিক। আপনার সঙ্গে মি, শার্লক হোমসের বন্ধুত্বের খবর কে না-জানে বলুন। দয়া করে একবার আসবেন এদিকে, একটু কথা বলবেন মিসেস ডগলাসের সঙ্গে?

কঠোর মুখে গেলাম পেছন পেছন। মনের চোখে তখন স্পষ্ট ভাসছে মেঝের ওপর পড়ে থাকা থেতলানো বিকৃত সেই মূর্তি। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারই বাগানে ঝোঁপের আড়ালে বসে হাসিঠাট্টা করছেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধ এবং স্ত্রী। ডাইনিংরুমে ভদ্রমহিলার

শোকে আমিও শোক পেয়েছিলাম। এখানে কিন্তু সহানুভূতিহীন চোখে তাকালাম তার মিনতি করুণ চোখের পানে।

বললেন, নিশ্চয় খুব হৃদয়হীন ভাবছেন আমাকে?

দু-কাঁধ কঁকালাম আমি।

বললাম, ব্যাপারটা তো আমার নয়।

যদি বুঝতেন তাহলে সুবিচার করতেন।

দুম করে বার্কার বললেন, কেন বুঝতে যাবেন ডক্টর ওয়াটসন? উনি তো বলেই দিলেন এ-ব্যাপার তাঁর নয়।

ঠিক বলেছেন। তাই আর আপনাদের বিরক্ত করব না–বেড়াতে এসেছি, বেড়াতে যাচ্ছি।

ডক্টর ওয়াটসন, এক মিনিট। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন ভদ্রমহিলা। একটা ব্যাপারে কিন্তু আপনার কথা বলার অধিকার দুনিয়ার যেকোনো লোকের চেয়ে বেশি। ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকখানি। মি. শার্লক হোমসকে আপনি যেভাবে জানেন পুলিশের সঙ্গে তার সম্পর্কের খবর যতটা রাখেন, ততটা খবর কেউ রাখে না। ধরুন, কোনো একটা ব্যাপার যদি তাঁকে গোপনে জানানো হয়, তিনি কি তা গোয়েন্দাদের কানে তুলবেন?

সাগ্রহকণ্ঠে বললেন বার্কার, উনি কি স্বাধীন, না সরকারি ডিটেকটিভদের তাবেদার?

এ-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা উচিত হবে বলে মনে করি না।

ডক্টর ওয়াটসন আমার অনুরোধ রাখুন–বিশ্বাস করুন এ-ব্যাপারে আমরা যদি আপনার সাহায্য পাই–বিশেষ করে আমি খুবই উপকৃত হব।

এমন আন্তরিকভাবে কথাটা বললেন ভদ্রমহিলা যে সেই মুহূর্তের জন্যে বিস্মৃত হলাম তার চাপল্যে বিচলিত হয়ে ঠিক করলাম ইচ্ছাটা পূরণ করে যাই।

বললাম, মি. হোমস স্বাধীনভাবে তদন্ত করছেন। ওঁর প্রভু উনি নিজে, নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে চলেন। তবে এটাও ঠিক যে একসঙ্গে যে-অফিসারদের সঙ্গে কাজে নেমেছেন, তাঁদের প্রতি তার একটা কর্তব্য আছে–যে-খবর পেলে অপরাধীকে আদালতে আনা যায়–তা কখনোই তাদের কাছে গোপন করবেন না। এর বেশি কিছু বলব না। যদি আরও খবর চান, মি. হোমসের সঙ্গেই বরং কথা বলুন।

বলে, টুপি তুলে নিয়ে চলে এলাম। ঝোঁপের আড়ালে ওঁরা ওইভাবেই বসে রইলেন। মোড় ফেরবার সময়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, নিবিষ্টভাবে কথা বলে চলেছেন দুই মূর্তি এবং যেহেতু আমার দিকে তাকিয়েই কথা বলছেন অতএব প্রসঙ্গটা নিশ্চয় আমাকে নিয়েই।

হোমসকে ঘটনাটা বলার পর ও বললে, কারো গোপন কথা শুনতে চাই না। দুই সতীর্থের সঙ্গে পুরো সন্ধ্যাটা ম্যানর হাউসে শলা-পরামর্শ করে কাটিয়েছে সে, ফিরেছে রাক্ষুসে খিদে নিয়ে। হাই-টি অর্থাৎ খাবারদাবার সহ চায়ের অর্ডার দিয়েছি। এখন আর কাউকে বিশ্বাস করে গুপ্ত খবর শুনতে চাই না কেননা খুন আর ষড়যন্ত্রের উৎকণ্ঠায় দু-জনেই টালমাটাল অবস্থায় রয়েছে।

শেষ পর্যন্ত তাই হবে বলেই তাহলে তোমার মনে হয়?

হোমস সেদিন দারুণ মেজাজে রয়েছে–কৌতুক যেন চোখে-মুখে ফেটে পড়ছে।

বললে, ভায়া ওয়াটসন, চতুর্থ ডিমটা নিকেশ করার পর পুরো ব্যাপারটা তোমাকে জানানোর মতো অবস্থায় আসব। রহস্যর তল পর্যন্ত দেখে ফেলেছি বলাটা ঠিক হবে না– তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি। তবে নিখোঁজ ডাম্বেলটার খোঁজ পাওয়ার পর–

ডাম্বেল!

কী বিপদ! কেসটা যে নিখোঁজ ডাম্বেলের উপর ঝুলছে এটা কি তোমার মাথায় আসেনি? যাকগে, যাকগে, মুখখানা অত কালো করার দরকার নেই। তোমাকেই শুধু বলি, ঘটনাটার সাংঘাতিক গুরুত্ব ইনস্পেকটর ম্যাক অথবা দারুণ বুদ্ধিমান স্থানীয় অপরাধ বিশেষজ্ঞের মাথাতেও আসেনি। একটা ডাম্বেল, ওয়াটসন! একখানা ডাম্বেল নিয়ে

পাঁয়তারা কষছে এমন কোনো ব্যায়ামবীরকে কল্পনা করতে পারো? ফলাফলটা একটু ভাবতে চেষ্টা করো–একদিকে চাপ পড়ার ফলে মেরুদণ্ড বেঁকে যাবে না? ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। ওয়াটসন, গায়ে কাঁটা দেয়!

দুই চোখে দুষ্টামি নাচিয়ে মুখভরতি টোস্ট চিবুতে চিবুতে আমার ধীশক্তির ধরাশায়ী অবস্থা দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল শার্লক হোমস। ওর এই রাক্ষুসে খিদে দেখে বোঝা যায় তদন্ত সন্তোষজনক হয়েছে এবং ফলাফল মনের মতো হয়েছে। কেননা আমি তো দেখেছি কূট সমস্যায় হালে পানি না-পেলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত দাঁতে কুটোটি না-কেটে কাটিয়েছে ভাবনা নিয়ে আতীব্র মনঃসংযোগের ফলে চোখ-মুখ আরও ধারালো হয়েছে, আরও শীর্ণ হয়েছে খাবার কথা একদম মনে হয়নি। তাই তারিয়ে তারিয়ে সব খাবার খাওয়ার পর পাইপ ধরিয়ে সেকেলে সরাইখানার চিমনির কোণে বসে যখন হাতের কেস নিয়ে মন্থর কিন্তু প্রাণ খোলা কথা শুরু করল, তখন মনে হল কেস-রির্পোট শোনাচ্ছে না–মশগুল হয়ে রয়েছে গভীর চিন্তায়।

ডাহা মিথ্যে, ওয়াটসন–একটা মস্ত মিথ্যে–এ-মিথ্যের সঙ্গে সমঝোতা চলে না কোনোমতেই। শুরু করা যাক এখান থেকেই। বার্কার যা বলেছে, তার আগাগোড়া নির্ভেজাল মিথ্যে। কিন্তু বার্কারের কথায় নতুন করে বলেছেন মিসেস ডগলাস। সুতরাং মিথ্যেবাদী তিনিও। দু-জনেই চক্রান্ত করে মিথ্যে বলেছেন। সমস্যাটা তাহলে এই মিথ্যে বলছেন কেন? এমন কী কথা যা লুকানোর জন্যে বানিয়ে বানিয়ে ডাহা মিথ্যে বলছেন দু-জনে? এত ঝুঁকি নিচ্ছেন? এত কষ্ট করছেন? ওয়াটসন, দেখা যাক মিথ্যের বাধা পেরিয়ে সত্যকে জোড়াতালি দিয়ে খাড়া করা যায় কিনা।

মিথ্যে যে বলছেন তা জানলাম কি করে? জানলাম কাহিনির এলোমেলো বুনট শুনে যা, এক কথায়, সত্যি হতে পারে না কোনোমতেই। এবার মাথা খেলাও! কাহিনি অনুসারে একটা আংটি খুলে তলা থেকে বিয়ের আংটি সরিয়ে আগের আংটিটা ফের আঙুলে পরাতে আততায়ীর লেগেছে এক মিনিটেরও কম সময় যা কখনোই সম্ভব নয়–তা ছাড়াও একটা আশ্চর্য কার্ড রেখেছে মৃতব্যক্তির পাশে। আমি বলছি এ-জিনিস একেবারেই অসম্ভব। তুমি হয়তো তর্ক করবে, তোমার বিচারবুদ্ধিকে শ্রদ্ধা করি বলেই বিশ্বাস করি ও-পথ তুমি মাড়াবে না–কখনোই তুমি বলবে না যে খুন করার আগে আঙুল থেকে খুলে নেওয়া হয়েছিল আংটিটা। মোমবাতিটা একটু আগেই জ্বালানোর মানেই হল কথাবার্তা বেশিক্ষণের জন্য হয়নি। ডগলাস ভদ্রলোক শুনেছি নির্ভীক পুরুষ ছিলেন। ওঁর মতন ডাকাবুকো মানুষের পক্ষে ওইটুকু সময়ের মধ্যে বিয়ের আংটি খুলে দেওয়া সম্ভব? আংটি খুলে দেবেন, এটাও কি কল্পনা করা সম্ভব? না, ওয়াটসন, লম্ফ না জ্বালিয়ে মৃতব্যক্তির সঙ্গে কিছুক্ষণ একলা ছিল গুপ্তঘাতক। এ-ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহ আমার নেই। কিন্তু মৃত্যুর কারণ বাহ্যত ওই বন্দুকের গুলি। তাহলে নিশ্চয় আমাদের যে-সময় বলা হয়েছে, বন্দুক ছোড়া হয়েছে তার অনেক আগে। কিন্তু এ-ব্যাপারে তো ভুল হতে পারে না। তাহলে বন্দুকের আওয়াজ যে দু-জন শুনেছে বার্কার আর মিসেস ডগলাস–এই দুজনের মধ্যে একটা পরিষ্কার চক্রান্তের আভাস আমরা পাচ্ছি। গোদের ওপর বিষফোড়া স্বরূপ আরও একটা ঘটনা খেয়াল করিয়ে দিতে চাই তোমাকে পুলিশকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে জানলার গোবরাটে রক্তের দাগ রেখেছিল এই বার্কার লোকটাই–এবার নিশ্চয়ই মানছ কেসটা ক্রমশ বার্কারের বিরুদ্ধেই যাচ্ছে?

এবার নিজেদেরকে একটা প্রশ্ন করা যাক–খুনটা তাহলে হয়েছে ঠিক ক-টায়? সাড়ে দশটার আগে নিশ্চয় নয়–কেননা ওই সময়ে বাড়িময় কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল চাকরবাকর। পৌনে এগারোটায় অ্যামিস ছাড়া সবাই গেল শুতে অ্যামিস রইল ভাঁড়ার ঘরে। তুমি চলে আসার পর একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলাম দরজা-টরজা বন্ধ রেখে পড়ার ঘরে ম্যাকডোনাল্ড যতই আওয়াজ করুক না কেন, ভাঁড়ার ঘরে তা পৌঁছোয় না। হাউসকিপারের ঘরের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। এ-ঘর করিডরের শেষের দিকে নয় বলেই পড়ার ঘরে কেউ গলা ফাটিয়ে চেঁচালে অস্পষ্ট শোনা যায়। আমি শুনেছি। খুব কাছ থেকে শটগান ছুড়লে আওয়াজ একটু চাপা হবেই, এক্ষেত্রে যা হয়েছে। আওয়াজটা তেমন জোর না-হলেও নিস্তব্ধ রাতে মিসেস অ্যালেনের ঘরে পৌঁছানো উচিত ছিল। ভদ্রমহিলা নিজেই বলেছে, কানে একটু কম শোনে। তা সত্ত্বেও কিন্তু চেঁচামেচির আগে দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার মতো একটা আওয়াজ নাকি শুনেছিল। চেঁচামেচির আধঘণ্টা আগে মানে পৌনে এগারোটা। যে-আওয়াজ সে শুনেছে, তা যে আসলে বন্দুকের আওয়াজ, তাতে একদম সন্দেহ নেই আমার খুনের আসল সময় হল সেটাই। তাই যদি হয়, তাহলে যদি ধরেও নিই যে মিসেস ডগলাস আর মি, বার্কার প্রকৃত হত্যাকারী নন–আমাদের জানতে হবে পৌনে এগারোটায় বন্দুকের আওয়াজ শুনে দু-জনে নেমে আসার পর থেকে সওয়া এগারোটায় ঘন্টা বাজিয়ে চাকরবাকর ডাকার সময় পর্যন্ত ওরা কী করেছিলেন। এর সঙ্গেসঙ্গে কেন ঘণ্টা বাজিয়ে লোক জড়ো করেননি? এ যে প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম এখন, এর জবাব পেলেই জানবে হেঁয়ালির অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে।

বললাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দুজনের মধ্যে একটা বোঝাঁপড়া আছে। স্বামী নিধনের ঘণ্টা কয়েক পরেই হি-হি করে হাসা হৃদয়হীন প্রাণী ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

ঠিক বলেছ। ওঁর নিজের জবানবন্দির মধ্যেও পতিপ্রাণা স্ত্রীর ছাপ রাখতে পারেননি। নারী-প্রশস্তিতে আমার প্রতিটি অণু-পরমাণু উন্মুখ নয় তা তুমি জানো ওয়াটসন। কিন্তু স্বামীর প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধা যার আছে, স্বামীর মৃতদেহ সামনে রেখে অন্য পুরুষের মিথ্যে বরদাস্ত করার মতো এমন স্ত্রী যে এ-সংসারে খুব একটা নেই–দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমি তা জেনেছি। বিয়ে যদি কখনো করি ওয়াটসন, বউকে এমন শিক্ষা দিতে চেষ্টা করব যাতে আমার মৃতদেহ মাত্র কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে জেনেও হাউসকিপারের সঙ্গে সুড়সুড় করে চলে না-যায়। খুবই যাচ্ছেতাই ভাবে মঞ্চস্থ করা হয়েছে নাটকটা–কেননা অত্যন্ত স্বাভাবিক মেয়েলি বিলাপের এহেন অনুপস্থিতে সন্দেহ হওয়া উচিত আনকোরা তদন্তকারীরও। আর কিছু না-পেলেও শুধু এই ঘটনাই পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্তের আভাস এনে দিতে পারত আমার মনে।

তুমি তাহলে নিশ্চিত যে খুনের অপরাধে অপরাধী বার্কার আর মিসেস ডগলাস?

পাইপ তুলে আমার দিকে নাড়তে নাড়তে হোমস বললে, তোমার প্রশ্নগুলো বড় বেশি সোজা। ভয় লাগে। ঠিক বুলেটের মতো তাগ করে ছোড়া আমার দিকে। যদি বলল, খুনের আসল রহস্য জেনেও ষড়যন্ত্র করে গোপন করেছেন মিসেস ডগলাস আর বার্কার–তাহলে জবাব দিতে পারি মন প্রাণ দিয়ে। আমি জানি ঠিক তাই করেছেন দু-জনে। কিন্তু

তোমার আরও মারাত্মক উক্তিগুলো তেমন পরিষ্কার নয়। এসো অন্তরায়গুলো নিয়ে বিচার বিবেচনা করা যাক।

ধরে নিচ্ছি এই যুগলমূর্তি যে-ভালোবাসায় বাঁধা পড়েছে তা অপরাধবোধে সমাচ্ছন্ন অবৈধ প্রণয়–মিলনের অন্তরায় পুরুষটিকে সরিয়ে ফেলতে দু-জনেই বদ্ধপরিকর। অনুমানটা কিন্তু একটু বড়োগোছেরই, কেননা চাকরবাকরদের সূক্ষ্মভাবে জেরা করেও এই অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায়নি। উলটে এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ডগলাস দম্পতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল পরস্পরের প্রতি।

নিভৃত বাগানে হাস্যমুখর সুন্দর মুখখানি মনের চোখে ভেসে উঠল। বললাম, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা সত্যি নয়।

সেইরকম ভাবই দেখিয়েছে দু-জনে। যাই হোক, ধরে নিলাম যুগল মূর্তি এই একটি ব্যাপারে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে ধোঁকা দিয়ে এসেছে এবং তলায় তলায় পতিদেবতাকে বধ করার ষড়যন্ত্র করেছে। ভদ্রলোকের মাথায় তখন বিপদের খাড়া ঝুলছে

এ-ব্যাপারটা কিন্তু কেবল ওদের মুখেই শোনা।

হোমসকে দেখে মনে হল যেন ভাবনায় পড়েছে।

বটে ওয়াটসন, বটে। তুমি এখন একটা অনুমিতির সন্ধানে আছে যার ফলে বলা যায় ওরা গোড়া থেকে সব বানিয়ে বলেছে। তোমার ধারণা অনুসারে, গুপ্ত সমিতি, ভ্যালি অফ ফিয়ার, সর্দার ম্যাক অথবা কোনো কিছুরই অস্তিত্ব কোনোকালে ছিল না। বিস্তীর্ণ, ব্যাপক অনুমিতি হিসেবে তা মন্দ নয়। এর ফলে কোথায় পৌঁছোচ্ছি এবার দেখা যাক। খুনের আসল উদ্দেশ্য ধামাচাপা দেওয়ার জন্যে গল্পগুলো বানিয়েছে দু-জনে। বাইরের লোক বাড়িতে ঢুকেছিল, এই ধারণা সৃষ্টির জন্যে সাইকেলটা প্রমাণস্বরূপ রেখে দিল বাগানে। জানালায় গোবরাটের রক্ততে সেই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা। মৃতদেহের পাশে রাখা কার্ডটার উদ্দেশ্যও তাই–ও-কার্ড হয়তো লেখা হয়েছে বাড়ির মধ্যেই! ওয়াটসন, তোমার অনুমিতির সঙ্গে খাপ খেয়ে যাচ্ছে সব কিছুই। এবার আসছে এমন টেড়াবেঁকা যাচ্ছেতাই ব্যাপার যা তুমি খাপ খাওয়াতে পারবে না কিছুতেই। দুনিয়ার এত অস্ত্র থাকতে করাত দিয়ে কাটা শটগান কেন? তাও আমেরিকায় তৈরি? আওয়াজ শুনে কেউ যে ছুটে আসবে না, এ-ব্যাপারে অতটা নিশ্চিত ওরা হল কীভাবে? দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনে মিসেস অ্যালেন খোঁজ নিতে আসতে পারত তো? অপরাধী প্রেমে আবদ্ধ যুগলমূর্তি এসব কেন করতে গেল বলতে পারো?

স্বীকার করছি, আমার মাথায় আসছে না।

তারপরেও দেখো, কোনো স্ত্রীলোক আর তার নাগর যদি স্বামী নিধনের চক্রান্ত করে, খুনটুন করার পর আঙুল থেকে বিয়ের আংটি সরিয়ে গোপন চক্রান্তর প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন কখনো দেয়? সম্ভব বলে মনে হয়, ওয়াটসন?

না, একেবারেই নয়।

আরও আছে। সাইকেল লুকিয়ে রাখার মতলবটায় আখেরে কোনো লাভ হচ্ছে কি? অত্যন্ত মাথামোটা ডিটেকটিভও বলবে পুলিশের চোখে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। চম্পট দেওয়ার প্রথম সহায় ওই সাইকেল–পলাতকরা ফেলে পালাবে কেন?

আমি কোনো ব্যাখ্যা ভাবতে পারছি না।

কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা হয় না এমন কোনো ঘটনাপরম্পরা থাকতেই পারে না। আমি একটা সম্ভাব্য চিন্তাধারা শোনাচ্ছি শোনো–স্রেফ মনের ব্যায়াম করার জন্যেই বলছিঅক্ষরে সত্যি–এমন কথা কিন্তু বলছি না। নিছক কল্পনা মানছি, কিন্তু অনেক সময়ে পরম সত্যির জননী হয়ে দাঁড়ায় নিছক কল্পনা–তাই নয় কি?

আমরা ধরে নিচ্ছি এই ডগলাস ভদ্রলোকের জীবনে একটা দোষাবহ গুপ্তরহস্য আছেসত্যিকারের লজ্জাকর গোপন অপরাধ। এর ফলেই খুন হতে হয়েছে তাকে ধরে নিচ্ছি, হত্যাকারী খুন করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছে এবং সে বাইরে থেকে এসেছে। প্রতিহিংসা-পাগল এই লোকটা বিয়ের আংটিটা আঙুল থেকে খুলে নিয়ে গেল কেন নিয়ে গেল স্বীকার করছি তা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম। বিরোধটা হয়তো বংশগত এবং শুরু হয়েছে ডগলাসের প্রথম বিয়ের সময় থেকে তাই কোনো কারণে আংটি সরানো হয়েছে আঙুল থেকে। সরে পড়ার আগেই বার্কার আর ডগলাসের স্ত্রী ঢুকলেন ঘরে। প্রতিহিংসা-পাগল হত্যাকারী দু-জনকেই বুঝিয়ে দিলে তাকে ধরিয়ে দিলে এমন কুৎসিত কেলেঙ্কারি

ফাঁস হয়ে যাবে যে টি-টি পড়ে যাবে সমাজে। কথাটা মনে ধরেছে দু-জনের যেতে দিয়েছে প্রতিহিংসা পাগলকে। এই কারণেই হয়তো নিজেরাই ড্রব্রিজ নামিয়ে পালানোর পথ করে দিয়েছে। তারপর তুলে রেখেছে। আমি দেখেছি ড্রব্রিজ নিঃশব্দে ওঠানো নামানো যায়। নির্বিঘ্নে পালাল হত্যাকারী। কোনো কারণে সে দেখলে সাইকেল না-নিয়ে হেঁটে পালানোই বরং অনেক নিরাপদ। তাই যন্ত্রটা রেখে গেল এমন জায়গায় যাতে পগারপার হওয়ার আগে কারোর চোখে না-পড়ে। সম্ভাবনার ক্ষেত্র কিন্তু এখনও ছাড়াইনি, তাই না?

রেখে ঢেকে বললাম, এইরকমই হওয়া সম্ভব বলে মনে হচ্ছে বটে।

ওয়াটসন, খেয়াল রাখতে হবে ঘটনা যাই হোক না কেন তা অসাধারণ। এসো আবার শুরু করা যাক অনুমানভিত্তিক তদন্ত। ধরে নেওয়া যাক, হত্যাকারীকে ছেড়ে দেওয়ার পরেই কিন্তু টনক নড়ল দু-জনের খুনটা যে তাদের কীর্তি নয়, কাউকে দিয়ে করায়নি অথবা নিজেরাই করেনি তা প্রমাণ করা মুশকিল হবে যে। তৎক্ষণাৎ একটু গোলমেলে ভাবেই সম্মুখীন হলেন পরিস্থিতির। পলাতক পালিয়েছে কীভাবে বোঝানোর জন্যে বার্কারের রক্তমাখা চটির ছাপ রাখা হল গোবরাটে। বন্দুকের আওয়াজ শুধু এই দু-জনেই শুনেছেন—কাজেই আওয়াজ শোনামাত্র যেভাবে চেঁচামেচি করা উচিত সবই করলেন– তবে ঝড়া আধঘন্টা বাদে।

যা বললে তা প্রমাণ করবে কী করে শুনি?

বাইরের লোক এর মধ্যে থেকে থাকলে পেছন নিয়ে তাকে ধরা হবে। সবচেয়ে মোক্ষম প্রমাণ তখন পাওয়া যাবে। আর তা যদি না হয় বিজ্ঞানের ভাড়ার এখনও ফুরোয়নি। একটা সন্ধ্যা তা নিয়ে ভাবলেই অনেক কাজ দেবে।

মাত্র একটা সন্ধ্যা!

আমি এখুনি ওখানে যাব বলে সব ঠিক করে এসেছি। বার্কারের ওপর খুব একটা সন্তুষ্ট নয় অ্যামিস ব্যবস্থা হয়েছে তার সঙ্গেই। ওই ঘরে গিয়ে বসে দেখব আবহাওয়া থেকে কোনো প্রেরণা পাই কিনা। আমি স্থান মাহাত্মে বিশ্বাসী। হাসছ ওয়াটসন? বেশ, দেখা যাক। ভালো কথা, তোমার সেই বিরাট ছাতটা আছে?

এই তো রয়েছে।

ছাতাটা ধার নেব ভাবছি।

নিশ্চয় কিন্তু অস্ত্র হিসেবে বদখত নয় কি? বিপদ যদি আসে—

গুরুতর কিছু নয়, ভায়া ওয়াটসন; তেমন কিছু হলে তোমার সাহায্য নিতাম। ছাতাটা কিন্তু নিয়ে যাব। এখন বসে আছি সহকর্মীদের ফেরার পথ চেয়ে। ওরা টানব্রিজ ওয়েলস গেছে সাইকেলের মালিকের হদিশ বার করতে।

রাত্তিরের আগে অভিযান থেকে ফিরল না ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড আর হোয়াইট ম্যাসোন। ফিরল বিজয়োল্লাসে, তদন্তে অগ্রগতির বিরাট খবর নিয়ে।

ম্যাকডোনাল্ড বলল, আরে মশাই, এখন স্বীকার করছি বাইরের লোক আদৌ ছিল কিনা তা নিয়ে গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল আমার অবশ্য এখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। সাইকেল পেয়েছি, লোকটার চেহারার বর্ণনাও পেয়েছি–ব্যস, এই নিয়েই এগোনো যাবে অনেকদ্দূর।

হোমস বললে, শেষটা এবার শুরু হল বলে মনে হচ্ছে। আপনাদের দুজনকেই অভিনন্দন জানাই অন্তর থেকে।

পরশুদিন টানব্রিজ ওয়েলস থেকে ফেরবার পর মি, ডগলাসকে অস্থির অবস্থায় দেখা গিয়েছিল এই খবর সম্বল করেই তদন্ত শুরু করি আমি। এর মানে এই, টানব্রিজ ওয়েলসেই উনি আঁচ করতে পেরেছিলেন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং সাইকেলে করে কেউ যদি এসেই থাকে, নিশ্চয় টানব্রিজ ওয়েলসেই ফেরবার কথা তার। সাইকেলটা তাই সঙ্গে নিয়ে গেলাম। সবক-টা হোটেলে দেখালাম। ইগল কমার্শিয়ালের ম্যানেজার দেখেই চিনতে পারল। দু-দিন আগে হার্গেভ নামে একটা লোক ঘর ভাড়া করেছিল–সাইকেলটা তার। এই সাইকেল আর একটা চামড়ার ছোটো ব্যাগ ছাড়া লোকটার কাছে আর মালপত্র ছিল না। খাতায় নামের পাশে লিখেছিল, লন্ডন থেকে আসছি–কিন্তু ঠিকানা

লেখেনি। চামড়ার ব্যাগটা লন্ডনে তৈরি, ভেতরকার জিনিসপত্র ব্রিটিশ–লোকটা কিন্তু নিঃসন্দেহে আমেরিকান।

সহর্ষে হোমস বললে, বাঃ বাঃ! আমি যখন বন্ধুর সঙ্গে বসে থিয়োরি কপচাচ্ছি, আপনারা তখন সত্যিই একটা কাজের কাজ করে এসেছেন। হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়ে ছাড়লেন, মি. ম্যাক্স।

হৃষ্টচিত্তে বলল ইনস্পেকটর, তা যা বলেছেন।

কিন্তু এটাও তোমার থিয়োরিতে খাপ খেয়ে যায়, মন্তব্য করলাম আমি।

খাপ খেতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু শেষটা শোনা যাক, মি. ম্যাক। লোকটাকে শনাক্ত করার মতো কিছু পাওয়া যায়নি?

এত কম পাওয়া গেছে যে স্পষ্ট বোঝা যায় লোকটা গোড়া থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে ছিল যাতে শনাক্তকরণ সম্ভব না হয়। কাগজপত্র নেই, চিঠিপত্র নেই, জামাকাপড়েও কোনো চিহ্ন নেই। শোবার ঘরে টেবিলে পড়ে কেবল এই অঞ্চলের সাইকেল ম্যাপ। গতকাল সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছিল সাইকেলে চেপে, আমরা গিয়ে খোঁজখবর নেওয়ার আগে পর্যন্ত আর কোনো খবর নেই।

হোয়াইট ম্যাসোন বললেন, আমার ধোঁকা লাগছে সেই কারণেই মি. হোমস। লোকটা যদি নিজেকে নিয়ে হট্টগোল সৃষ্টি করতে না-চাইত, তাহলে নিরীহ টুরিস্টের মতো ফিরে এসে হোটেলেই থেকে যেত। কিন্তু এখন তো তার জানা উচিত যে অন্তর্ধান সংবাদ পুলিশকে দেবে ম্যানেজার খুনের সঙ্গেও তাকে জড়িয়ে ফেলা হবে।

সেইরকমই মনে হবে প্রত্যেকেরই। তবে তার বিচারবুদ্ধি এখনও পর্যন্ত ধোপে টিকে রয়েছে একমাত্র প্রমাণ তার ধরা না-পড়া। কিন্তু তার চেহারার কী খবর পাওয়া গেল?

নোটবই দেখল ম্যাকডোনাল্ড।

যদ্দূর বলতে পেরেছে লিখে রেখেছি। লোকটাকে কেউ খুব একটা খুঁটিয়ে দেখে রাখেনি, তবে মুটে, কেরানি আর যে পরিচারিকা শোবার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তারা যা দেখেছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট। মাথায় পাঁচ ফুট ন-ইঞ্চি, বয়স বছর পঞ্চাশ, চুল সামান্য কাঁচাপাকা, গোঁফও কাঁচাপাকা, টিকোলো নাক, আর মুখখানা নাকি প্রত্যেকের মতে ভয়ংকর আর বীভৎস।

মুখভাবটুকু বাদ দিলে, ও-রকম চেহারা ডগলাসের নিজেরও, বললে হোমস। তাঁরও বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে, চুল আর গোঁফ কাঁচাপাকা, লম্বায় প্রায় ওইরকমই। আর কিছু পেয়েছেন?

গায়ে ছিল ধূসর রঙের ভারী সুট, আঁটোসাঁটো ডাবল ব্রেস্টেড জ্যাকেট নাবিকরা যেমন পরে, হলদে খাটো ওভারকোট আর একটা নরম ক্যাপ।

শটগান?

শটগানটা তো লম্বায় দু-ফুটেরও কম। সহজেই ভরে নেওয়া যায় চামড়ার ওই থলিতে। অনায়াসে ওভারকোটের তলায় ব্যাগ নিয়ে ঘুরেছে নিশ্চয়।

কেসটার সঙ্গে এসবের সম্পর্কটা বার করলেন কীভাবে?

ম্যাকডোনাল্ড বললে, দেখুন মি. হোমস, লোকটাকে পাকড়াও করার পর সে-বিচার ভালোভাবে করা যাবে। দেখতে কীরকম তা শোনার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই খবরটা টেলিগ্রাম মারফত জানিয়ে দিয়েছি সবাইকে। কিন্তু এই মুহূর্তেও জানবেন এগিয়েছি অনেকটা। আমরা জেনেছি, দু-দিন আগে সাইকেল আর চামড়ার ব্যাগ নিয়ে টানব্রিজ ওয়েলসে এসেছিল হার্থেভ নামে একজন আমেরিকান। চামড়ার থলির মধ্যে লুকিয়ে এনেছিল করাত দিয়ে কাটা একটা শটগান, খুনের অভিসন্ধি অতীব পরিষ্কার। যদ্র জেনেছি, কেউ তাকে পৌঁছোতে দেখেনি–সম্ভবও না, কেননা বাগানের ফটকে পৌঁছতে হলে গ্রামের মধ্য দিয়ে না-এলেও চলে। তা ছাড়া রাস্তায় সাইকেল আরোহীও ছিল বিস্তর। অনুমান করে নিচ্ছি, বাগানে ঢুকেই লরেলের ঝোপে সাইকেল লুকিয়ে রেখে ওত পেতে বসে ছিল বাড়ির দিকে চোখ রেখে মি. ডগলাসের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায়। সাইকেলটা লরেল ঝোঁপের পাশেই আমরা পেয়েছি। অস্ত্র হিসেবে শটগান জিনিসটা

বাড়ির মধ্যে অদ্ভুত ঠিকই, কিন্তু তার মতলব ছিল শটগান ছুড়বে বাগানে আওয়াজ নিয়ে কারো মাথাব্যথাও হবে না কেননা, মৃগয়াভক্ত ইংলন্ডের পল্লি অঞ্চলে অমন বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায় যখন-তখন। তা ছাড়া, শটগানের আরও একটা সুবিধে ছিল–লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না।

বাঃ, বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল তো! বললে হোমস।

যাই হোক, মি. ডগলাস বেরিয়ে এলেন না। তখন তার কী করা উচিত? গোধূলির আলো-আঁধারিতে গা ঢেকে এগোল বাড়ির দিকে সাইকেল পড়ে রইল ঝোপে। দেখল, ব্রিজ নামানো রয়েছে–ধারেকাছেও কেউ নেই। সুযোগটাকে কাজে লাগাল সে, ঠিক করে নিলে যদি কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, যা হয় একটা অছিলা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু কারো সঙ্গে দেখা হল না। প্রথমেই যে-ঘরটা চোখে পড়ল ঢুকল সেই ঘরে, লুকিয়ে রইল পর্দার আড়ালে। সেখান থেকেই দেখল উঠিয়ে নেওয়া হচ্ছে ড্রব্রিজ–বুঝল পালাতে হলে ওই পরিখা টপকে যাওয়া ছাড়া আর পথ নেই। ওত পেতে রইল সওয়া এগারোটা পর্যন্ত রোজকার অভ্যেস মতো নৈশ টহলে বেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন মি. ডগলাস। গুলি করে সে পালিয়ে গেল পূর্ব ব্যবস্থা মত। সে জানত সাইকেল নিয়ে পরে হইচই হবে, হোটেলের লোক সাইকেল চিনে ফেলবে এবং তার বিরুদ্ধে সূত্র হিসেবে সাইকেল কাজে লাগানো হবে। তাই সে সাইকেল ফেলেই অন্য কোনোভাবে চলে গেল লন্ডনে অথবা আগে থেকে ব্যবস্থা করে রাখা কোনো লুকোনোর জায়গায়। কীরকম লাগল, মি. হোমস?

চমৎকার বললেন, পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। এ হল গিয়ে আপনার গল্পের উপসংহার। আমার উপসংহার অন্যরকম–খুনটা যে-সময়ে হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, ঘটেছে তার আধ ঘণ্টা আগে। মি. বার্কার আর মিসেস ডগলাস দু-জনেই ষড়যন্ত্র করে কিছু গোপন করছেন, খুনিকে তারা পালাতে সাহায্য করেছেন নিদেনপক্ষে সে পালানোর আগেই ঘরে দু-জনে হাজির হয়েছিলেন,–জানলা গলে পালানোর মিথ্যে কাহিনিটা দু-জনেই সাজিয়েছেন, আসলে খুব সম্ভব নিজেরাই ব্রিজ নামিয়ে হত্যাকারীকে পালাতে দিয়েছেন। এই হল গিয়ে আমার তদন্ত-ফলাফলের প্রথম অর্ধেক।

মাথা নাড়লেন দুই ডিটেকটিভ।

বললে লন্ডন ইনস্পেকটর, তাই যদি, সত্য হয় মি. হোমস, তাহলে আমরা এক হেঁয়ালি থেকে আরেক হেঁয়ালিতে গিয়ে পড়ছি।

ফোড়ন দিলেন হোয়াইট ম্যাসোন, এবং সে-হেঁয়ালিটা আরও বিটকেল। ভদ্রমহিলা জীবনে আমেরিকা যাননি। আমেরিকান গুপ্তঘাতককে আড়াল করার মতো এমন কী সম্পর্ক তার সঙ্গে থাকতে পারে ভদ্রমহিলার বলতে পারেন?

হোমস বললে, অসুবিধে যে আছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। আজ রাতে নিজে থেকেই , ছোট্ট একটু তদন্ত করে দেখতে চাই–মোদ্দা কারণটা তাতে হয়তো অনেক স্পষ্ট হবে।

আমরা কী সাহায্য করতে পারি, মি. হোমস?

না, না! অন্ধকার আর ডক্টর ওয়াটসনের ছাতা তো রইল। আমার চাহিদা খুব মামুলি। আর রইল অ্যামিস–বিশ্বস্ত অ্যামিস–আমার জন্যে একটা বিষয় সে পরিষ্কার করে দেবে। আমার সব চিন্তাই কিন্তু ছুটছে একটা মূল ধাঁধার সূত্র ধরে একটিমাত্র ডাম্বেলের মতো অস্বাভাবিক যন্ত্র নিয়ে কেন দেহগঠন করতে চায় একজন ব্যায়ামবীর?

একক অভিযান থেকে বেশ রাত করেই সরাইখানায় ফিরল হোমস। দু-বিছানাওলা একটা শোবার ঘরে ছিলাম আমরা দুই বন্ধু পাড়াগাঁয়ের খুদে সরাইখানায় এর চাইতে ভালো ব্যবস্থা আর করা যায়নি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ও ঘরে ঢুকতেই আধো-জাগরণ ঘটল।

বিড়বিড় করে বললাম, কী হে হোমস? পেলে কিছু?

নীরবে আমার পাশে দাঁড়াল সে, হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। তারপর দীর্ঘ শীর্ণ মূর্তি ঝুঁকে পড়ল আমার ওপর।

বলল ফিসফিস স্বরে, মগজ যার তলতলে হয়ে গেছে, মন যার শক্তি হারিয়েছে–এমনি এক উন্মাদের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটাতে ভয় করবে না তো?
একদম না, বললাম সবিস্ময়ে।

কপাল ভালো। এর বেশি সে-রাতে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করল না বন্ধুবর।

সমাধান

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর স্থানীয় পুলিশ সার্জেন্টের ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় গভীর পরামর্শ করতে দেখলাম ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড আর মি. হোয়াইট ম্যাসোনকে। সামনের টেবিলের ওপর ছড়ানো স্তূপীকৃত টেলিগ্রাম আর চিঠি সতর্কভাবে বাছাই করে সাজিয়ে রাখছিলেন দু-জনে। একপাশে রয়েছে বাছাই করা চিঠির তিনটে থাক।

প্রফুল্লকণ্ঠে শুধোয় হোমস, ধোঁকাবাজ সাইক্লিস্ট বেচারার পেছনে ছুটছেন দেখছি? কদ্দূর খবর পাওয়া গেল বদমাশটার?

ক্ষোভের সঙ্গে চিঠিপত্রের তাগাড়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল ম্যাকডোনাল্ড।

এই মুহূর্তে তার খবর এসেছে লিস্টার, নটিংহ্যাম, সাদামটন, ডার্বি, ইস্টহ্যাম, রিচমন্ড এবং আরও চোদ্দোটা জায়গা থেকে। এর মধ্যে তিন জায়গায়–ইস্টহ্যাম, লিসেস্টার আর লিভারপুলে খবর এত পাকা যে তাকে গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়েছে। গোটা দেশটা দেখছি হলদে কোট পরা পলাতককে ছেয়ে গেছে।

কী সর্বনাশ। সহানুভূতির সুরে বলে হোমস। মি. ম্যাক, মি. হোয়াইট ম্যাসোন, আপনাদের দু-জনকেই এবার অন্তর থেকে একটা উপদেশ দিতে চাই। মনে আছে

নিশ্চয়, আপনাদের সঙ্গে এ-কেসে মাথা গলানোর সময়ে একটা শর্ত আরোপ করা ছিল–অর্ধেক-প্রমাণিত অনুমিতি আপনাদের উপহার দেব না এবং যতক্ষণ না বুঝছি অনুমিতি সত্যি হয়েছে এবং নিজে সন্তুষ্ট হচ্ছি ততক্ষণ আমার ধ্যানধারণা আমার মধ্যেই গোপন রাখব। এই কারণেই এই মুহূর্তে আমার মনের মধ্যে যা রয়েছে তা আপনাদের বলতে পারছি না। আরও একটা কথা বলেছিলাম–তদন্ত আপনারাই করবেন আমি থাকব আড়ালে; সেই কারণেই নিষ্ফল কাজে আপনাদের উৎসাহ উদ্দীপনার অপচয় ঘটুক এ আমি হতে দিতে পারি না। এইসব ভেবেই আজ সকালে এসেছি আপনাদের একটা উপদেশ দিতে এবং আমার এ-উপদেশের সারাংশ নিবেদন করছি মাত্র তিনটে শব্দের মধ্যে–এ-কেস ছাড়ুন।

অবাক হয়ে সুবিখ্যাত সতীর্থটির পানে চেয়ে রইলেন ম্যাকডোনাল্ড এবং হোয়াইট ম্যাসেন।

চিৎকার করে বললে ইনস্পেকটর, আপনি কি তাহলে মনে করেন কোনো আশা নেই এ-কেসে?

আমি মনে করি কোনো আশা নেই আপনাদের কেসে। নিখাদ সত্যে উপনীত হওয়ার মধ্যে আশা নেই–আমি তা মনে করি না।

কিন্তু এই যে সাইক্লিস্ট–এ তো আর কপোল-কল্পনা নয়। তার চেহারার বর্ণনা পেয়েছি, চামড়ার ব্যাগ পেয়েছি, সাইকেল পেয়েছি। কোথাও-না-কোথাও সে আছে। তাকে গ্রেপ্তার করব না কেন?

ঠিক, ঠিক, নিশ্চয় সে কোথাও আছে, এবং নিশ্চয় তাকে আমরা গ্রেপ্তার করব। কিন্তু আমি বলব আপনাদের শক্তিটা ইস্টহ্যাম বা লিভারপুলে নষ্ট করবেন না। আরও সোজা রাস্তা আছে।

কী যেন আপনি চেপে যাচ্ছেন, মি. হোমস। এ কিন্তু আপনার অন্যায়। বিরক্ত হয়েছে ইনস্পেকটর।

আপনি আমার কাজের পদ্ধতি জানেন, মি. ম্যাক। তবে যা বলতে চাই না–তা যদ্র সম্ভব অল্প সময়ের জন্যেই চেপে রাখব। আমি শুধু এককভাবে আমার খুঁটিনাটিগুলো বাজিয়ে দেখতে চাই তা হয়ে যাবে শিগগিরই–তারপর ফলাফল পুরোপুরি আপনাদের হাতে সঁপে দিয়ে নমস্কার ঠুকে ফিরে যাব লন্ডনে। এ ছাড়া আর করণীয় নেই–কেননা এর চাইতে অত্যাশ্চর্য আর কৌতূহলোদ্দীপক প্রহেলিকা আমি দেখিনি।

মি. হোমস, সত্যিই কিছু বুঝতে পারছি না। কাল রাতে টানব্রিজ ওয়েলস থেকে ফিরে আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আমাদের ফলাফলের সঙ্গে আপনি মোটামুটি একমত ছিলেন। তারপর এমন কী ঘটল যে কেসটা সম্বন্ধে একেবারে নতুন ধারণা খাড়া করে ফেললেন?

জিজ্ঞাসা যখন করলেন তখন বলি। কাল রাতে কয়েক ঘণ্টা ম্যানর হাউসে কাটিয়েছি। যাবার আগে বলেছিলাম আপনাদের।

তাতে কী হল?

আ! আপাতত এ-প্রশ্নের জবাবে একটা অত্যন্ত মোটামুটি জবাব দেব। ভালো কথা, মান্ধাতা আমলের এই বাড়িটার একটা ছোট্ট কিন্তু স্পষ্ট আর কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ পড়েছিলাম কিনেছি মাত্র এক পেনি দিয়ে স্থানীয় তামাকওলার কাছে। বলতে বলতে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ক্ষুদ্র পুস্তিকা বার করল হোমস–কাঠের ওপর স্থূলভাবে খোদাই করা সুপ্রাচীন ম্যানর হাউসের ছবিতে সুশোভিত প্রচ্ছদ। ভায়া মি. ম্যাক, অকুস্থলের ঐতিহাসিক পরিবেশের প্রতি সজাগ সহানুভূতি থাকলে তদন্তে আগ্রহ দারুণভাবে বেড়ে যায়। মুখখানা অতটা অসহিষ্ণু করবেন না, কেননা এইরকম একটা নীরস বর্ণনা পড়লেও অতীতের মোটামুটি একটা ছবি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। যদি অনুমতি করেন তো একটু পড়ে নমুনা শোনাই। প্রথম জেমসের রাজত্বকালে নির্মিত এবং আরও পুরানো একটি বাড়ির জমির ওপর দণ্ডায়মান বির্লস্টোনের ম্যানর হাউস পরিখাবেষ্টিত জ্যাকোবিয়ান আবাসগৃহের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে–

মি. হোমস কি আমাদের বাঁদর নাচাচ্ছেন?

ছিঃ ছিঃ, মি. ম্যাক! এই প্রথম আপনাকে মেজাজ খারাপ করতে দেখলাম। ঠিক আছে, যেরকম তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠছেন দেখছি এই একটি ব্যাপারে, অক্ষরে অক্ষরে আর পড়ে শোনাব না। কিন্তু যদি বলি, ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে একজন পার্লামেন্টারি কর্নেল এ-বাড়ি দখল করেছিলেন এবং গৃহযুদ্ধের সময়ে বেশ কয়েক দিন চার্লস এখানে লুকিয়েছিলেন, শেষকালে দ্বিতীয় জর্জ এ-বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়ে গিয়েছিলেন তাহলে কিন্তু আপনাকে মানতেই হবে যে কৌতূহল জাগানোর মতো অনেক কিছুই জড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন এই সৌধের ইট আর পাথরে।

তাতে কোনো সন্দেহই আমার নেই, মি. হোমস, কিন্তু তা নিয়ে আমাদের কোনো দরকারও নেই।

নেই কি? একেবারেই নেই? ভায়া মি. ম্যাক, আমাদের এ-পেশায় একটা জিনিস একান্তই দরকার–দৃষ্টিশক্তির প্রসারতা। বিবিধ ধারণা নিয়ে খেলা এবং জ্ঞানের পরোক্ষ প্রয়োগ অসাধারণ আগ্রহ জাগায়। এসব মন্তব্যের জন্যে ক্ষমা করবেন। কিন্তু মন্তব্য যিনি করছেন তিনি অপরাধ বস্তুটার নিছক সমঝদার হলেও আপনার চাইতে বয়স্ক এবং হয়তো বেশি অভিজ্ঞও।

আন্তরিকভাবে জবাব দিলে ডিটেকটিভ, সেটা সবার আগে আমি স্বীকার করব। আপনি ঠিক লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছোন মানছি, কিন্তু এমন সাতঘাট ঘুরে আসেন যে মাথায় চক্কর লেগে যায়।

বেশ, বেশ, অতীত ইতিহাসকে বিসর্জন দিয়ে তাহলে বর্তমানের ঘটনা নিয়ে পড়া যাক। আগেই বলেছি, গত রাতে ম্যানর হাউসে গিয়েছিলাম। মি. বার্কার অথবা মিসেস ডগলাসের সঙ্গে দেখাই করিনি। ওঁদের বিরক্ত করার কোনো দরকার আছে বলে মনে করিনি। তবে একটা খবর শুনে খুব খুশি হয়েছি। লোকদেখানো কান্নাকাটি–হুতাশের ধার দিয়েও যাচ্ছেন না ভদ্রমহিলা এবং তারিয়ে তারিয়ে মনের আনন্দে খেয়েছেন রাতের খানা। আমার বিশেষ সাক্ষাৎকারটি ঘটেছিল সচ্চরিত্র অ্যামিসের সঙ্গে। মিষ্টি মিষ্টি দুটো কথা বলতেই কাউকে না-জানিয়ে সে আমায় কিছুক্ষণের জন্যে বসতে দিয়েছিল পড়ার ঘরে।

সে কী! ওই মড়াটার সঙ্গে? আঁতকে উঠলাম আমি।

না, না, এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। মি. ম্যাক, আপনি অনুমতি দিয়েছেন সে-খবর আমি পেয়েছি। ঘর এখন স্বাভাবিক। পনেরো মিনিট সেখানে বসে শিখলাম অনেক জিনিস।

কী করছিলেন বসে বসে?

ব্যাপারটা এত ছোটো যে তা নিয়ে রহস্য করতে চাই না। নিখোঁজ ডাম্বেলটা খুঁজছিলাম। কেসটা সম্বন্ধে আমার আন্দাজি হিসেবে গোড়া থেকেই একটা বিরাট জায়গা জুড়ে রয়েছে এই ডাম্বেল। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলাম তাকে।

কোত্থেকে?

আ! তাহলেই তো অজানার অভিযানের শেষে পৌঁছে যাবেন। আমাকে আরও একটু যেতে দিন, সামান্য একটু, প্রতিজ্ঞা করছি তারপর যা জানি তার সমস্ত আপনারাও জানবেন।

ইনস্পেকটর বললে, কী আর করি বলুন, আপনার শর্ত অনুসারেই চলতে হবে আমাদের। কিন্তু কেস ছাড়বার কথা যদি বলেন–কেসটা ছাড়তেই-বা যাব কেন?

খুব সামান্য একটা কারণে। কারণটা এই: কী তদন্ত করছেন, এই প্রথম ধারণাটাই এখনও আপনাদের মাথায় ঢোকেনি বলে।

বির্লস্টোন ম্যানরের মি. জন ডগলাসের মৃত্যুরহস্য তদন্ত করছি।

তা ঠিক, তা ঠিক। কিন্তু কষ্ট করে সাইকেল আরোহী সেই রহস্যজনক ব্যক্তিটিকে খুঁজতে যাবেন না। আমি বলছি তাতে আপনাদের আখেরে লাভ হবে না।

তাহলে কী করতে বলেন আমাদের?

যা বলব ঠিক তাই যদি করেন, তাহলেই বলব কী করতে হবে।

আপনার কাজের পদ্ধতি-টদ্ধতিগুলো সৃষ্টিছাড়া হলেও পেছনে যে একটা কারণ থাকে তা আমাকে মানতেই হবে। বেশ, যা বলবেন তাই করব।

মি. হোয়াইট ম্যাসোন, আপনি?

অসহায়ভাবে প্রত্যেকের মুখ অবলোকন করলেন গ্রাম্য গোয়েন্দা। মি. হোমস আর তার পদ্ধতির সঙ্গে সে পরিচিত নয়।

বললেন শেষকালে, বেশ, ইনস্পেকটরের কাছে যা মঙ্গল, আমার কাছেও তা মঙ্গল!

চমৎকার! বললে হোমস। তাহলে আপনাদের দুজনকেই মনমাতানো চমৎকার পল্লিভ্রমণে বেরোতে বলছি। শুনেছি বির্লস্টোন পর্বতমালা থেকে ওয়েল্ডের দৃশ্য নাকি সত্যিই আশ্চর্য সুন্দর। রাস্তায় দুপুরের খাওয়া নিশ্চয় চটি-টটিতে পাওয়া যাবে–গাঁয়ের পথঘাট অজানা বলেই কোন চটিটা উত্তম হবে, সে-সুপারিশ করতে পারছি না। সন্ধের দিকে ক্লান্ত হলেও তরতাজা মনে

রাগতভাবে চেয়ার চেড়ে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বললে ম্যাকডোনাল্ড, ইয়ার্কির মাত্রা কিন্তু ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

খুশি উজ্জ্বল ভঙ্গিমায় কাঁধ চাপড়ে দিয়ে হোমস বললে, বেশ, বেশ, যেভাবে খুশি দিন কাটান। যেখানে খুশি যান, যা খুশি করুন, কিন্তু সন্ধে হওয়ার আগেই আমার সঙ্গে এইখানে দেখা করুন অবশ্যই দেখা করবেন, মি. ম্যাক, অন্যথা যেন না হয়।

এবার তো বেশ স্থিরমস্তিষ্কের মতো কথা বেরোচ্ছে।

প্রত্যেকটা উপদেশই জানবেন খাসা উপদেশ, কিন্তু জোরজবরদস্তি করতে চাই না, যখন দরকার আপনাদের তখন কাছে পেলেই হল। যাওয়ার আগে একটা কাজ করে যান। মি. বার্কারকে একটা চিঠি লিখে যান।

আচ্ছা।

আমি বলছি আপনি লিখে নিন। তৈরি?

প্রিয় মহাশয়,

যদি কিছু পাওয়া যায়, এই আশায় আমাদের মনে হচ্ছে পরিখার জল বার করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য–

অসম্ভব, বললে ইনস্পেকটর। আমি খোঁজ নিয়েছি।

ছিঃ, ছিঃ, ভায়া, ছিঃ! যা বলি, তাই করুন।

বেশ, বলুন।

–আমাদের কর্তব্য, কেননা এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যাতে আমাদের তদন্তের সুবিধে হবে। ব্যবস্থা আমি করেছি। লোকজন কাল ভোর থেকেই কাজে লাগবে, জলের ধারাটা অন্য মুখে বইয়ে–

অসম্ভব।

—অন্য মুখে বইয়ে দেওয়া হবে। আগেভাগেই তাই সব খুলে লিখলাম আপনাকে। নিন, এবার সই করুন। চারটে নাগাদ কারো হাতে চিঠিটা পাঠাবেন। চারটের সময়ে এই ঘরেই কিন্তু জমায়েত হব সবাই। ততক্ষণ পর্যন্ত যার যা খুশি করতে পারেন। কেননা আমি জানি এ-তদন্ত একেবারেই থমকে গিয়েছে আর নড়বে না।

সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনায়মান, সবাই জড়ো হলাম ঘরে। হোমসের ভাবভঙ্গি অত্যন্ত সিরিয়াস, আমি কৌতূহলী, ডিটেকটিভ দু-জন স্পষ্টত বিরক্ত এবং সমালোচনা মুখর।

গম্ভীরভাবে বললে বন্ধুবর, ভদ্রমহোদয়গণ, যতরকমভাবে পারেন এখন আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন। নিজেরাই বিচার করে দেখুন যা দেখে আমি সিদ্ধান্তে এসেছি, তা

যুক্তিযুক্ত কিনা। খুব ঠান্ডা পড়েছে দেখছি, অভিযানটাও কতক্ষণ চলবে জানা নেই। তাই বলব গরম কোট গায়ে দিয়ে নিন। অন্ধকার হওয়ার আগেই যার যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়ানোটাই এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই আপনাদের অনুমতি নিয়ে এখুনি রওনা হয়ে পড়তে চাই।

ম্যানর হাউসের পার্কের বাইরের দিকের সীমানা বরাবর হেঁটে যেখানে পৌঁছোলাম সেখানে বেড়ার রেলিংয়ে একটা ফাঁক রয়েছে। ফাঁক দিয়ে গলে ভেতরে ঢুকলাম সবাই। চললাম হোমসের পেছন পেছন। সন্ধের অন্ধকার তখন আরও চেপে বসেছে। পৌঁছোলাম সদর দরজা আর ড্রব্রিজের উলটো দিকে একটা ঝোঁপের সামনে। ড্রব্রিজ তখনও ওঠানো হয়নি। লরেন্স পর্দার আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল হোমস, আমরা তিনজন অনুকরণ করলাম তার দৃষ্টান্ত।

একটু রূঢ়ভাবে বললে ম্যাকডোনাল্ড, এবার কী করতে হবে?

ধৈর্য ধরতে হবে এবং যদূর সম্ভব কম আওয়াজ করতে হবে, জবাব দিল হোমস।

এসেছি কী জন্যে? আর একটু খুলে বললে ভালো করতেন।

হেসে ফেলল হোমস। বলল, ওয়াটসন বার বার বলেছি বাস্তব জীবনে আমি নাকি নাট্যকার। ভেতর থেকে একটা শিল্পী মাথা চাড়া দেয়–মঞ্চ সাজিয়ে কাজ শেষ করতে বাধ্য করে। আমাদের এ-পেশাও বৈচিত্রহীন, আদর্শহীন, নীচ হয়ে দাঁড়ায় যদি না

ফলাফলকে সাজিয়ে গুছিয়ে বর্ণাঢ্য। দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে মর্যাদাসহকারে উপস্থাপিত করি। দোষীকে সোজাসুজি দোষী বলার মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায়? ঘাড় ধরে অপরাধীকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে গৌরব আছে কি? কিন্তু তার বদলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সূক্ষ্ম ফাঁদ পাতা, আসন্ন ঘটনার বুদ্ধিদীপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী, বলিষ্ঠ অনুমিতির সফল সমর্থন কি আমাদের সারাজীবনের কাজের পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়? এই মুহূর্তে ধরুন না কেন পরিস্থিতির ইন্দ্রজাল আপনাকে রোমাঞ্চিত করেছে শিকার পাওয়ার নেশায় শিকারীর মতন প্রলুব্ধ হয়েছেন। টাইম টেবল-এর মতো সব কিছুই ঘড়ি ধরে কাটায় কাটায় ঘটলে কি এত রোমাঞ্চ পেতেন? মি. ম্যাক, তাই শুধু একটু ধৈর্য ধরতে বলছি, তারপর সবই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কৌতুকাভিনেতার মতন হাল ছেড়ে দিয়ে বললে লন্ডন ডিটেকটিভ, বেশ, বেশ, তবে ঠান্ডায় জমে যাওয়ার আগেই যেন গৌরব, যৌক্তিকতা আর বাদবাকিগুলো পাওয়া যায়।

এ-আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেকেরই কেননা অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে ওত পেতে বসে থাকতে হল অনেকক্ষণ। একটু একটু করে বৃদ্ধ–ভবনের দীর্ঘ, বিষণ্ণ—বদনের ওপর নেমে এল অন্ধকারের ছায়া। পরিখা থেকে একটা কনকনে ঠান্ডা স্যাৎসেতে বাষ্প উঠে হাড় পর্যন্ত কাঁপয়ে ছাড়ল এবং ঠোকাঠুকি লাগল দাঁতে। প্রবেশপথের ওপরে জ্বলছে একটিমাত্র ল্যাম্প এবং মৃত্যু-বিষণ্ণ পড়ার ঘরে জ্বলছে একটা নিষ্কম্প বর্তুলাকার আলো। এ ছাড়া সবই তমিস্রাময় এবং নিস্পন্দ।

আচমকা প্রশ্ন করলেন ইনস্পেকটর, এভাবে আর কতক্ষণ চলবে? প্রতীক্ষাটাই-বা কীসের?

ঈষৎ রুক্ষ স্বরে হোমস বললে, কতক্ষণ চলবে আপনার মতো আমারও জানা নেই। রেলগাড়ির মতো ক্রিমিন্যালরা ঘড়ি ধরে চললে আমাদের সুবিধে হত ঠিকই। প্রতীক্ষাটি কীসের যদি জানতে চান–বাঃ, এই তো–এইজন্যেই তো এতক্ষণ বসে থাকা।

কথার মাঝখানেই পড়ার ঘরের উজ্জ্বল হলুদ আলো আবছা হয়ে এল–কে যেন সামনে দিয়ে যাচ্ছে। আমরা যে লরেল ঝোপে লুকিয়ে সেটা জানালার ঠিক উলটোদিকে এক-শো গজের মধ্যে। একটু পরেই পাল্লা খুলে গেল সশব্দে–কবজার ক্যাঁচক্যাচানি শোনা গেল স্পষ্ট এবং অন্ধকারের দিকে মুখ বাড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একজন পুরুষকে—মুণ্ডু আর কাঁধের রেখাটুকুই কেবল চোখে পড়ল দুর থেকে। মিনিট কয়েক গেল এইভাবে। উঁকি মেরে অন্ধকারের বুকে কী আছে যেন কেউ তাকে দেখতে না-পায়–এমনি সতর্ক, চোরাচাহনি। তারপর সে ঝুঁকে পড়ল সামনে, অখণ্ড নিস্তব্ধতার মধ্যে শুনতে পেলাম বিক্ষুব্ধ জলরাশির ছলছলাৎ শব্দ। মনে হল পরিখার জলে কী ধরে আছে। তারপরেই অনেকটা জেলের হাতের টানে জালের মাছ ডাঙায় উঠে আসার মতো এক হ্যাচকায় একটা মস্ত, গোলমতো বস্তু তুলে আনল ওপরে গরাদহীন খোলা জানালা দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময়ে ঢাকা পড়ল আলো।

সময় হয়েছে! সময় হয়েছে! চাপা চিৎকার করে ওঠে হোমস।

www.bengaliebook.com

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম প্রত্যেকেই। হাত-পায়ে খিচ ধরেছে বলে আমরা যখন টলছি, হোমস তখন জ্যামুক্ত তিরের মতো সাঁ করে ধেয়ে গেল সামনে সময়-বিশেষে ওর এই অকস্মাৎ স্নায়বিক শক্তির বিস্ফোরণ একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, তখন কিন্তু ওর চাইতে সক্রিয় বা শক্তিমান পুরুষ দুনিয়ার আর কেউ থাকে না। বিপুল এই শক্তিই ওকে উল্কার মতো ছিটকে নিয়ে গেল ঝোঁপের মধ্যে থেকে এবং ঝড়ের মতো ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে ভীষণ জোরে বাজিয়ে দিল ঘণ্টা। দুমদাম খটাংখট শব্দে ছিটকিনি আর খিল খোলার আওয়াজ হল ভেতরে এবং দোরগোড়ায় আবির্ভূত হল অ্যামিসের ভ্যাবাচাকা মূর্তি। তাকে ঠেলে পাশে সরিয়ে দিয়ে নক্ষত্রবেগে আমাদের সবাইকে পেছনে নিয়ে হোমস ঢুকে পড়ল সেই ঘরে যে-ঘরে একটু আগেই ছায়ামূর্তিকে ঢুকতে দেখেছি।

বাইরে থেকে টেবিলের ওপর লম্ফ দেখেছিলাম, তা এখনও জ্বলছে এবং আলো বিকিরণ করছে। কিন্তু এখন আর টেবিলে নেই, রয়েছে সিসিল বার্কারের হাতে–হুড়মুড় করে আমরা ঘরে ঢুকতেই বাড়িয়ে ধরেছেন আমাদের দিকে। আলো ঠিকরে যাচ্ছে তার দৃঢ়, কঠোর, পরিষ্কার কামানো মুখ আর আতঙ্ক-ধরানো চোখ থেকে।

ওকী! এসব কী? কী জন্যে এসেছেন আপনারা?

দ্রুত-মসৃণ চোখে চারদিক দেখে নিয়ে লেখবার টেবিলের তলায় ঠেলে দেওয়া একটা বস্তুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হোমস। জিনিসটা একটা জল-সপসপে বান্ডিল, দড়ি দিয়ে বাঁধা।

এইজন্যে এসেছি, মি. বার্কার। ডাম্বেল দিয়ে ভারী করা এই যে বান্ডিলটা এইমাত্র আপনি পরিখার তলা থেকে টেনে তুললেন–এর জন্যেই এসেছি।

দুই চোখে বিপুল বিস্ময় নিয়ে হোমসের পানে তাকিয়ে রইলেন বার্কার।

আপনি জানলেন কী করে?

আপনি রেখেছিলেন! আপনি?

পালটাপালটি করে রেখেছিলাম, বলাটাই বোধ হয় ঠিক হবে। ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড আপনার মনে থাকতে পারে, একটা ডাম্বেলের অন্তর্ধানের একটু খটকা লেগেছিল আমার। বিষয়টার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণও করেছিলাম। কিন্তু আপনি নানান ঘটনার চাপে এই ঘটনাটা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় পাননি–এর ভেতর থেকে সিদ্ধান্তকে টেনে বার করতে পারেননি। জল যখন হাতের কাছে এবং একটা ভারী বস্তু যখন নিখোঁজ, তখন নিশ্চয় কিছু জলে ডোবানো হয়েছে–এমন ধারণা করতে কল্পনাকে বেশি কষ্ট করতে হয় না। ধারণাটা বাজিয়ে দেখতে ক্ষতি নেই ভেবে গতরাতে অ্যামিসের কৃপায় এ-ঘরে ঢুকে ডা. ওয়াটসনের ছাতার বেঁকা হাতলের দৌলতে বান্ডিলটাকে, জল থেকে ছিপ দিয়ে টেনে তোলার মতো তুলেছিলাম এবং পর্যবেক্ষণ করে ছিলাম। বস্তুটা ওখানে রাখল কে, সেইটা জানাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার! খুব সহজেই সে-কাজ সারলাম। চিঠি লিখে জানালাম আগামীকাল পরিখার জল বার করে দেওয়া হবে। চিঠি পড়েই টনক পড়বে বান্ডিল যে লুকিয়েছে, তার। রাতের অন্ধকারেই বান্ডিল সরানোর

জন্যে সে আসবে। চারজন সাক্ষী দেখেছেন কে সরিয়েছে বান্ডিলটা। মি. বাকার, এবার কিন্তু আপনি দয়ে পড়েছেন।

টেবিলের ওপর লক্ষের পাশে ভিজে বান্ডিলটা উঠিয়ে রাখল হোমস এবং খুলে ফেলল বাঁধনের দড়ি। ভেতর থেকে একটা ডাম্বেল বার করে ছুঁড়ে দিল ঘরের কোণে দাঁড় করানো জুড়িদার ডাম্বেলের দিকে। তারপর বার করল একজোড়া বুটজুততা। পায়ের আঙুল যেদিকে থাকে, সেইদিক দেখিয়ে বললে, দেখতেই পাচ্ছেন, আমেরিকান জুতো। তারপর বার করল খাপে ভরা একটা লম্বা, মারাত্মক ছুরি। তারপর বার করল এক বান্ডিল জামাকাপড়–তার মধ্যে রয়েছে পুরো একপ্রস্থ অন্তর্বাস, মোজা ধূসর রঙের একটা টুইড স্যুট এবং একটা খাটো হলদে ওভারকোট।

হোমস বললে, জামাকাপড়গুলো মামুলি ওভারকোটটা ছাড়া অনেক কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে এই কোট।

আলগোছে আলোর সামনে মেলে ধরে ওভারকোটের সর্বত্র দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল বুলোতে বুলোতে বললে, এই দেখুন ভেতরের পকেট–লাইনিং পর্যন্ত লম্বা করাত দিয়ে কাটা মারাত্মক হাতিয়ার রাখার মতো যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। দর্জির লেবেল রয়েছে ঘাড়ের কাছে নিলি, ওস্তাগর, ভারমিসা, যুক্তরাষ্ট্র। অধ্যক্ষর গ্রন্থাগারে পুরো একটা বিকেল কাটিয়ে অনেক জ্ঞান লাভ করেছি। যুক্তরাষ্ট্রের যে-অঞ্চলে কয়লা আর লৌহ উপত্যকার জন্যে সবচেয়ে বিখ্যাত, তার মাথার দিকে একটা ছোটো সমৃদ্ধ শহরের নাম ভারমিসা।

মি. বার্কার, মি. ডগলাসের প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে কয়লা অঞ্চলের সম্পর্ক আছে, এ-রকম একটা কথা আপনি বলেছিলেন মনে আছে আমার। মৃতদেহের পাশে রাখা কার্ডের V.V. লেখার মানে যে ভারমিসা ভ্যালি–এ-সিদ্ধান্ত নেওয়া নিশ্চয় এখন খুব অন্যায় হবে না। এ হল সেই ভ্যালি যেখান থেকে খুনের সংকল্প নিয়ে আসে গুপ্তঘাতকরা–অথবা ভ্যালি অফ ফিয়ার নামটা আগেই শুনেছি। এই পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট। মি. বার্কার, এবার আপনার কী বলার আছে বলুন।

গ্রেট ডিটেকটিভ এইভাবে যখন ফাঁস করছে রহস্য, মি. বার্কারের ভাবব্যঞ্জক মুখখানা তখন সত্যিই দেখবার মতো। ক্রোধ, বিস্ময়, হতবুদ্ধি এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা একে একে ধেয়ে গেল মুখের ওপর দিয়ে। শেষ পর্যন্ত শরণ নিলেন উকট শ্লেষের।

বললেন নাক সিঁটিয়ে, এতই যখন জেনেছেন, তখন বাকিটুকুও না হয় আপনিই বলুন, মি. হোমস।

মি. বার্কার, তার চাইতেও ঢের বেশি বলতে আমি পারি। কিন্তু আমি চাইছি আপনি বলুন–তাতে আপনার মান বাড়বে।

তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে শুধু একটা কথাই বলব–সত্যিই যদি গুপ্তকথা কিছু থাকে এর মধ্যে তাহলে তা আমার নয়–কাজেই আমি তো ফাঁস করব না।

শান্তভাবে ইনস্পেকটর বললে, আপনি যদি এইভাবে বেঁকে বসেন, তাহলে জানবেন ওয়ারেন্ট না-বেরোনো পর্যন্ত আপনাকে নজরবন্দি রাখব, তারপর হাজতে পুরব।

বেপরোয়াভাবে বার্কার বললেন, যা খুশি করতে পারেন।

ভদ্রলোকের গ্রানাইট-কঠিন মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল বিশ্বের কোনো শক্তি তাকে টলাতে পারবে না–ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুখ দিয়ে একটি কথাও বার করতে পারবে না এবং বার্কার সম্পর্কিত আলোচনার ইতিও এইখানে আর এক কদমও এগোবে না। অচলাবস্থার অবসান ঘটল একটি মহিলা কণ্ঠে। আধখোলা দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস ডগলাস এখন ঢুকলেন ভেতরে।

বললেন, সিসিল, অনেক করেছ আমাদের জন্যে। ভবিষ্যতে যাই ঘটুক না কেন, আমরা জানব তোমার ঋণ শোধ করার নয়।

শুধু অনেক নয়, তার চেয়েও বেশি, গম্ভীর মুখে মন্তব্য করে শার্লক হোমস। ম্যাডাম, আপনার ওপর আমার পূর্ণ সমবেদনা আছে জানবেন। আমার কথা শুনুন। পুলিশকে বিশ্বাস করুন। সব খুলে বলুন। আইনে আস্থা রাখুন। দোষ হয়তো আমারও আছে। বন্ধুবর ডা. ওয়াটসনের মাধ্যমে আপনি যে-ইঙ্গিত পাঠিয়েছিলেন, আমি তা কানে তুলিনি। কিন্তু তখন আমার বিশ্বাস ছিল আপনারা খুনের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এখন জানি তা নয়। শুধু তাই নয়, অনেক কিছুরই এখনও ফয়সালা হয়নি–ব্যাখ্যা শোনা হয়নি তাই বলব আপনি বরং মি. ডগলাসকেই বলুন যেন নিজের মুখে তার কাহিনি বলেন।

হোমসের কথায় সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস ডগলাস। আমি আর ডিটেকটিভ দু-জনও নিশ্চয় একইভাবে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, কেননা আচমকা যেন দেওয়াল কুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা লোক এবং যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরের কোণ থেকে পা ফেলে এগিয়ে এল আমাদের দিকে, ঘুরে দাঁড়ালেন মিসেস ডগলাস–চক্ষের পলকে দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন মূর্তিটিকে। দু-হাত বাড়িয়ে ধরেছিল লোকটা বার্কার আঁকড়ে ধরলেন সেই হাত।

স্ত্রী বললেন স্বামীকে, জ্যাক, সেই বরং ভালো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর চাইতে ভালো আর কিছু হতে পারে না।

অন্ধকার থেকে আলোয় এলে যেভাবে চোখ ধাঁধিয়ে যায় সেইভাবে চোখ পিটপিট করছিল লোকটা। মুখখানা অসাধারণ বলিষ্ঠ ধূসর চোখ, ছোটো করে ছাঁটা কঁচাপাকা শক্ত গোঁফ, ঠেলে-বার-করা চৌকোনা চোয়াল এবং কৌতুকময় মুখাবয়ব। আমাদের সবাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে অবাক করলেন আমাকে সটান আমার দিকে এগিয়ে এসে এক বান্ডিল কাগজ তুলে দিলেন হাতে।

বললেন, আপনার কথা আমি শুনেছি, কণ্ঠস্বর পুরোপুরি ইংরেজের মতো নয়, আমেরিকানের মতোও নয়, কিন্তু বেশ মোলায়েম আর প্রীতিপ্রদ।

এই যে কাগজের তাড়া দিলাম আপনাকে, এর ইতিহাস আপনিই লিখুন। ডক্টর ওয়াটসন, জীবনে আপনার হাতে এমন কাহিনি আর আসেনি–সর্বস্ব বাজি ফেলে বলতে পারি। নিজের মতো করে বলুন, ঘটনা তো হাতেই রইল জনগণ লুফে নেবে। ইঁদুরের গর্তের মতো ওই গর্তে দিনের আলো যেটুকু ঢোকে, সেই আলোয় দু-দিন বসে বসে লিখেছি এই কাহিনি। ভ্যালি

অফ ফিয়ারের এ-কাহিনি এখন আপনার নিজে পড়ুন, পড়ান আপনার পাঠককে।

শার্লক হোমস, শান্তভাবে বলেন, মি. ডগলাস, ওটা তো আপনার অতীতের কাহিনি। আমরা চাই আপনার বর্তমানের কাহিনি।

শুনবেন বই কী, তাও শুনবেন, বললেন ডগলাস। কথার সঙ্গে ধুমপান চালাতে পারি? ধন্যবাদ, মি. হোমস, যদূর মনে পড়ছে আপনি নিজেও ধূমপায়ী। আপনিই কেবল বুঝবেন পাছে গন্ধ খুঁকে ধরে ফেলে ওই ভয়ে পকেটে ধূমপানের সরঞ্জাম নিয়ে দুটো দিন ঠায় বসে থাকা কী কষ্টকর। হোমসের হাত থেকে চুরুট নিয়ে ম্যান্টলপিসে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে চুরুট চুষতে চুষতে বললেন ডগলাস। আপনার কথা আমি শুনেছি মি. হোমস, দেখা যে হবে কখনো ভাবিনি। আমার হাতের কাগজের তাড়ার দিকে তাকিয়ে, ওগুলো পড়ার আগেই আরও টাটকা খবর দিচ্ছি আপনাকে।

সুবিপুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে নবাগতের পানে তাকিয়েছিল ইনস্পেকটর ম্যাকডোনাল্ড।

শেষকালে আর থাকতে না-পেরে বললেন চিৎকার করে, আমার মাথায় কিছুই তো ঢুকছে! আপনিই যদি বির্লস্টোন ম্যানরের মি. জন ডগলাস হন তো এই দু-দিন কার মৃত্যুরহস্যের তদন্ত আমরা করছিলাম? আপনিই-বা কোত্থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এলেন? মনে তো হল পাতাল কুঁড়ে উঠে এলেন।

মি. ম্যাক, ভৎসনাসূচক তর্জনী হেলনে বললে শার্লক হোমস।রাজা চার্লসের লুকিয়ে থাকার কাহিনি যে-বইতে ছিল, আপনি তা পড়তে চাননি। লুকোনোর ভালো জায়গা না-থাকলে সেকালে কেউ লুকোতে যেত না। আর, যে-জায়গা একবার লুকোনোর কাজে লেগেছে, আবার তা সেই কাজেই লাগতে পারে। আমিও নিজেকে সেইভাবে লুকিয়ে ভেবে দেখেছি এই বাড়িতেই নিশ্চয় আছেন মি. ডগলাস।

ভীষণ রেগে বললে ইনস্পেকটর, চালাকিটা কদিন ধরে চালাচ্ছিলেন আমাদের ওপর জানতে পারি কি মি. হোমস? যে-তদন্ত উদ্ভট বলে আপনি নিজে জানতেন, সেই তদন্তে আমাদের শক্তির অপচয় ঘটতে দিচ্ছিলেন কদ্দিন ধরে?

এক মুহূর্তের জন্যেও নয়, ভায়া মি. ম্যাক। কেসটা সম্পর্কে আমার মতামত তৈরি করলাম মাত্র কাল রাতে। যেহেতু আজ রাতের আগে তা প্রমাণ করা যাবে না, তাই আপনার সহকর্মীকে বলেছিলাম একদিন উপভোগ করতে। বলুন দিকি ভায়া এর বেশি আর কী করতে পারি আমি? পরিখার জলে জামাকাপড়ের বোঝা দেখেই বুঝেছি, যে-মৃতদেহ আমরা দেখছি, তা মোটেই মি. জন ডগলাসের নয়–টানব্রিজ ওয়েলস থেকে

সাইকেল চেপে যে-লোকটা এসেছিল, নিশ্চয় তার মৃতদেহ। এ ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্তই সম্ভব নয়। তখন ঠিক করতে হল কোথায় থাকতে পারেন মি. জন ডগলাস স্বয়ং। সব সম্ভাবনা দাঁড়িপাল্লায় ওজন করলে দেখা যাচ্ছে লুকোনো জায়গা যে-বাড়িতে থাকা সম্ভব, নিশ্চয় সেই বাড়িতেই তিনি আছেনস্ত্রী এবং বন্ধুও যোগসাজশ করে তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন–হইচই থেমে গেলেই একেবারেই পালাবেন বলে।

সায় দিলেন মি. ডগলাস। বললেন, ধরেছেন ঠিক! ব্রিটিশ আইন আমাকে কী চোখে দেখবে, সে-বিষয়ে ধাঁধায় ছিলাম বলেই ঠিক করেছিলাম ফাঁকি দেব ব্রিটিশ কানুনকে। সেই সঙ্গে এ-জীবনে যাতে কুত্তাগুলো আর পেছন না-নেয়, সে-ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। খেয়াল রাখবেন, গোড়া থেকে আমি যা করেছি তার জন্যে তিলমাত্র লজ্জিত আমি নই– একই কাণ্ড ফের যদি করতে হয়, তখনও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে বলে মনে করব না। আমার কাহিনি আগে শুনুন, বিচার পরে করবেন। সাবধান করার দরকার নেই১১, ইনস্পেকটর। সত্যি বলতে আমি ডরাই না।

শুরু থেকে শুরু করব না। সে সবই ওর মধ্যে আছে–আমার হাতের কাগজের বান্ডিল দেখিয়ে দারুণ অদ্ভুত গল্পের উপাদান পাবেন ওর মধ্যে। সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই, কিছু লোক আমাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণও আছে এবং তারা পণ করেছে কপর্দকশূন্যও যদি হতে হয়, তাহলেও আমাকে নিকেশ করবেই করবে। যদ্দিন আমি বেঁচে থাকব আর তারাও বেঁচে থাকবে, এই দুনিয়ায় নিরাপত্তা বলে আমার কিছু নেই। শিকাগো থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ওরা আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, শেষকালে তাড়া খেয়ে পালিয়েছি আমেরিকা থেকেই, কিন্তু বিয়ে করার পর এই নিরিবিলি শান্তির

জায়গায় সংসার পাতবার পর ভেবেছিলাম বাকি জীবনটা নিঝঞ্ঝাটে কাটবে। বউকে কোনোদিনও বলিনি কাদের তাড়া খেয়ে পালিয়েছি আমেরিকা থেকে। এর মধ্যে ওকে টেনে লাভ কী বলুন? শান্তিতে আর একটা মুহূর্তও কাটাতে পারবে না, প্রতি মুহূর্তে মনে করবে ওই বুঝি এল চরম বিপদ। তবে আমার মনে হয়, আমার দু-চারটে মুখ ফসকে বেরিয়ে-পড়া কথা থেকে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল; গতকাল আপনারা ওর সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আসল ব্যাপার কিছু জানিনি। আপনাদের বলেছে ও সব জানত, বার্কারও বলেছে তাই, যেদিন এ-কাণ্ড ঘটে সেদিন এত কম সময় পেয়েছিলাম যে কিছুই খুলে বলতে পারিনি। এখন ও সবই জেনেছে এবং অনেক ভালো করতাম যদি আগেই সব খুলে বলতাম। কিন্তু বড়ো কঠিন সমস্যায় পড়েছিলাম–মুহূর্তের জন্যে স্ত্রীর হাত নিজের হাতে তুলে নিলেন ডগলাস–তাই যা কিছু করেছি তোমার ভালোর জন্যই করেছি।

জেন্টেলমেন, এই ঘটনার আগের দিন আমি টানব্রিজ ওয়েলস গিয়ে রাস্তায় একটা লোককে এক পলকের জন্যে দেখেছিলাম। যাকে বলে ঝুঁকিদর্শন–এক লহমার জন্যে দেখা–কিন্তু আমার চোখ বড়ো শানানো কিছুই নজর এড়ায় না তাই দেখেই বুঝেছিলাম সে কে। ওদের মধ্যে আমার ওপর সবচেয়ে বেশি যে খাপ্পা, উত্তর আমেরিকার বল্গা হরিণের পেছনে ধাবমান উপপাসি নেকড়ের মতো যে আমাকে এত বছর হন্যে হয়ে খুঁজছে–এ হল সেই লোক। আমার পরম শত্রু। বিপদ আসন্ন বুঝতে পেরে বাড়ি ফিরে এসে তৈরি হলাম। ঠিক করলাম শেষ পর্যন্ত একাই লড়ব। আমার সৌভাগ্য নিয়ে একদিন সারাযুক্তরাষ্ট্রে লোক কথা বলত, সেই সৌভাগ্য যে আবার আমার সহায় হবে এ-বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ ছিল না আমার মনে।

পরের দিন সারাদিন হুঁশিয়ার রইলাম, পার্কে একদম বেরোলাম না। ভালোই করেছিলাম। কেননা, পার্কের মধ্যে আমি ওকে পেড়ে ফেলার আগেই ও আমাকে বাকশট গান দিয়ে শেষ করে দিত। সন্ধের সময়ে ড্রব্রিজ ভোলা হয়ে গেলেই কিন্তু বরাবরই মন আমার অনেক স্থির হয়ে আসে। সেদিনও ব্রিজ ওঠানোর পর ও-ব্যাপার মন থেকে সরিয়ে দিলাম। ও যে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে এবং আমার জন্যে ওত পেতে থাকবে বিপদের এই দিকটা একবারও খতিয়ে ভাবিনি। কিন্তু রোজকার অভ্যেসমতো ড্রেসিং গাউন পরে বাড়ি টহল দিতে বেরিয়ে পড়ার ঘরে ঢোকবার সঙ্গেসঙ্গে বিপদের গন্ধ পেলাম। এ-রকম ঘটনা অনেকবার আমার জীবনে ঘটেছে। আমার মনে হয়, বিপদ এলে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় লাল নিশান উড়িয়ে ঠিক জানিয়ে দেয়–হুঁশিয়ার! সংকেতটা আমি স্পষ্ট টের পেলাম, কিন্তু কেন যে আমার প্রতিটি দেহকোষ বিপদের গন্ধে সজাগ হয়ে উঠল, তা বুঝলাম না। পরের মুহূর্তেই জানলার পর্দার নীচে দেখলাম একটা বুট– স্পষ্ট বুঝলাম কী ব্যাপার।

আমার হাতে তখন একটামাত্র মোমবাতি, কিন্তু হল ঘরের খোলা দরজা দিয়ে ল্যাম্পের বেশ খানিকটা আলো ঘরে আসছিল। মোমবাতি রেখেই লাফ দিয়ে ম্যান্টলপিসের ওপর থেকে হাতুড়ি তুলতে গেলাম। একই সঙ্গে সে-ও লাফ দিল আমার দিকে। ছুরির ঝিলিক দেখেই হাতুড়ি মারলাম। নিশ্চয় গায়ে লেগেছিল, কেননা ছুরিখানা ঝনঝনিয়ে ছিটকে গেল মেঝের ওপর। বান মাছের মতো স্যাৎ করে টেবিলের ওদিকে গিয়ে গা বাঁচাল সে এবং তারপরেই কোটের পকেট টেনে বার করল বন্দুক। ট্রিগার ঠেলে তোলার আওয়াজ পেলাম, কিন্তু গুলি করবার আগেই বন্দুক চেপে ধরলাম আমি। ধরেছিলাম নলটা,

ধস্তাধস্তি চলল মিনিট খানেকের মতো। যার হাত ফসকাবে, মৃত্যু তার অনিবার্য। ওর হাত মুহূর্তের জন্যেও ফসকায়নি, কিন্তু হাতলটা বোধকরি একটু বেশিক্ষণের জন্যে নীচের দিকে রেখেছিল। ট্রিগার বোধ হয় আমিই টিপেছিলাম। অথবা টানাটানিতে দু-জনেই টিপে ফেলেছিলাম। যেই টিপুক না কেন, দুটো নল থেকেই জোড়াগুলি উড়িয়ে দিল ওর মুণ্ডু –ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম টেড বলডুইনের দেহাবশেষের দিকে। শহরে দেখেই ওকে চিনেছিলাম, পর্দার আড়াল থেকে তেড়ে বেরিয়ে আসার সময়েও চিনেছিলাম, কিন্তু ওই অবস্থায় ওর মা-ও ওকে চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। জীবনে অনেক ভয়ানক কাজ নিয়ে আমি দিন কাটিয়েছি, বীভৎস দৃশ্য আমার গা সওয়া হয়ে গিয়েছে কিন্তু টেড বলডুইনের ছাতু-হয়ে-যাওয়া মাথা দেখে সেদিন পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

টেবিলের কিনারায় ভর দিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এল বার্কার। স্ত্রীকেও নামতে শুনলাম, দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকতে বারণ করলাম। এ-দৃশ্য মেয়েরা সইতে পারে না। কথা দিলাম এখুনি আসছি। বার্কারকে দু-একটা কথা বলতেই ও বুঝে নিলে, দু-জনে মিলে দাঁড়িয়ে রইলাম আর কে আসে দেখবার জন্যে। কিন্তু কারো চিহ্ন দেখলাম না, তখন বুঝলাম ওরা কিছুই শুনতে পায়নি। এ-ঘটনা জানি কেবল আমরা।১৩

ঠিক সেই সময়ে আইডিয়াটা এল মাথায়। মগজ যেন ঝলসে উঠল আইডয়াটার অত্যন্ত উজ্জ্বলতায়। লোকটার হাতা সরে যাওয়ায় বাহুর ওপর লজ-এর দাগানো চিহ্নটা বেরিয়ে পড়েছিল। এই দেখুন।

ডগলাস বলে যাকে চিনেছি, সেই ভদ্রলোক এবার কোট খুলে জামার হাতা গুটোতেই দেখলাম বাহুর ওপর সেই চিহ্ন–বৃত্তের মধ্যে একটা ত্রিভুজ–যা দেখেছি মৃতব্যক্তির বাহুতে।

এই দাগটা দেখেই মতলবটা এল মাথায়। চক্ষের নিমেষে গোটা প্ল্যানটা ছকা হয়ে গেল মাথার মধ্যে। ওর উচ্চতা, চুল, আকার হুবহু আমার মতন। মুখ দেখে চেনবার জো-টি আর নেই। বেচারা! আমি আমার এই জামাকাপড় নিয়ে এলাম ওপর থেকে। মিনিট পনেরো লাগল আমার ড্রেসিংগাউন পরতে–দু-জনে মিলে শুইয়ে রাখলাম যেভাবে আপনারা দেখছেন সেইভাবে। ওর যাবতীয় জিনিসপত্র বান্ডিল বাঁধল মা। হাতের কাছে যে-ওজনটা পেলাম তাই দিয়ে ভারী করলাম, জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলাম। যে-কার্ডটা আমার মৃতদেহের পাশে রাখবে বলে এনেছিল, সেটা রাখলাম ওরই মৃতদেহের পাশে। আমার আংটি পরালাম ওর আঙুলে, কিন্তু বিয়ের আংটিটা টানতে গিয়ে–পেশিময় হাত বাড়িয়ে ধরলেন ডগলাস, এই দেখুন কোথায় গিয়ে আটকে রয়েছে। বিয়ের পর থেকে একটা দিনের জন্যেও এ-আংটি আমি আঙুল থেকে খুলিনি–এখন খুলতে হলে উকো দিয়ে কাটতে হবে। তা ছাড়া এ-আংটি কাছছাড়া করতে পারব কিনা সেটাও একটা ব্যাপার বটে; তবে এক্ষেত্রে আমি চাইলেও আঙুল থেকে আংটি বার করা সম্ভব নয়। কাজেই আংটির ব্যাপার ওই অবস্থায় ফেলে রাখা ছাড়া আর উপায় ছিল না–তাতে যে যা মনে করে করুক। উলটে আর একটা কাজ আমি করলাম। একটুখানি স্টিকিং প্লাস্টার এনে ওর গালে লাগিয়ে দিলাম ঠিক যেভাবে আমার গালে লাগানো দেখছেন, ওইভাবে। মি. হোমস এই একটা ব্যাপার আপনার নজর এড়িয়েছে। যত ধূর্তই

আপনি হোন না কেন, ঠকিয়েছি আপনাকে। প্লাস্টারটা টেনে তুললেই দেখতেন তলায় কাটা-ফাটা কিচ্ছু নেই।

এই হল গিয়ে পরিস্থিতি। কিছুদিন ঘাপটি মেরে থাকবার পর যদি বাড়ি ছেড়ে পালাই এমন এক জায়গায় যেখানে স্ত্রী-ও যাবে পরে, বাকি জীবনটা অন্তত কাটাতে পারব নির্ভাবনায় নির্ভেজাল শান্তিতে। মাটির ওপর যদ্দিন বিচরণ করব, শয়তানগুলো তদ্দিন শান্তিতে থাকতে দেবে না, কিন্তু খবরের কাগজে যখন দেখবে বলডুইন খতম করেছে শিকারকে, শান্তি পাব আমি। বার্কার স্ত্রীকে এতকথা বুঝিয়ে বলবার সময় না-পেলেও ওরা বুঝেছিল, সাহায্য করতে রাজিও হয়েছিল। লুকোনোর এই জায়গায় খবর আমি যেমন রাখি, অ্যামিসও তেমনি রাখে–কিন্তু খুনের সঙ্গে জায়গাটার যে একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, তা তার মাথায় আসেনি। এই খুপরিতেই ঢুকে বসলাম আমি। বাকি যা করবার করল বার্কার।

কী করেছে তা নিশ্চয় আপনারা অনুমান করে নিয়েছেন। জানলা খুলে গোবরাটে রক্তের দাগ লাগলে যাতে মনে হয় খুনি এদিক দিয়েই পালিয়েছে। পালানোটা একটু মুশকিল ঠিকই, কিন্তু ব্রিজ ওদিকেই রয়েছে আর কোনো পথ নেই। সাজানোর ব্যাপারটা শেষ হলে পর ঘণ্টা বাজল এবং যা করার সবই করে গেল। পরে কী হয়েছে আপনারা জানেন। এখন আপনারা যা ভালো মনে করেন করতে পারেন। কিন্তু জানবেন আমি যা বললাম তা বর্ণে বর্ণে সত্য–ঈশ্বর তাই আমার সহায়। এখন শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। ইংরেজ আইন আমাকে কী চোখে দেখবে?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলে শার্লক হোমস।

ইংরেজ আইন শুধু একটা আইন। এ থেকে আপনি খুব একটা ভালো কিছু আশা করতে পারেন না। কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, লোকটা জানল কী করে যে আপনি এখানে আছেন, কী করে বাড়ি ঢুকতে হবে, ঠিক কোথায় লুকোলে আপনাকে চক্ষের পলকে খতম করা যাবে?

কিছুই জানি না।

ভীষণ সাদা আর গম্ভীর হয়ে গেল হোমসের মুখ।

বললে, গল্প এখনও ফুরোয়নি। ইংরেজ আইনের চেয়েও জঘন্য বিপদ শিগগিরই আপনার জীবনে আসতে পারে–আমেরিকার শত্রুদের চেয়েও এ-বিপদ আরও করাল। মি. ডগলাস, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সাংঘাতিক বিপদ ওত পেতে রয়েছে আপনার জন্যে। আমার কথা যদি শোনেন, গা-আলগা দেবেন না, হুঁশিয়ার থাকুন।

হে পাঠক-পাঠিকা, অনেক ধৈর্য ধরেছেন সুদীর্ঘ এই উপাখ্যান পড়তে। এবার আপনাদের আহ্বান জানাব অন্যত্র। কিছুক্ষণের জন্যে চলে আসুন আমার সঙ্গে। জায়গাটা বির্লস্টোনের সাসেক্স ম্যানর হাউস থেকে অনেক দূরে, সময়টাও মর্যাদাময়। সে-বছর থেকে অনেক দূরে

যে-বছরে আমাদের বিচিত্র অভিযান জন ডগলাস নামক এক ব্যাক্তির আশ্চর্য কাহিনিতে শেষ হয়েছিল। আমার অনুরোধ মতো সময়-পথে যদি কুড়িটা বছর পেছিয়ে যান এবং শূন্যপথে কয়েক হাজার মাইল চলে আসেন, তাহলে আপনার সামনে মেলে ধরব একটা অত্যন্ত অসাধারণ আর ভয়ংকর উপাখ্যান–এতই অসাধারণ আর ভয়ংকর যে বিশ্বাস করতেও মন চাইবে না আপনাদের মনে হবে সব মিথ্যে। কোনোকালেই এমন ঘটনা ঘটেনি। একটা কাহিনি শেষ করার আগেই আর একটা কাহিনি ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছি ভাববেন না যেন। পড়তে পড়তেই বুঝবেন মোটেই তা নয়। দূরস্থিত ঘটনাবলির ঘটনা শুনে অতীতের রহস্য উন্মোচন করার পর আবার ফিরে আসুন বেকার স্ট্রিটের ঘরে, যে-ঘরে আরও অনেক চমকপ্রদ ঘটনার মতো এ-কাহিনিরও পরিসমাপ্তি ঘটবে শেষ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড

স্কোরারস্

লোকটা

১৮৭৫ সালের চৌঠা ফেব্রুয়ারি। দারুণ শীত পড়েছিল, গিলমারটন পর্বতমালার গিরিখাতে জমে রয়েছে রাশি রাশি তুষার। বাষ্পীয় লাঙলের দৌলতে রেললাইন এখনও খোলা রয়েছে। ভারমিসা উপত্যকার মাথার দিকে অবস্থিত কেন্দ্রীয় নগরী ভারমিসা সমতল থেকে স্ট্যাগভিল পর্যন্ত যে-রেললাইনটা ঢালু পাহাড়ের ওপর কয়লাখনি আর লোহার কারখানাকে জুড়ে রেখেছে, সন্ধের ট্রেন টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে সেই লাইনের ওপর দিয়ে। রেললাইনের এখান থেকে গড়িয়ে নেমে গেছে বার্লটন্স ক্রসিং হেল্মডেল আর মার্টনের নির্ভেজাল কৃষি অঞ্চলের দিকে। রেলপথ একটাই অর্থাৎ একটাই রেলগাড়ি যেত সেই লাইন দিয়ে সামনের দিক থেকে আরেকটা ট্রেন এলে এ-ট্রেনকে সরে দাঁড়াতে হবে সাইডিং-এ। সাইডিংয়ের সংখ্যা অসংখ্য। প্রত্যেকটা সাইডিং-এ কয়লা আর লোহার আকর ভরতি ট্রাক দাঁড়িয়ে সারি সারি–দেখলেই বোঝা যায় গুপ্তধনের আকর্ষণে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই বিজনতম অঞ্চলে ছুটে এসেছে দলে দলে রুক্ষ কঠোর মানুষ জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত করে তুলেছে ঊষর প্রান্তর।

ঊষরই বটে। সত্যিই খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। প্রথম যে পুরোধা ব্যক্তি এই রুক্ষ বিজন অঞ্চলে পা দিয়েছিল সে কিন্তু কল্পনাও করতে পারেনি বিশ্বের সবচেয়ে সেরা সুজলা

সুফলা শস্যশ্যামলা অঞ্চলেও কালো কর্কশ খাড়া এবড়োখেবড়ো পাহাড় আর জঙ্গলের জটায় সমাকীর্ণ ঘোর বিষণ্ণ এই অঞ্চলের তুলনায় একেবারেই মূল্যহীন। মাঝে মাঝে প্রায় দুর্ভেদ্য অরণ্য কালো হয়ে রয়েছে খাড়া পাহাড়ের গায়ে, অনেক উঁচু উলঙ্গ পর্বতমুকুটে জমে রয়েছে সাদা বরফ, চারিদিকে পাহাড় মাথা উঁচিয়ে রয়েছে মেঘমালার দিকে, মাঝখানে পাকানো পেঁচানো সুদীর্ঘ উপত্যকা এঁকেবেঁকে বিস্তৃত দুর হতে দূরে। ছোট্ট রেলগাড়িটা টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে এরই ওপর দিয়ে।

সামনের দিকে যাত্রী গাড়িতে এইমাত্র জ্বালানো হয়েছে তেলের বাতি। কামরাটা লম্বা, নিরাভরণ। বসে আছে বিশ তিরিশজন যাত্রী। এদের অধিকাংশ শ্রমিক। নিম্ন উপত্যকায়, সারাদিন খেটে বাড়ি ফিরছে। জনা-বারোর মুখ কালিঝুলিতে কালো, হাতে সেফটিল্যাম্প নিঃসন্দেহে খনি শ্রমিক। দল বেঁধে বসে তারা ধূমপান করছে, গলা নামিয়ে কথা বলছে এবং মাঝে মাঝে কামরায় অন্য প্রান্তে উপবিষ্ট দু-জন লোকের পানে তাকাচ্ছে–এদের পরনের ইউনিফর্ম আর ব্যাজ দেখে বোঝা যাচ্ছে পুলিশের লোক। বাকি লোকের মধ্যে কয়েকজন কুলি মেয়ে। দু-একজন যাত্রী স্থানীয় দোকানদারও হতে পারে। এক কোণের একজন যুবা পুরুষ যেন এদের দল ছাড়া। একটু ভালো করে তাকান এর দিকে চেহারাটা দেখবার মতো।

রং তাজা, বয়স বড়োজোর তিরিশ। দুই চক্ষু ধূসর বিশাল। ধূর্ত এবং কৌতুকময় চশমার মধ্যে দিয়ে আশেপাশের লোকদের দিকে তাকানোর সময়ে অনুসন্ধিৎসা ঝিলিক দিয়ে উঠছে সেই চোখে। দেখেই বোঝা যায় যুবাপুরুষ খুবই মিশুক, স্বভাব সাদাসিদে, সবশ্রেণির লোকের বন্ধুত্ব অর্জন করতে সক্ষম। সঙ্গপ্রিয়, পেটপাতলা, প্রখর উপস্থিতবুদ্ধি

সম্পন্ন এবং সদা হাস্যময় এক নজরে এইরকমটাই মনে হবে যেকোনো ব্যক্তির। কিন্তু একটু কাছ থেকে খুঁটিয়ে যদি লক্ষ করা যায়, চোয়ালের দৃঢ়তা আর ভয়ানক ঠোঁট টিপুনি দেখেই সতর্ক হতে হবে স্পষ্ট বোঝা যাবে ছিমছাম চেহারার বাদামিচুলো এই তরুণ আইরিশম্যানের অন্তরের গভীরে এমন কিছু বস্তু আছে যা তাকে ভালো বা মন্দ যেকোনো রকমের খ্যাতি এনে দিতে পারে ধরাপৃষ্ঠের যেকোনো সমাজে।

সবচেয়ে কাছের খনি শ্রমিকের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে গিয়ে কাটছাঁট জবাব শুনে হাল ছেড়ে দিল তরুণ যাত্রী। চুপচাপ থাকা তার স্বভাব নয়–তবুও নীরব থাকতে হল। নিমগ্ন চোখে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল বিলীয়মান দৃশ্যপটের দিকে। দৃশ্যটা খুব সুখাবহ নয়। ঘনায়মান অন্ধকারে পাহাড়ের গা লাল হয়ে উঠেছে চুল্লির আভায়। দু-পাশে স্তূপীকৃত গাদ আর ছাই, মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কয়লাখনির প্রবেশদ্বার। লাইনের দু-পাশে বিক্ষিপ্ত নোংরা কদর্য কাঠের বাড়ির জটলা। আলো জ্বলছে কিছু কিছু জানলায়। ট্রেন মাঝে মাঝে দাঁড়ালে এইসব বাড়ি থেকেই ময়লা, কালো বাসিন্দারা উঠে ভিড় করছে গাড়িতে। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অলসতার ধারক ও বাহক যারা, ভারমিসা জেলার লোহা আর কয়লা উপত্যকা তাদের জায়গা নয়। চারদিকেই স্থূলতম-সংগ্রামের কঠোর চিহ্ন এখানকার কাজ রুক্ষ, কর্মীরাও রুক্ষ।

বিষাদ-মাখা ধুধু প্রান্তরের দিকে বিতৃষ্ণা আর কৌতূহল মিশানো চোখে চেয়ে রইল যুবাপুরুষ–চাহনি দেখেই বোঝা গেল এ-দৃশ্য তার চোখে একেবারেই নতুন। মাঝে মাঝে পকেট থেকে একটা ইয়া-বড়ো চিঠি বার করে পড়ে নিয়ে টুকটাক লিখতে লাগল পাশের সাদা অংশে। একেবারে কোমরের পেছন থেকে এমন একটা বস্তু বার করল যা এই

ধরনের নরম চেহারার যুবকের কাছে আশা করা যায় না। জিনিসটা একটা বৃহত্তম আকারের নেভি রিভলবার। আলোর দিকে ফেরাতেই আলো ঠিকরে গেল ড্রামের ভেতর পোরা পেতলের কার্তুজের বেড় থেকে, তার মানে রিভলবার গুলিভরা। চট করে গুপ্তপকেটে লুকিয়ে ফেলার আগেই অবশ্য সংলগ্ন বেঞ্চিতে উপবিষ্ট একজন শ্রমিকের নজরে পড়ল হাতিয়ারটা।

বললে, হ্যাল্লো, বন্ধু! আপনি দেখছি তৈরি হয়ে বেরিয়েছেন।

ঈষৎ বিব্রত হয়ে হাসল যুবা পুরুষ।

বললে, হ্যাঁ। যেখান থেকে আসছি, সেখানে এ-জিনিসের যখন-তখন দরকার পড়ে।

সে-জায়গাটা কোথায় বলবেন?

শিকাগো থেকে আসছি আমি।

এদিকে নতুন?

হ্যাঁ।

এখানেও দেখবেন এর দরকার হবে, বললে শ্রমিক।

আ! তাই নাকি? আগ্রহী মনে হয় যুবাপুরুষকে।

এখানকার কাণ্ডকারখানা কিছুই কি শোনেননি?

অসাধারণ কিছু তো শুনিনি।

সেকী! সারাদেশ তোলপাড় হয়ে গেল এই নিয়ে। আপনিও শুনবেনখন–শিগগিরই কানে আসবে। কী জন্যে এলেন এদিকে?

শুনেছি, কাজ যে করতে চায়, এখানে নাকি তার কাজের অভাব হয় না।

আপনি কি শ্রমিক ইউনিয়নের কেউ?

নিশ্চয়।

তাহলে মনে হয় কাজ পাবেন। বন্ধু-টন্ধু কেউ আছে?

এখনও নেই, তবে করে নেওয়ার ব্যবস্থা জানি।

সেটা আবার কী?

আমি এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান সংস্থার সদস্য। হেন শহর নেই যেখানে এদের শাখা নেই। শাখা থাকা মানেই আমার বন্ধু পাওয়া।

কথাটায় অসাধারণ প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সঙ্গীর ওপর। এস্ত সন্দিগ্ধ চাহনি নিক্ষেপ করল কামরার অন্য সবাইয়ের দিকে। খনি শ্রমিকরা এখনও ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে। পুলিশের লোক দু-জন ঢুলছে। বেঞ্চি থেকে উঠে এসে তরুণ যাত্রীর পাশে বসে হাত বাড়িয়ে দিল নিজের।

বলল, হাত রাখুন।

হাতে হাত মিলল দু-জনের।

সত্যি বলছেন জানি। তবুও নিশ্চিত হতে চাই।

বলে, ডান হাতটা তুলল ডান ভুরুর সামনে। তরুণ যাত্রীও তৎক্ষণাৎ বাঁ-হাত তুলল বাঁ-ভুরুর সামনে।

অন্ধকার রাত অস্বস্তিকর, বললে শ্রমিক।

পথ যে চেনে না তার কাছে, বললে তরুণ যাত্রী।

ওতেই হবে। আমি ভারমিসা ভ্যালির ৩৪১ নম্বর লজের ব্রাদার স্ক্যানল্যান। এ-তল্লাটে আপনাকে দেখে খুশি হলাম।

ধন্যবাদ। আমি শিকাগোর ২৯ নম্বর লজের ব্রাদার জন ম্যাকমুর্দো। জে. এইচ. স্কট আমাদের বডিমাস্টার। আমার কপাল ভালো, এত তাড়াতাড়ি একজন ব্রাদার পেয়ে গেলাম।

আমরা এখানে অনেক। ভারমিসা ভ্যালিতে অর্ডার যেমন ছড়িয়েছে, এমনটি যুক্তরাষ্ট্রের আর কোথাও দেখতে পাবেন না। তবে আপনার মতো কিছু ছেলের আমাদের দরকার। শ্রমিক ইউনিয়নের এ-রকম একজন কর্মঠ সদস্যের কাজ নেই শিকাগোতে, এটা কিন্তু বুঝতে পারছি না।

কাজের অভাব ছিল না আমার, বললে ম্যাকমুর্দো।

তাহলে চলে এলেন কেন?

পুলিশের লোক দু-জনের দিকে মাথার ইশারা করে হাসল ম্যাকমুর্দো।

বললে, ওরা জানতে পারলে কিন্তু খুশি হত।

সহানুভূতিসূচক চুক-চুক শব্দ করে স্ক্যানল্যান।

শুধোয় ফিসফিসে স্বরে, ঝামেলায় পড়েছেন মনে হচ্ছে?

গভীর ঝামেলায়।

স্ত্রীঘরের ব্যাপার-ট্যাপার নাকি?

সেইসঙ্গে আরও কিছু।

মানুষ খুন নয় তো?

এত তাড়াতাড়ি এসব কথা বলা যায় না, ম্যাকমুর্দো যেন নিজেও একটু অবাক হয়ে যায় ইচ্ছে না-থাকলেও এত কথা বলে ফেলার জন্যে। শিকাগো ছেড়ে চলে আসার পেছনে আমার নিজস্ব যথেষ্ট কারণ ছিল। এইটুকুই আপনার পক্ষে যথেষ্ট। এত কথা আপনি জানতে চাইছেন কেন?

চশমার আড়ালে সহসা বিপজ্জনক ক্রোধ ঝলসে উঠল দুই চোখে।

ঠিক আছে, দোস্ত, ঠিক আছে। খোঁচা মারার ইচ্ছে আমার নেই। অনেকে অনেক কথাই ভাবতে পারে আপনার কীর্তিকাহিনি শুনলে। চলেছেন কোথায়?

ভারমিসায়।

এখান থেকে তৃতীয় স্টপেজে ভারমিসা। কোথায় উঠবেন?

লেফাফাটা বার করে কালিমাখা তেলের লণ্ঠনের সামনে ধরল ম্যাকমুর্দো।

এই ঠিকানায়–জ্যাকব শ্যাফটার, শেরিডান স্ট্রিট। বোর্ডিং হাউস। সুপারিশ করেছেন, শিকাগোর এক পরিচিত ভদ্রলোক।

আমি অবশ্য চিনি না, ভারমিসা আমার আওতার বাইরে। আমি থাকি হবসন্স প্যাঁচ-এ, সবাই জমায়েত হই সেইখানে। কিন্তু ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে একটা উপদেশ দিতে চাই আপনাকে। ভারমিসায় কোনো ঝামেলায় পড়লে সোজা চলে যাবেন ইউনিয়ন হাউসে দেখা করবেন বস ম্যাকগিন্টির সঙ্গে। উনিই ভারমিসা লজের বডিমাস্টার ব্ল্যাকজ্যাক ম্যাকগিন্টি না-চাইলে জানবেন এ-তল্লাটে কোনো ঘটনা ঘটে না। আজ এই পর্যন্ত, দোস্ত। লজে দেখা হয়ে যেতে পারে কোনো এক সন্ধ্যায়। তবে আমার কথাটা মনে রাখবেন, বিপদে পড়লে বস ম্যাকগিন্টির শরণাপন্ন হবেন।

নেমে গেল স্ক্যানল্যান। আবার নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রইল ম্যাকমুর্দো। রাত হয়েছে। মাঝে মাঝে ফার্নেসের গনগনে আগুন সগর্জনে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে অন্ধকারের মধ্যে। মৃতবৎ পাণ্ডু। তমিস্রা-পটভূমিকায় কালো কালো ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। ভারী জিনিস

টেনে তোলার যন্ত্র চালাচ্ছে শরীর দুমড়েমুচড়ে, চরকি কল ঘোরাচ্ছে ঝুঁকে পড়ে অতি কষ্টে, ঝনঝন খটাং খটাং ধাতব শব্দে ছন্দ আর গর্জনের যেন বিরাম নেই, অন্ত নেই।

কে একজন বললে, নরকের চেহারা নিশ্চয় এইরকমই হবে।

ঘাড় ফিরিয়ে ম্যামুর্দো দেখলে একজন পুলিশের লোক চেয়ারে ঘুরে বসেছে, গনগনে রাঙা ভয়ানক আবর্জনা স্তুপের দিকে চোখ বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে।

অন্য পুলিশের লোকটা বললে, সেদিক দিয়ে বলব ঠিকই বলেছে। নরক নিশ্চয় এই রকমই দেখতে। যত বদমাশের নাম আমরা জানি, তার চাইতে অনেক জঘন্য বদমাশ ওদের মধ্যে রয়েছে। ইয়ংম্যান আপনি এদিকে নতুন মনে হচ্ছে?

নতুনই যদি হই তো হয়েছে কী? তেতো গলায় জবাব দেয় ম্যাকমুর্দো!

একটু সাবধান থাকবেন বন্ধু বাছবার সময়ে। আমি যদি আপনি হতাম, মাইক স্ক্যানল্যান বা তার দলবলের কারো সঙ্গে দোস্তি পাতাতে যেতাম না!

আমার বন্ধু নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কেন? এমন রুক্ষকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল ম্যাকমুর্দো যে কামরায় প্রত্যেকের মুণ্ডু ঘুরে গেল এইদিকে।কে জ্ঞান দিতে বলেছে আপনাকে? ভেবেছেন কী? আপনি আমায় শিখিয়ে দেবেন, নইলে আমি হোঁচট খাব? গায়ে পড়ে কথা বলতে আসবেন না।

বলতে বলতে মুণ্ডটা ঠেলে বাড়িয়ে ধরল ম্যাকমুর্দো, জ্বলন্ত চোখে টহলদার পুলিশ দু-জনের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ কুকুরের মতো হাসল দাঁত খিচিয়ে।

পুলিশের লোক দু-জনের স্বভাবটা ভালো, গায়েগতরেও ভারী বন্ধুভাবে উপদেশ দিতে গিয়ে এইরকম অসাধারণ তেজ দেখে তো হতবাক!

একজন বললে, আরে ভাই, এদেশে আপনি নতুন, অত চটছেন কেন? আপনার ভালোর জন্যেই বলেছিলাম।

বজ্রনাদে বললে ম্যাকমুর্দো, নতুন এদেশে হতে পারি, আপনাদের কাছে নই। সব দেশেই আপনারা এক ছাঁচে ঢালা। গায়ে পড়ে জ্ঞান দিতে আসেন।

অন্য পুলিশের লোকটি কাষ্ঠ হেসে বললে, শিগগিরই হয়তো মোলাকাত হতে পারে আপনার সঙ্গে। যদ্দূর মনে হচ্ছে আপনি তোক সুবিধের নন।

আমারও তাই মনে হচ্ছে, বললে অপরজন। শিগগিরই ফের দেখা হবেখন।

চিৎকার করে ম্যাকমুর্দো বললে, আপনাদের ডরাই না আমি। দেখে কি তাই মনে হল না? আমার নাম জ্যাক ম্যাকমুর্দো–শুনেছেন? আমাকে যখনই দরকার হবে, চলে যাবেন ভারমিসার শেরিডান স্ট্রিটের জ্যাকব শ্যাফটারের বাড়িতে তার মানে আপনাদের ভয়ে

লুকিয়ে থাকছি না। দিনে হোক, রাতে হোক–যখন হয় আপনাদের চোখে চোখে তাকানোর সাহস আমার আছে জানবেন। ভুল যেন না হয়।

নবাগতের এ ধরনের অকুতোভয় আচরণ দেখে বিস্ময়, তারিফ আর সহানুভূতির মিশ্রিত গুঞ্জন শোনা গেল শ্রমিকদের মধ্যে, পুলিশ দু-জন হতাশভাবে দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করল নিজেদের মধ্যে। মিনিট কয়েক পরেই স্বল্পালোকিত ডিপোয় এসে দাঁড়াল ট্রেন। বহু লোক আর মালপত্র নেমে গেল গাড়ি থেকে–কেননা ভারমিসা এ-লাইনের সবচেয়ে বড়ো শহর। চামড়ার থলিটা তুলে নিয়ে ম্যাকমুর্দো অন্ধকারে পা বাড়াতে যাচ্ছে, এমন সময়ে একজন খনিশ্রমিক এল পাশে পাশে।

বলল ভয়ার্ত চাপা গলায়, দোস্ত, টিকটিকিগুলোর মুখে মুখে বেশ তো জবাব দিতে পারেন। আপনার কথা শুনলে ভালো লাগে। চলুন আপনার থলি আমি নিয়ে যাচ্ছি রাস্তাও চিনিয়ে দিচ্ছি। শ্যাফটারের বোর্ডিং হাউস আমার ঝুপড়িতে যাওয়ার পথেই পড়বে।

প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে সম্মিলিত কণ্ঠে শুভরাত্রি জানিয়ে গেল অন্যান্য খনিশ্রমিকরা। ভারমিসায় পা ফেলার আগেই মুখে মুখে নাম ছড়িয়ে গেল দুর্দান্ত ম্যাকমুর্দোর। সে যে কী চরিত্র, লোকমুখে ছড়িয়ে গেল সেই খবর।

এ-তল্লাটে আতঙ্ক আকাশে বাতাসে, শহরটা যেন আরও এক কাঠি বেশি। বুক দমে যায়! সুদীর্ঘ উপত্যকা বরাবর আসবার সময়ে বিপুল আগুন আর ভাসমান ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে

অন্তত কিছুটা বুক কাঁপানো জাঁকজমকের চিহ্ন দেখা যায়। শক্তি আর পরিশ্রম দিয়ে দানবিক গর্ত খুঁড়ে মাটি বার করে পাশেই পাহাড় জমিয়ে মানুষ যে আসুরিক মেহনতের স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করেছে, তার মধ্যেও জমকালো আভাস চোখে পড়ে। শহরটা কিন্তু দারিদ্র, মালিন্য, কদর্য আর নোংরামির একটা মৃত সমতল ভূমি বললেই চলে। রাস্তা চওড়া, কিন্তু যানবাহনের যাতায়াতে অজস্র ভয়ংকর আঠালো খাত জেগে উঠেছে কাদাটে তুষারের ওপর। ফুটপাথ সরু এবং এবড়োখেবড়ো। অসংখ্য গ্যাসের বাতির আলোয় আরও স্পষ্টভাবে কেবলই দেখা যায় কাঠের বাড়ির সুদীর্ঘ সারি, প্রতিটা বাড়ির নোংরা অপরিচ্ছন্ন বারান্দা ফেরানো রাস্তার দিকে। শহরের কেন্দ্র যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই চোখে পড়ে প্রচুর আলো ঝলমলে দোকান পসারির দৌলতে উজ্জ্বল দৃশ্য, মদ খাওয়ার আর জুয়োখেলার আড্ডা। কষ্টার্জিত অর্থ দু-হাতে এখানে উড়িয়ে দেয় শ্রমিকরা।

প্রায় হোটেলের মতোই খানদানি একটা সেলুন ভবনের দিকে আঙুল তুলে বললে পথপ্রদর্শক, ওই হল ইউনিয়ন হাউস। ম্যাকগিন্টি ওখানকার বস।

ভদ্রলোক কীরকম? শুধোয় ম্যাকমুর্দো।

সেকী। বসের কথা কখনো শোনেননি নাকি?

কী করে শুনব? শুনলে তো এ-তল্লাটে আমি নতুন।

আমি তো জানতাম সারাদেশের লোক তার নাম জানে। কাগজেও উঠেছিল নামটা।

কী জন্যে?

গলা নামিয়ে বললে পথপ্রদর্শক, সেই ব্যাপারে।

কী ব্যাপারে?

হায় ভগবান! আপনি তো দেখছি অদ্ভুত রকমের ভালো লোক মশায়। কিছু মনে করলেন তো? এ-তল্লাটে শুধু একটা ব্যাপারই আপনার কানে আসবে–স্কোরারসদের ব্যাপারে।

স্কোরারসদের ব্যাপার আমি শিকাগোয় পড়েছি বটে। মানুষ খুনির দল, তাই না?

চুপ! বাঁচতে যদি চান, একদম চেঁচাবেন না! সভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে সঙ্গীর পানে তাকায় পথপ্রদর্শক। আরে মশাই, খোলা রাস্তায় যদি এইভাবে কথা বলতে থাকেন তো এ-অঞ্চলে বেশিদিন আর প্রাণ নিয়ে থাকতে পারবেন না। এর চাইতেও অনেক লঘু অপরাধে বহু লোকের জীবন গিয়েছে জানবেন।

অতশত জানি না। যা পড়েছি তাই বললাম।

যা পড়েছেন তা সত্যি নয়, এমন কথা আমি বলছি না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আশপাশ দেখতে দেখতে বললে লোকটা এমনভাবে জুলজুল করে চেয়ে রইল ছায়ামায়ার দিকে

যেন বিপদ ওত পেতে রয়েছে সেখানে, ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে। মানুষকে মারার নাম যদি খুন করা হয়, তাহলে জানবেন এ-তল্লাটে তা আকছার হয়–ভগবানও তা নিয়ে মাথা ঘামান না। দোহাই আপনার, খুনখারাপির সঙ্গে জড়িয়ে জ্যাক ম্যাকগিন্টির নামটা যেন উচ্চারণ করে বসবেন না নিশ্বেসের সঙ্গেও যেন এ-নাম কখনো না-বেরোয় আপনি নতুন এসেছেন তাই বলি–ফিসফিস করে কথা বললেও ম্যাকগিন্টির কানে তা পোঁছোয় এবং সে যা লোক, এ-কান দিয়ে শুনে ও-কান দিয়ে বার করে দেওয়ার পাত্র সে নয়। যাই হোক ওই সেই বাড়ি যেখানে যাবেন বলে এসেছেন রাস্তা থেকে একটু ভেতর দিকে। ওখানকার মালিক বুড়ো জ্যাকব শ্যাফটারের মতো সৎ লোক জানবেন এ-শহরে আর দু-টি নেই।

ধন্যবাদ, সদ্য পরিচিতের সঙ্গে করমর্দন করে চামড়ার থলিটা নিজের হাতে নিল ম্যাকমুর্দো, রাস্তা মাড়িয়ে বসতবাড়িটার সামনে গিয়ে খটাখট শব্দে আঙুলের গাঁট ঠুকল পাল্লায়। তৎক্ষণাৎ খুলে গেল কপাট–দোরগোড়ায় যাকে দেখা গেল মোটেই তাকে আশা করেনি ম্যাকমুর্দো।

অনিন্দ্যসুন্দরী একজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সুইডিশ ধরনের সুন্দরী, সোনালি সাদাটে চুল, তীব্র বৈষম্য প্রকট হয়েছে ভারি সুন্দর কাজলকালো চোখজোড়ার মধ্যে, অসাধারণ এই নয়ন যুগল দিয়েই আগন্তুকের আপাদমস্তক সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করে লাল করে ফেলল পাণ্ডুর মুখখানা–বিব্রত একটু হল বটে, কিন্তু তাও যেন অনেক সুখের। দরজার ফ্রেমে অত্যুজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা আশ্চর্য সুন্দর সেই চিত্রের পানে তাকিয়ে ম্যাকমুর্দোর মনে হল মন-ভার-করা নোংরা এই পরিবেশের পটভূমিকায় এর চাইতে মন-

টেনে নেওয়া ছবি বুঝি সে জীবনে দেখেনি। বৈষম্য যেন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে পটভূমিকা আর মূর্তির মধ্যে। খনি অঞ্চলের পাহাড়প্রমাণ ওই কালো গাদের মধ্যে যদি একটা মনোরম ভায়োলেট ফুলও ফুটত, তাও বুঝি এমন চমকপ্রদ হত না। অত্যন্ত অভিভূত হওয়ার দরুন মুখ দিয়ে কথা পর্যন্ত বেরুল না, শেষকালে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করল মেয়েটাই।

মিষ্টি সুইডিস উচ্চারণে বললে, আমি ভেবেছিলাম বাবা এসেছে। আপনি কি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? বাবা শহরে গেছে। এই এল বলে।

দুই চোখে অকপট প্রশংসা জাগিয়ে তখনও ম্যাকমুর্দো ঠায় তাকিয়ে রয়েছে অনলাকসামান্যা এই রূপসীর পানে শেষকালে কর্তৃত্বব্যঞ্জক মানুষটার সামনে বিড়ম্বিত চক্ষু নামিয়ে নিতে বাধ্য হল মেয়েটি।

অবশেষে বলল ম্যাকমুর্দো, খুব একটা তাড়া নেই দেখা করার। থাকার জন্যে এই বাড়িটাই সুপারিশ করা হয়েছিল আমাকে। তখন ভেবেছিলাম হয়তো মনের মতো হবে, এখন দেখছি সত্যিই মনের মতো হবে।

একটু হাসল মেয়েটি। বলল, বড়ো তাড়াতড়ি মন ঠিক করে ফেলেন তো।

জবাবে বলল ম্যাকমুর্দো, অন্ধ ছাড়া প্রত্যেকেই তাই করবে।

অভিনন্দন শুনে হেসে উঠল সুন্দরী।

বললে, ভেতরে আসুন। আমি মি. শ্যাফটারের মেয়ে মিস এট্টি শ্যাফটার। মা স্বর্গে গেছে, সংসার আমার হাতে। বাবা না-ফেরা পর্যন্ত সামনের ঘরে চুল্লির পাশে বসতে পারেন। এই তো এসে গেছে বাবা। এখুনি সেরে নিন কথাবার্তা।

ভারী চেহারার একজন প্রৌঢ় রাস্তা দিয়ে এলেন দরজার সামনে। দু-চার কথাতেই কাজের কথা শেষ করল ম্যাকমুর্দো। এ-ঠিকানা তাকে শিকাগোয় দিয়েছে মর্ফি নামে এক ভদ্রলোক। ঠিকানাটা মর্ফি পেয়েছে আবার আরেক জনের কাছে। বুড়ো শ্যাফটার রাজি হলেন। শর্ত নিয়ে দরকষাকষির মধ্যে গেল না আগন্তুক রাজি হল সব কথাতেই মনে হল টাকার অভাব নেই তার। সাতদিনের অগ্রিম বারো ডলার দিলেই থাকা খাওয়া মিলবে। এইভাবেই শ্যাফটারের বাড়িতে থাকার জায়গা পেয়ে গেল ম্যাকমুর্দো–সেই ম্যাকমুর্দো যে স্বমুখে স্বীকার করেছে আইন পুলিশ আদালতের রক্তচক্ষু এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে সুদূর ভারমিসায়। আতঙ্ক উপত্যকায় এই হল গিয়ে তার প্রথম পদক্ষেপ–এর পরেই শুরু হল কৃষ্ণকালো ঘোর কুটিল, সুদীর্ঘ ঘটনাপরম্পরা–শেষ হল বহুদূরের এক ভূমিখণ্ডে।

বডিমাস্টার

ম্যাকমুর্দো হল সেই লোক যে নিজের অস্তিত্ব ঝটপট হাড়েহাড়ে টের পাইয়ে ছাড়ে আশপাশের লোকদের। শ্যাফটারের আস্তানাতেও সাতদিন যেতে-না-যেতেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করল সে। দশ বারো জন বোর্ডার ছিল সেখানে। কিন্তু তারা হয় দোকান পশারির মামুলি কেরানি, নয় তো কারখানার ফোরম্যান সাতে নেই পাঁচে নেই, পরিষ্কার লোক—তরুণ আইরিশম্যান যে ক্ষমতায় ক্ষমতাবান–তার ধারেকাছেও আসে না। সন্ধে নাগাদ একসঙ্গে আড্ডায় বসলে দেখা যেত সবচেয়ে মনমাতানো গান জুড়েছে ম্যাকমুর্দো, জমিয়ে কথা বলতেও তার জুড়ি নেই, ঠাট্টা-তামাশাতে তাকে টেক্কা মারার মতো কেউ নেই। সব কিছুতেই সে উজ্জ্বল, সপ্রতিভ, চমকপ্রদ। সঙ্গী হিসেবে ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা তার আছে বলেই চুম্বকের মতো কৌতুকের বিকিরণে নিজের চারধারে বন্ধু জোটাতে পারে অনায়াসেই।

এ ছাড়াও কিন্তু আর একটা গুণ ছিল তার। মাঝে মাঝে আচমকা দপ করে জ্বলে উঠত সাংঘাতিক রাগে–রেলের কামরাতেই সে-নমুনা দেখা গেছে। প্রচণ্ড এই ক্রোধের জন্যে আরও বেশি খাতির পেয়েছে সে তার প্রতি ভয় আর শ্রদ্ধা বেড়েছে বহু গুণে। আইন-আদালতের ওপর তার আত্যন্তিক ঘেন্না কারো প্রাণে জাগিয়েছে পুলক, কারো প্রাণে আতঙ্ক। আইন সম্পর্কিত সব ব্যাপারেই ওর বিজাতীয় তিক্ততায় কেউ পেয়েছে ভয়, কেউ পেয়েছে আনন্দ।

প্রথম দর্শনেই এ-বাড়ির মেয়ের রূপলাবণ্যে সে যে মুগ্ধ, খোলাখুলিভাবে তারিফ করে প্রথম থেকেই তা স্পষ্ট করে তুলেছিল। পাণিপ্রার্থী হিসেবেও অযোগ্য সে নয়। দু-দিনের দিন মেয়েটিকে বলল, ভালোবাসি; তারপর থেকে হামেশাই বলতে লাগল একই কথা। মেয়েটি তাকে নিরাশ করবে কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না মুহূর্তের জন্যেও।

বলত চিৎকার করে, আর একজন আবার কে। গোল্লায় যাক সে! নিজের চরকায় তেল দিক সে! জীবনে যে-সুযোগ একবারের বেশি আসে না, অন্তরের সেই বাসনাকে আর একজনের জন্যে জলাঞ্জলি দিতে হবে নাকি? যত খুশি না বল না কেন এট্টি, একদিন তোমাকে হা বলতেই হবে। আমার বয়স এমন কিছু হয়নি–সেদিনের পথ চেয়ে থাকব আমি।

পাণিপ্রার্থী হিসেবে সে যে বিপজ্জনক তা তার ওই মন ভুলোনো মিষ্টি কথা আর বাকপটু আইরিশ রসনার মধ্যেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এ ছাড়াও তার সম্বল অনেক অভিজ্ঞতার ইন্দ্রজাল, মেয়েদের মন জয় করার রহস্য এবং সর্বোপরি মেয়েটিরই প্রেম। কাউন্টি মন্যাঘ্যান তার স্বদেশ। সেখানকার মনোহর উপত্যকা, দূরস্থিত অপরূপ দ্বীপ, নীচু পাহাড় আর সবুজ প্রান্তরের অজস্র ছবি উপহার দিত মুখে মুখে। পাঁক আর তুষার-মলিন এই দেশের পটভূমিকায় কল্পনারঙিন সে-দেশকে মনে হত আরও বেশি সুন্দর। এ ছাড়াও সুবিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল সে উত্তরাঞ্চল সম্পর্কে, মিচিগানের কাঠের শিবির আর ডেট্রয়েটের নগরজীবন সম্পর্কেও জ্ঞান তার গভীর, বাফেলো তার নখদর্পণে এবং শিকাগোের এক করাতকলে কাজ করার সময়ে অনেক কিছুই জেনেছে সেই শহরের। তারপরে কথায় কথায় এসেছে রোম্যান্সের আভাস। বিশাল শহর শিকাগোয় থাকার

সময়ে আবেগময় এমন সব অদ্ভুত আর প্রাণের ব্যাপার ঘটেছিল, যা নাকি বলা সমীচীন নয়। সতৃষ্ণনয়নে বলত হঠাৎ চলে আসার কাহিনি, অনেকদিনের সম্পর্ক আচমকা ছিন্ন হয়ে যাওয়ার গল্প, ধু-ধু বিষণ্ণ এই অজানা দেশে পালিয়ে আসার উপাখ্যান কৃষ্ণকালো দুই আঁখিতে সুগভীর মমতা আর সমবেদনা নিয়ে প্রতিটি কথা হৃদয় দিয়ে শুনত এট্টি দুটিই অতি মহৎ গুণ যা শেষ পর্যন্ত এবং স্বভাবতই আচমকা মোড় নিতে পারে পবিত্র প্রেমে।

ম্যাকমুর্দো সুশিক্ষিত। তাই হিসেবরক্ষকের একটা সাময়িক চাকরি জুটিয়ে নিয়েছিল। এই কাজেই বাইরে থাকতে হত সারাদিন, ফলে এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান লজের সর্বপ্রধানের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। গাফিলতিটা একদিন মনে করিয়ে দিল মাইক স্ক্যানল্যান–যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ট্রেনে। একই লজের সদস্য সে একদিন সন্ধ্যায় দেখা করতে এল ম্যাকমুর্দোর সাথে। লোকটা আকারে ছোটোখাটো, মুখটা ধারালো, একটুতেই ঘাবড়ে যায়। চোখ কালো। খুব খুশি ম্যাকমুর্দোকে ফের দেখে। দু-গেলাস হুইস্কি পান করার পর আসার উদ্দেশ্যটা বলল।

ম্যাকমুর্দো, তোমার ঠিকানাটা মনে ছিল বলেই সোজা চলে এলাম। বডিমাস্টারের সঙ্গে এখন দেখা করনি দেখে অবাক হচ্ছি। ম্যাকগিন্টির কাছে এখনও না-যাওয়ার কারণটা কি বলতে পারো?

চাকরি খুঁজতে হচ্ছিল যে। বড় ব্যস্ত ছিলাম।

চুলোয় যাক সব কাজ, ওর সঙ্গে দেখা করার মতো সময় তোমার করতেই হবে। আশ্চর্য লোক তো তুমি! যেদিন এলে এখানে, তার পরের দিনই সকালে ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে নামটা লিখিয়ে আসা উচিত ছিল। ম্যাকগিন্টির বিষ নজরে পড়লে কিন্তু না, না, তা যেন না হয়।

মৃদু বিস্ময় দেখায় ম্যাকমুর্দো।

স্ক্যানল্যান, বছর দুই হল লজের মেম্বার হয়েছি আমি, কিন্তু কর্তব্য যে এত জরুরি হতে পারে, তা তো শুনিনি কখনো।

শিকাগোতে–হতে পারে, এখানে এইরকমই।

কিন্তু একই সোসাইটি তো এখানেও।

তাই কি? বেশ কিছুক্ষণ ওর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে স্ক্যানল্যান। কীরকম যেন একটা করাল ছায়া পড়ে চোখের তারায়।

তাই নয় কি?

একমাসের মধ্যেই জবাবটা তুমি নিজেই দেবে। শুনলাম আমি ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পর টহলদার পুলিশের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল?

তুমি জানলে কী করে?

খবর ঠিক বেরিয়ে যায় ভালো হোক, মন্দ হোক, কোনো খবরই চাপা থাকে না এ-অঞ্চলে।

হ্যাঁ হয়েছিল। কুত্তাগুলোকে যা বলবার বলে দিয়েছি।

বলো কী! ম্যাকগিন্টি তোমাকে যে মাথায় নিয়ে নাচবে।

তাই নাকি? পুলিশ কি তারও চক্ষুশূল?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্ক্যানল্যান।

যাবার জন্যে উঠে পড়ে বললে, নিজেই গিয়ে দেখে এসো না। কিন্তু যদি না-যাও, পুলিশের বদলে তুমিই তার চক্ষুশূল হবে। বন্ধুর কথা শোননা, এখুনি যাও।

ঘটনাক্রমে সুযোগটা এল সেইদিনই। সেই রাতেই আর একজনের সঙ্গে দেখা করতে হল ম্যাকমুর্দোকে। ম্যাকগিন্টির সঙ্গে দেখা করার চাইতেও এই সাক্ষাৎকারটি আরও বেশি জরুরি হলে কী হবে, কথাবার্তার পর ভেতর থেকে সে তাগিদ অনুভব করল ম্যাকগিন্টির সঙ্গে দেখা করার। আগের চাইতে এট্টির প্রতি তার দুর্বলতার বাড়াবাড়ির

জন্যেই হোক, কি সরলমনা সুইডিশ গৃহস্বামীর মন্থর মগজে বিষয়টা ধীরে ধীরে প্রবেশ করার জন্যেই হোক, যুবাপুরুষকে নিজের প্রাইভেট রুমে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গেলেন বোর্ডিং-হাউসের মালিক এবং বিনাভূমিকায় কাজের কথা আরম্ভ করলেন।

বললেন, মিস্টার, মনে হচ্ছে আমার মেয়ের দিকে ঝুঁকেছেন আপনি। ঠিক কিনা?

ঠিক, জবাব দিল যুবাপুরুষ।

তাহলে সোজা বলে দিই, সুবিধে হবে না। আপনার আগেই আর একজন এসে গেছে।

জানি এট্টি বলেছে।

নামটা বলেছে কি?

না; জিজ্ঞেস করেছিলাম, বলেনি।

ভয় পাবেন বলে বলেনি।

ভয় পাব। নিমেষে জ্বলে উঠল ম্যাকমুর্দো।

হ্যাঁ বন্ধু হ্যাঁ! তাকে ভয় পাওয়ার মধ্যে লজ্জা নেই। নাম তার টেড বলডুইন।

সে আবার কে?

স্কোরারস! নামটা আগে শুনেছি বটে। সবাই দেখছি কানাকানি করে স্কোরারস! এত ভয় কীসের? স্কোরারস মানে কারা?

ভয়ংকর এই সমিতির কথা উঠলেই সবাই যেমন গলা নামিয়ে নেয়, ঠিক সেইভাবে আপনা হতে গলা খাদে নেমে এল গৃহস্বামীর।

বললেন, স্কোরারস-রা এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যান।

চমকে ওঠে যুবাপুরুষ।

সেকী। আমি নিজেও তো অর্ডারের মেম্বার।

আপনি! আগে বলেননি কেন? হপ্তায় এক-শো ডলার দিলেও বাড়িতে থাকতে দিতাম না।

কিন্তু অর্ডারের ওপর এত খাপ্পা কেন? অর্ডার তো একটা দানধ্যান আর মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধির সংস্থা। নিয়ম-টিয়ম সেইরকমই।

ওসব অন্য জায়গায়–এখানে নয়!

এখানে কী?

মানুষ খুনের সমিতি।

অবিশ্বাসের হাসি হাসল ম্যাকমুর্দো। বলল, প্রমাণ করতে পারেন? প্রমাণ করতে হবে! পঞ্চাশটা খুন কি প্রমাণ নয়? মিলম্যান আর ভ্যান শস্ট, নিকলসন পরিবার, বুড়ো মি. হিয়াম, ছোট্ট বিলি জেমস। এ-রকম আরও অনেকের জীবন যাওয়ার পরেও প্রমাণ চাই? এ-তল্লাটে এমন কোনো পুরুষ কি নারী আছে যে এসব জানে না? এর পরেও চাই প্রমাণ?

ম্যাকমুর্দো সমস্ত অন্তর দিয়ে বললে, দেখুন মশায়, হয় যা বলেছেন তা ফিরিয়ে নিন, নইলে প্রমাণ করুন। আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে দুটোর একটা করতেই হবে আপনাকে। আমার জায়গায় নিজেকে বসান। এ-শহরে আমি নতুন। যে-সমিতির আমি সদস্য, আমি জানি তা অত্যন্ত নিরীহ সমিতি–অন্যায়ের মধ্যে নেই। যুক্তরাষ্ট্রের এ-মোড় থেকে ও-মোড় পর্যন্ত যেখানে যাবেন, দেখবেন একই চেহারা কোনোরকম অন্যায়ের মধ্যে নেই সমিতির কোনো শাখা। এখানকার শাখায় নাম লেখাব বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময়ে আপনি বললেন এটা একটা মানুষ খুনের সমিতি–নাম, স্কোরারস। মি. শ্যাফটার, হয় আপনি ক্ষমা চান, নইলে যা বলেছেন তা বুঝিয়ে বলুন।

মিস্টার, দুনিয়া যা জানে আমি আপনাকে শুধু তাই বলতে পারি। এরা সবাই এক। একজনের ওপরওয়ালার সঙ্গে আরেকের ওপরওয়ালার কোনো তফাত নেই। একজনকে যদি চটিয়েছেন তো আরেকজন আপনাকে মরণ মার মারবে। অনেকবার সে প্রমাণ হয়ে গেছে।

সমস্ত গুজব। আমি প্রমাণ চাই! বললেন ম্যাকমুর্দো।

বেশিদিন এখানে থাকলেই প্রমাণ নিজেই পেয়ে যাবেন। কিন্তু ভুললে চলবে না আপনি এদেরই একজন। ওদের মতো আপনিও শিগগির জঘন্য হয়ে যাবেন। আপনি আর কোথাও গিয়ে থাকুন, মিস্টার। জায়গা পেয়ে যাবেন। এখানে রাখতে পারব না। ওদের একজন এট্টির সঙ্গে প্রেম করবে না বলতেও পারব না কিন্তু আর একজন বোর্ডার হয়ে থাকবে, তা কি হয়? খুব খারাপ। না, মশাই, আজ রাতে এখানে আর শোবেন না।

এইভাবেই একাধারে আরামের ঘর আর প্রাণের সখীর কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ার নির্বাসনদণ্ড পেল বেচারা ম্যাকমুর্দো। সেই রাতেই বসবার ঘরে এটিকে একা পেয়ে দুঃখের কাহিনি বর্ষণ করল তার কানে।

বললে, তোমার বাবা তো আমাকে নোটিশ দিয়ে দিলেন। শুধু ঘর ছাড়ার নোটিশ হলে ধার ধারতাম না। কিন্তু বিশ্বাস করো এট্টি, মাত্র সাতদিন আগে তোমাকে দেখলেও আমার চোখের মণি হয়ে উঠেছ তুমি। তুমি ছাড়া দুনিয়া এখন অন্ধকার আমার কাছে।

আঃ, চুপ করুন না! ওভাবে কথা বলবেন না, মি. ম্যাকমুর্দো! বলিনি আপনাকে বড্ড দেরি করে ফেলেছেন? আপনার আগেই যে এসেছে, তাকে বিয়ে করব বলিনি ঠিকই, কিন্তু আর কাউকে বিয়ের কথা দেওয়াও আর সম্ভব নয়।

প্রথমে এলে কি কপাল খুলত?

দু-হাতে মুখ ঢাকা দেয় সুন্দরী।

ফুঁপিয়ে উঠে বলে, ভগবান তাই করলেন না কেন।

নিমেষের মধ্যে এট্টির সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ে ম্যাকমুর্দো।

ঈশ্বরের দোহাই এট্টি, তাই হোক! কাকে কি কথা দিয়েছ তার জন্যে আমার আর তোমার দুটো জীবনই নষ্ট করবে নাকি? মন যা চায়, বিবেক যা বলে তাই করো, সখী! কথা যখন দিয়েছিলে, তখন কি জানতে, যা বলছ তার মানে কী? কাজেই এখন বিবেকই তোমাকে ঠিক পথ দেখাবে।

বলিষ্ঠ বাদামি হাতে এট্টির ধবধবে সাদা দু-হাত আঁকড়ে ধরে ম্যাকমুর্দো।

শুধু বলো তুমি আমার–তারপর কপালে যাই থাকুক না কেন লড়ে যাব পাশাপাশি।

এখানে নয় তো?

হ্যাঁ, এখানেই।

না, জ্যাক, না? ম্যাকমুর্দোর বাহুবন্ধনে বাঁধা পড়ে এট্টি! এখানে তা হতেই পারে না। অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারো না?

মুহূর্তের জন্য যেন একটা দ্বন্দ্ব ভেসে যায় ম্যাকমুর্দোর মুখের ওপর দিয়ে–কিন্তু তা ক্ষণিকের দ্বন্দ্ব–পরক্ষণেই গ্রানাইট পাথরের মতো কঠিন হয়ে ওঠে মুখাবয়ব।

বলে, না, যা হবে এখানেই হোক। দুনিয়ার কারো ক্ষমতা নেই তোমাকে কেড়ে নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। আমি তোমায় আগলাব–এইখানে যেখানে আছি, সেইখানে।

একসঙ্গে দু-জনে পালিয়ে গেলে হয় না?

না, এট্টি। আমি পালাব না।

কিন্তু কেন?

তাড়া খেয়ে একবার যদি পালাই তো জীবনে আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না। তা ছাড়া ভয়টা কীসের? স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক আমরা। আমি যদি তোমাকে

ভালোবাসি, আর তুমি যদি ভালোবাসো আমাকে মাঝে আসবার মতো বুকের পাটা কারো আছে কি?

জ্যাক, তুমি জানো না। কদ্দিন-বা আর আছে এখানে। বলডুইনকে তুমি চেনো না। ম্যাকগিন্টি আর তার স্কোরারসদেরও চেনো না।

চিনি না, ডরাই না, তোয়াক্কা করি না। ডার্লিং, জীবনটা আমার খারাপ লোকের সঙ্গে কেটেছে। আমি তাদের ভয় পাইনি–তারাই আমাকে ভয় করতে শিখেছে। তোমার বাবা বললেন স্কোরারসরা নাকি অপরাধের পর অপরাধ করে যায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে-খবর রাখে–নাম-ধাম পর্যন্ত জানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বিচার হয় না কেন বুঝি না? জবাব দাও এট্টি, বুঝিয়ে দাও।

সাক্ষী হবার মত বুকের পাটা কারো নেই বলেই বিচার হয় না। এ-দুঃসাহস যে দেখাবে, এক মাসের বেশি আর তাকে বাঁচতে হবে না। তা ছাড়া ওদের নিজেদের লোক সবসময়ে তৈরি থাকে মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ার জন্যে গিয়ে বলে আসে অমুক সময়ে আসামি অকুস্থল থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু জ্যাক এসব তো তোমার পড়া উচিত। আমি তো জানি যুক্তরাষ্ট্রে সব খবরের কাগজেই এ নিয়ে লেখালেখি হয়েছে।

পড়েছি ঠিকই, তবে তা গল্প বলেই মনে হয়েছে। হয়তো কারণ আছে বলেই এরা এসব করে। হয়তো এ ছাড়া আর গতি নেই বলেই করে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

জ্যাক, এ-কথা তোমার মুখে শুনতে চাই না। ঠিক এইভাবেই কথা বলে সেই আর একজন!

বলডুইন এই কথা বলে বুঝি?

সেইজন্যেই দু-চক্ষে দেখতে পারি না তাকে। জ্যাক, তবে শোনো আমার মনের কথা; ওকে আমি দেখতে পারি না ঠিকই কিন্তু ভয় না-করেও পারি না। ভয়টা শুধু নিজের জন্যে নয়–বাবার জন্যেও বটে। আমার মনের কথা যদি বলে বসি তাহলে বাবার দুর্গতির আর সীমা থাকবে না। তাই ভাসা ভাসা কথা দিয়ে কোনোমতে ঠেকিয়ে রেখেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে এ ছাড়া আর উপায় নেই আমাদের। কিন্তু যদি আমাকে নিয়ে পালাও, বাবাকে নিয়ে এমন জায়গায় যাব যেখানে এই বদমাইশদের হাত কোনোদিনও পৌঁছোবে না।

আবার সেই মানসিক দ্বন্দ্বের খেলা দেখা গেল ম্যাকমুর্দোর মুখের পরতে পরতে, গ্রানাইট কঠিন হয়ে উঠল প্রতিটি পেশি।

এট্টি, কোনো ক্ষতি হবে না তোমার তোমার বাবারও হবে না। বদমাইশ যাদের বলছ, শেষকালে হয়তো দেখবে তাদের চাইতে কোনো অংশে আমি কম যাই না।

না, জ্যাক, না। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি।

তিক্ত হাসল ম্যাকমুর্দো।

হায় রে, আমার সম্বন্ধে কত কমই-না জানো তুমি! মনে তোমার পাপ নেই, তাই বুঝতে পারছ না কী লড়াই চলছে আমার ভেতরে। কিন্তু দেখো তো কে এল?

আচমকা দড়াম করে দরজা দুইটি হাট করে খুলে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল একদল যুবক–ভাবখানা যেন এ-বাড়ির মালিক সে-ই। সুদর্শন, ম্যাকমুর্দোর মতোই বয়স আর গড়নপেটন–সেইরকমই বেপরোয়া, তুখোড়। চওড়া কিনারাওয়ালা মাথার টুপিটা পর্যন্ত খোলার দরকার মনে করেনি ছোকরা। টুপির তলায় সুশ্রী মুখের ভয়ংকর চোখ দুটো বর্বর চাহনি হেনে রয়েছে চুল্লির পাশে উপবিষ্ট যুগল মূর্তির দিকে। ছোকরার নাক বাজপাখির চঞ্চুর মতো টিকোলো, চোখ থেকে যেন দাপট ঠিকরে বেরুচ্ছে।

ভীষণ ভয়ে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিল এটি।

বললে, আসুন, মি. বলডুইন, আসুন। একটু আগেই এসে গেছেন। বসুন। খুব খুশি হলাম আপনাকে দেখে।

পাছার ওপর দু-হাত রেখে পলকহীন চোখে ম্যাকমুর্দোর পানে চেয়ে রইল বলডুইন।

জিজ্ঞেস করল কাটছাঁট গলায়, এ কে?

আমার বন্ধু, মি. বলডুইন–নতুন বোর্ডার। আসুন মি. ম্যাকমুর্দো আলাপ করিয়ে দিই মি. বলডুইনের সাথে।

খেকি চোখে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানায় দুই যুবাপুরুষ।

শুধোয় বলডুইন, মিস এট্টির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা নিশ্চয় শোনা হয়ে গেছে?

আপনাদের মধ্যে আদৌ যে কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে, এটাই তো মাথায় ঢোকাতে পারছি না।

পারছেন না বুঝি? এবার পারবেন। আমার মুখেই তাহলে শুনে রাখুন–এ-ভদ্রমহিলা আমার এবার সরে পড়ুন, সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে পড়ুন।

ধন্যবাদ। সান্ধ্যভ্রমণের মেজাজ নেই।

নেই বুঝি? পাশবিক চোখজোড়া বিষম ক্রোধে যেন স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করে, হাতাহাতির মেজাজ আছে মনে হচ্ছে, মি. বোর্ডার?

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ম্যাকমুর্দো বললে হুংকার ছেড়ে, তা আছে। এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা বললেন প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

ভগবানের দোহাই, জ্যাক, ভগবানের দোহাই! ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠে বেচারি এটি। জ্যাক, জ্যাক, ও তোমার সর্বনাশ করে ছাড়বে।

আরে সব্বোনাশ! এর মধ্যে জ্যাক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে? বিশ্রী দিব্যি গেলে বলে বলডুইন। অনেকদ্দূর গড়িয়েছে দেখছি?

টেড, মাথাটা ঠান্ডা করো–অত নিষ্ঠুর হোয়ো না। আমার দোহাই টেড, ভালো যদি বেসে থাকো আমায়–মনটাকে বড়ো করো, ক্ষমার চোখে দেখো!

ঠান্ডা গলায় ম্যাকমুর্দো বললে, এট্টি তুমি একটু বাইরে গেলে দুজনের মধ্যে মিটিয়ে নিতে পারতাম ব্যাপারটা। নয়তো, আমার সঙ্গে রাস্তায় আসতে পারেন মি. বলডুইন। রাতটা

সুন্দর, এ-বাড়ির পরেই খানিকটা ফাঁকা মাঠও আছে।

আপনাকে শায়েস্তা করার জন্যে আমার হাত নোংরা করার দরকার হবে না, জবাব দিল শত্রুপক্ষ। শেষকালে আপশোস করে মরতে হবে এ-বাড়িতে পা দেওয়ার জন্যে।

সেটা এখনই হয়ে যাক না কেন। গলার শির তুলে বললে ম্যাকমুর্দো।

মিস্টার, আমার যখন সময় হবে, তখন আসব আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। দেখুন! আচমকা জামার আস্তিন গুটিয়ে দেখালে একটা অদ্ভুত চিহ্ন। চামড়ার ওপর যেন দাগিয়ে আঁকা। বৃত্তের মাঝে একটা ত্রিভুজ। মানে জানেন?

জানি না, পরোয়াও করি না!

জানবেন, শিগগিরই জানবেন। কথা দিয়ে গেলাম। বেশি দেরি লাগবে না। মিস এট্টির কাছেও এর মানে কিছু কিছু শুনবেনখন। এটি, পায়ে ধরতে হবে আমার কাছে আসার জন্যে এই বলে দিলাম। কথাটা কানে ঢুকেছে? পায়ে ধরতে হবে! তখন বুঝিয়ে দেব শাস্তি কাকে বলে। যা করেছ তার পুরস্কার না-পেলে চলে কি? পুরস্কার আমি দেব। জ্বলন্ত চোখেব দু-জনের পানে তাকিয়ে বোঁ করে পেছন ফিরে বেরিয়ে গেল বলডুইন–দড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল পেছনে।

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইল ম্যাকমুর্দো আর এটি। তারপর দু-হাতে ম্যাকমুর্দোকে জড়িয়ে ধরল এটি।

জ্যাক, এত সাহস তোমার। কিন্তু ওতে কোনো কাজ হবে না, জ্যাক–পালাও! আজ রাতেই পালাও–হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজ রাতেই! এ ছাড়া বাঁচবার আর পথ নেই। ও তোমায় প্রাণে মারবে। ওর চোখ দেখেই বুঝেছি তোমার আর রক্ষে নেই। তুমি একা, ওরা জন বারো বস ম্যাকগিন্টি আর লজের সমস্ত শক্তি ওদের পেছনে পারবে না, জ্যাক, পারবে না।

বাহুমুক্ত হয়ে এট্টির মুখচুম্বন করল ম্যাকমুর্দো–আলগোছে ঠেলে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

সখী, আমার জন্যে ভয় পেয়ো না, মাথা খারাপ কোরো না। আমি নিজে ফ্রিম্যান–একই সমিতির সদস্য। তোমার বাবাকেও বলেছি। ওদের চেয়ে ভালো নাও হতে পারি–তাই বলছি আমাকে সাধুসন্ত ঠাউরে বোসো না। আমিও শেষ পর্যন্ত চক্ষুশূল হয়ে উঠতে পারি অনেক বলে ফেললাম।

তুমি আমার চক্ষুশুল হবে? বেঁচে যতক্ষণ থাকব, ততক্ষণ তোমাকে ঘৃণা করতে আমি পারব না। শুনেছি, ফ্রিম্যান হওয়াটা এখানেই কেবল অপরাধ–অন্য কোথাও নয়। কাজেই তোমাকে খারাপ ভাবব কেন? কিন্তু জ্যাক, তুমি যদি ফ্রিম্যানই হও তো এখুনি গিয়ে বস ম্যাকগিন্টির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নাও! তাড়াতাড়ি যাও জ্যাক, তাড়াতাড়ি যাও। আগে গিয়ে তোমার কথা বললা, নইলে কুত্তার দল লেগে যাবে তোমার পেছনে।

ম্যাকমুর্দো বললে, আমিও তাই ভাবছিলাম। এখুনি গিয়ে কাজ পাকা করে নিচ্ছি। বাবাকে বলে দিয়ো আজ রাত্রে এখানেই শোব কাল সকালে অন্য জায়গা খুঁজে নেব।

ম্যাকগিন্টির সেলুনে মদের আড্ডা রোজকার মতো আজও জমজমাট। শহরের যত বদমাশের প্রিয় জায়গা এই সেলুন। ম্যাকগিন্টি নিজেও খুব জনপ্রিয় ওর কর্কশ আমুদে স্বভাবের জন্য আসলে ওটা বাইরের মুখোশ–ভেতরকার অনেক কিছু রেখেঢেকে দেওয়ার প্রয়াস। জনপ্রিয়তা ছাড়াও লোকে তাকে ভয় করে। শহরের প্রত্যেকে তো বটেই, তিরিশ মাইলব্যাপী উপত্যকার সর্বত্র, এমনকী দু-পাশের পাহাড়ের ওপাশেও যারা থাকে

ম্যাকগিন্টির নামে কেঁপে ওঠে। এই কারণেই তার মদের আড্ডা এত সরগরম–কেননা ম্যাকগিন্টির বিরাগভাজন হয়ে বা তার পৃষ্ঠপোষকতা উপেক্ষা করে থাকার মতো বুকের পাটা এ-তল্লাটে কারুর নেই।

লোকটার গুপ্ত শক্তি আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জানে নির্দয়ভাবে এই শক্তির প্রয়োগ করতে তিলমাত্র দ্বিধা সে করে না। এ ছাড়াও সে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, জনগণের বরণীয় প্রতিনিধি, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলর এবং পথ কমিশনার। এ-পদে সে এসেছে গণভোটের জোরে এবং ভোট দিয়েছে মার্কামারা বদমাইশদের দল–কৃপালাভের প্রত্যাশায়। ট্যাক্স আর ডিউটি আকাশছোঁয়া, অথচ জনগণের কাজকর্ম সম্পূর্ণ উপেক্ষিত দুর্নামের ধার ধারে না ম্যাকগিন্টি। হিসাব পরীক্ষকদের মোটা ঘুস খাইয়ে হিসাবের গোঁজামিল চাপা দিয়ে রাখে। সুধী নাগরিকরা প্রাণের ভয়ে নিঃসীম আতঙ্কে পাবলিক ব্ল্যাকমেলিংয়ের টাকা গুনে দেয় কড়ায়-গণ্ডায়। টু শব্দটি করতে পারে না। সাংঘাতিক দুর্দৈবর ভয়ে। এই কারণেই বছর বছর বস ম্যাকগিন্টির হিরের পিন আরও বেশি ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, সোনার চেন আরও বেশি ভারী হয়েছে, মানিব্যাগ দিনকে দিন আরও পেটমোটা হয়েছে। সেলুনটাও ক্রমশ আকারে লম্বা হতে হতে মার্কার স্কোয়ারের পুরো একটা দিকই প্রায় দখল করে নিতে বসেছে।

সেলুনের দুলন্ত দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ম্যাকমুর্দো। লোক গিজগিজ করছে ভেতরে, তামাকের ধোঁয়া আর সুরার গন্ধে ভারী বাতাস। অত্যুজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করেছে চারিদিক, মোটা গিল্টি করা প্রকাণ্ড দর্পণ ঝুলছে প্রতিটি দেওয়ালে চটকদার আলোর সহস্র প্রতিফলনে ঘরে যেন সহস্র সূর্য জ্বলছে। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে জনাকয়েক মদ্য

পরিবেশক পুরু ধাতুর চাদর দিয়ে মোড়া বার কাউন্টারের ভেতরে মদ ঢালা নিয়ে ব্যস্ত কাউন্টার ঘিরে মদের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছে সুরাসক্তরা। কাউন্টার ঘিরে ভর দিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ আকৃতির পুরুষ–ঠোঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে রয়েছে একটা জ্বলন্ত চুরুট স্বনামধন্য ম্যাকগিন্টি স্বয়ং দাঁড়িয়ে কাউন্টারে। লম্বা কালো কেশর দেখে মনে হয় যেন একটা দানব বিশেষ। হনু পর্যন্ত ঢাকা কালো দাড়িতে। দাঁড়কাক কালো-চুল লুটোচ্ছে কলারের ওপর। ইটালিয়ানদের মতোই শ্যামবর্ণ গায়ের রং। চোখ দুটো অদ্ভুত রকমের কুচকুচে কালো–চাহনি সামান্য ট্যারা হওয়ার ফলে মুখখানা কেমন যেন কুটিল। এ ছাড়া লোকটার সবকিছুই মন কেড়ে নেওয়ার মতো। চালচলন সম্রান্ত, আকৃতি নিখুঁত, কথাবার্তা প্রাণখোলা প্রত্যেকের সঙ্গেই হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে যেন এক হয়ে যাচ্ছে। যে কেউ দেখলেই বলবে, এ তো দেখছি রুক্ষ কিন্তু সরল, সজ্জন পুরুষ–কথাবার্তা কাঠখোট্টা হলেও ভেতরটা খাঁটি। কিন্তু মিশমিশে কালো, অনুতাপহীন নিতল চক্ষুর দৃষ্টি যার ওপর পড়ে, তার কলজে পর্যন্ত শুকিয়ে যায় নামহীন আতঙ্কে শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু দিয়ে উপলব্ধি করে সামনে দাঁড়িয়ে আছে সুপ্ত পৈশাচিকতার অনন্ত সম্ভাবনা–শক্তি, সাহস, আর ধূর্ততার ফলে তা সহস্রগুণ বেশি মারাত্মক।

খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হলে নিজস্ব উদ্ধত বেপরোয়া ভঙ্গিমায় কনুইয়ের গুঁতো মেরে ভিড় ঠেলে ম্যাকগিন্টির দিকে গেল ম্যাকমুর্দো। শক্তিমান গুরুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে স্তাবকের দল। রসের অতি ছোট্ট হাসির কথাতেই অট্টহেসে ঘর ফাটিয়ে দিচ্ছে। এদেরও কনুইয়ের গুতোয় দু-পাশে সরিয়ে দিয়ে একদম সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাকমুর্দো। নিমেষে

মিশমিশে কালো মৃতবৎ দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল নবাগত তরুণের ধূসর সাহসিক দুই চোখের ওপর চশমার কাচের মধ্য দিয়ে নির্ভীক চোখে চেয়ে রইল নবাগত নিজেও।

ইয়ংম্যান, আপনার মুখ তো মনে করতে পারছি না।

আমি এখানে নতুন মি. ম্যাকগিন্টি।

ভদ্রলোকের উপর্যুক্ত উপাধিটা না-বলার মতো নতুন নিশ্চয় নয়?

ইয়ংম্যান উনি কাউন্সিলর ম্যাকগিন্টি, পেছন থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠস্বর।

দুঃখিত কাউন্সিলর। এ-অঞ্চলের কিছুই আমি জানি না। কিন্তু আমাকে বলা হয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

এই তো বেশ দেখা হয়ে গেল। যা দেখছেন, আমি ঠিক তাই। কীরকম মনে হয় আমাকে?

সবে তো এলাম। আপনার শরীরের মতো হৃদয়টাও যদি বড়ো হয়, মুখের মতো মনটাও যদি নিখুঁত হয় তাহলে বেশি আর কিছুই চাইব না। বললে ম্যাকমুর্দো।

আরেব্বাস! মাথার মধ্যে আইরিশ জিভ ঢুকিয়ে বসে আছেন দেখছি, সাক্ষাৎপ্রার্থীর ঔদ্ধত্য দেখে ঠিক কী বলা উচিত ভেবে পায় না ম্যাকগিন্টি। মর্যাদা বজায় রেখে গম্ভীর হবে না, হেসে জবাব দেবে? আমার শরীরটা তাহলে মনে ধরেছে?

নিশ্চয়, বলে ম্যাকমুর্দো।

আপনাকে বলা হয়েছিল আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে?

হ্যাঁ।

কে বলেছিল?

ভারমিসার ৩৪১ নম্বর লজের ব্রাদার স্ক্যানল্যান। কাউন্সিলর, আপনার স্বাস্থ্যপান করছি– আমাদের পরিচয় যেন আরও নিবিড় হয়। মদের গেলাস হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল একজন। এখন সেই গেলাস ঠোঁটের কাছে তুলে ধরে কড়ে আঙুল উঁচু করে ধরল ম্যাকমুর্দো এবং পান করল এক নিঃশেষে।

সংকীর্ণ চোখে যুবাপুরুষকে নিরীক্ষণ করছিল ম্যাকগিন্টি। মিশমিশে কালো দুই ভুরু তুলে এখন বললে, আচ্ছা, এই ব্যাপার। তাহলে আপনাকে আরও একটু ভালো করে জানা দরকার মিস্টার–

মি. ম্যাকমুর্দো।

একটু ভালো করে, আরও একটু কাছ থেকে আপনাকে দেখা দরকার। এ-তল্লাটে মুখের কথায় কাউকে আমরা বিশ্বাস করি না, শুধু বিশ্বাসের ওপর সব কিছু ছেড়ে দিই না। বারের পেছনে এদিকে একটু আসুন, ইয়ংম্যান।

ছোট্ট একটা ঘরের ভেতরে ম্যাকমুর্দোকে নিয়ে গিয়ে সতর্কভাবে দরজা বন্ধ করল ম্যাকগিন্টি। ঘরের চারদিকে লাইন দিয়ে সাজানো পিপে। নিজে বসল একটা পিপের ওপর। রক্তহিম-করা সেই চাহনি মেলে বেশ কিছুক্ষণ নীরবে নিরীক্ষণ করে গেল নবাগতকে চিন্তামগ্নভাবে কেবল চিবিয়ে চলল চুরুটের গোড়া। মিনিট দুয়েক বসে রইল এইভাবে–একটা কথাও বলল না।

উৎফুল্লভাবে পর্যবেক্ষণ-পর্ব দেখছিল ম্যাকমুর্দো। একহাত কোটের পকেটে, আর একহাত তা দিচ্ছে বাদামি গোঁফে। আচম্বিতে ভীষণদর্শন একটা রিভলবার তুলে ধরল ম্যাকগিন্টি।

বললে, ওহে জোকার, এটা দেখে রাখো। ইয়ার্কি মারতে এসেছ যদি বুঝতাম, এক গুলিতেই পরলোকে পৌঁছে দিতাম।

স্বাগতমটা অদ্ভুত রকমের হয়ে গেল না? মর্যাদা-গম্ভীর কণ্ঠে বললে ম্যাকমুদো। নতুন ব্রাদারকে এভাবে অভ্যর্থনা জানানো ফ্রিম্যানদের লজের বডিমাস্টারের পক্ষে কি শোভন?

আরে সেইটাই তো প্রমাণ করতে চাইছিলাম আমি, বললে ম্যাকগিন্টি। ফেল করলে ভগবান ছাড়া আপনাকে কেউ রক্ষে করতে পারত না। কোন লজের মেম্বার?

লজ ২৯, শিকাগো।

কবে?

২৪ জুন, ১৮৭২।

বডিমাস্টার কে?

জেমস এইচ স্কট।

জেলাশাসক কে?

বার্থোলোমিউ উইলসন।

কথায় খুব চৌকস দেখছি। এখানে কী করা হয়?

আপনাদের মতোই একটা কাজ নিয়ে আছি–তবে আয় কম।

উত্তরগুলো খুব ঝটপট দিয়ে যাচ্ছেন দেখছি।

তা ঠিক। কথা বলি খুব তাড়াতাড়ি।

হাত-পা-গুলোও কি তাড়াতাড়ি চলে?

যারা আমাকে হাড়ে হাড়ে চিনেছে তারা ওইরকমই বলে বটে।

শিগগিরই সে-মহড়া নেওয়া যাবেখন। এ-অঞ্চলের লজ সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন?

শুনেছি পুরুষ যে, সেই শুধু ব্রাদার হতে পারে এখানে।

মি. ম্যাকমুর্দো, কথাটা আপনার বেলায় খাটে। শিকাগো ছাড়লেন কেন?

আপনাকে বলতে পারব না।

চোখের পাতা পুরো খুলে গেল ম্যাকগিন্টির। এভাবে কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়।

সকৌতুকে বলে, আমাকে বলবেন না কেন?

ব্রাদার হয়ে ব্রাদারকে মিথ্যে বলতে পারব না বলে।

সত্যিটা তাহলে এতই খারাপ যে মুখে আনা যায় না?

সেইরকম দাঁড়াচ্ছে।

মিস্টার, অতীত যে ঢেকে রাখে, তাকে তো লজে ঢুকতে দিতে পারি না। তারপর ভেতরের পকেট থেকে টেনে বার করে একটা খবরের কাগজের কাটিং।

বলে, ফাঁস করে দেবেন না তো?

চড়িয়ে গাল ফাটিয়ে দেব ফের যদি ওইভাবে কথা বলবেন! রুদ্রকণ্ঠে বললে ম্যাকগিন্টি।

কুণ্ঠিতভাবে ম্যাকমুর্দো বললে, মাপ করবেন, কাউন্সিলর। না-ভেবেই বলে ফেলেছি। আমি জানি আপনার আশ্রয়ে আমি কত নিরাপদ। কাটিংটা পড়ুন।

পড়ল ম্যাকগিন্টি। গুলি করে মানুষ খুনের খবর। চুয়াত্তরের নববর্ষের প্রথম সপ্তাহে শিকাগোর মার্কেট স্কোয়ারের লেক সেলুনে জোনাস পিন্টোকে কীভাবে গুলি করে মারা হয়েছে, চাঞ্চল্যকর সেই বিবরণ।

কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে শুধোয় ম্যাকগিন্টি, আপনার কীর্তি?

মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ম্যাকমুর্দো।

কেন গুলি করলেন?

আঙ্কল স্যাস ডলার বানাত, আমি সাহায্য করতাম। ওর মতো অত ভালো না-হলে খরচ কম পড়ত, দেখতেও ভালো। পিন্টো মাল ছাড়তে সাহায্য করেছিল আমাকে

কী করতে?

বাজারে আমার তৈরি ডলার ছড়িয়ে দিতে। তারপরে বললে অন্য দল করবে। করেও ছিল হয়ত। অত খতিয়ে দেখার সময় পাইনি। খুন করে কয়লা উপত্যকায় পালিয়ে এসেছি।

কয়লা উপত্যকায় কেন?

কাগজে পড়েছিলাম ওসব নিয়ে এখানে কেউ খুব একটা মাথা ঘামায় না।

হেসে ওঠে ম্যাকগিন্টি।

প্রথমে টাকা জাল করেছেন, তারপর মানুষ খুন করেছেন। তারপর এদেশে এসেছেন এই ভেবে যে গলায় মালা দিয়ে বরণ করব বলে?

অনেকটা সেইরকমই দাঁড়াচ্ছে বটে, জবাব দিল ম্যাকমুর্দো।

আপনাকে দিয়ে অনেক কিছুই হবে দেখেছি। ডলার এখনও বানাতে পারেন?

পকেট থেকে ছ-টা ডলার বার করে ম্যাকমুর্দো। বলে, ওয়াশিংটন ট্যাকশালের তৈরি নয়।

বলেন কী! গরিলার হাতের মতো প্রকাণ্ড, লোমশ হাতে ডলারগুলো নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরে ম্যাকগিন্টি। তফাত তো কিছু দেখছি না। আপনি তো দেখছি দারুণ কাজের হবেন ব্রাদার। দোস্ত ম্যাকমুর্দো, এক আধটা বদলোকের টক্কর আমরা দু-জনে নিতে পারব। এই বলে দিলাম আপনাকে। আমাদের কোণঠাসা করতে চায় অনেকেই এখন থেকেই হঠাতে আরম্ভ না করি তো আমাদের অবস্থা সঙিন হয়ে উঠতে পারে।

নিশ্চয়, অন্য স্যাঙাতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমিও রাস্তা সাফ করে দিতে পারি।

আপনার ধাত খুব শক্ত! চোখের পাতা একটুও কাঁপেনি পিস্তল দেখে।

আমার প্রাণ তো যেত না।

তবে কার যেত?

আপনার, কাউন্সিলর।

খাটো, পুরু ওভারকোটের পাশ-পকেট থেকে ট্রিগার তোলা পিস্তল টেনে বার করে ম্যাকমুর্দো। নলটা গোড়া থেকেই আপনার দিকেই ফেরানো ছিল। আপনার গুলি চলার সঙ্গে আমারও গুলি।

রেগে লাল হয়ে গেল ম্যাকগিন্টি। পরক্ষণেই ফেটে পড়ল প্রচণ্ড অট্টহাসিতে।

বললে, স্পর্ধা তো কম নয়। অনেক বছর এমনি আতঙ্কর সাথে মোলাকাত ঘটেনি। লজের বুক দশহাত হবে আপনাকে পেয়ে। কী চাই? পাঁচ মিনিটও কি নিরিবিলিতে কথা বলতে দেবে না ভদ্রলোকের সঙ্গে? নাক না-গলালেই কি নয়?

মুখ-টুখ লাল করে ফেলল মদ্য-পরিবেশক।

দুঃখিত, কাউন্সিলর। কিন্তু এই মুহূর্তে মি. টেড বলডুউন দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।

খবর দেওয়ার আর দরকার ছিল না। পরিচালকের কাঁধের ওপর দেখা গেল টেড বলডুইনের দৃঢ়সংবদ্ধ নির্মম মুখখানা। ঠেলে তাকে বাইরে বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল নিজেই।

জ্বলন্ত চোখে ম্যাকমুর্দোকে প্রায় দগ্ধ করে বললে রুক্ষকণ্ঠে, আমার আগেই আসা হয়েছে দেখছি! কাউন্সিলর, এই লোকটা সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা আছে।

বজ্রকণ্ঠে বললে ম্যাকমুর্দো, এখানেই বলা হোক–আমার সামনে।

আমার খুশিমতো, আমার সময়মতো বলব।

পিপে থেকে নামতে নামতে ম্যাকগিন্টি বললে, আরে ছিঃ ছিঃ। এসব চলবে না। বলডুইন, নতুন ব্রাদারের সঙ্গে এমনি ব্যবহার তো আমাদের মানায় না! নাও, হাত মিলিয়ে মিটমাট করে নাও।

ককখনো না! জ্বলে উঠল বলডুইন।

ম্যাকমুর্দো–আমি যদি অন্যায়ই করে থাকি, লড়ে মিটিয়ে নিতে বলেছি। ঘুসির লড়াই লড়তে পারি, ইচ্ছে করলে অন্য যেকোনো ভাবেও লড়ে যেতে পারি। কাউন্সিলর, এবার বডিমাস্টার হয়ে বিচার করুন অন্যায়টা কার।

—ব্যাপারটা কী নিয়ে?

একটি মেয়েকে নিয়ে। তার পছন্দ-অপছন্দর ওপর কারো হাত চলে না।

তাই কি? চিলের মতো চেঁচিয়ে ওঠে বলডুইন।

বস বললে, একই লজের দুই ব্রাদারের মধ্যে এ-ঘটনা ঘটলে বলব নিস্পত্তির ভারটা মেয়েটির ওপরেই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

এই বুঝি আপনার বিচার হল?

হ্যাঁ, এই আমার বিচার, দুই চোখে ক্রূর ইঙ্গিত এনে বলে ম্যাকগিন্টি টেড বলডুইনের কি তাতে আপত্তি আছে?

জীবনে যাকে কখনো দেখেননি, তার জন্যে গত পাঁচবছর যে আপনার পাশে পাশে থেকেছে তাকে ঠেলে ফেলে দিলেন? জ্যাক ম্যাকগিন্টি, আপনি তো জন্মের মধ্যে বডিমাস্টার হতে আসেননি, এরপর যখন ভোটাভুটি হবে—

বাঘের মতো লাফিয়ে গেল কাউন্সিলর। খামচে ধরল টেড বলডুইনের টুটি এবং এক ঝটকায় শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে পিপের ওপর। ম্যাকমুর্দো বাধা না-দিলে উন্মত্ত ক্রোধে বলডুইনকে গলা টিপে মেরেই ফেলত মাকগিন্টি।

ম্যাকমুর্দো তাকে টেনে সরাতে সরাতে বললে চিৎকার করে, করছেন কী কাউন্সিলর। ঠান্ডা হোন।

টুঁটি ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল ম্যাকগিন্টি। টলতে টলতে, কাঁপতে কাঁপতে, খাবি খেতে খেতে কোনোমতে পিপের ওপর উঠে বসল বলডুইন। পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তখনও কাঁপছে থরথরিয়ে। ভয়াবহ আতঙ্ক ফুটে উঠেছে মুখের রেখায় রেখায়–নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে এইরকমই চেহারা হয় মুখের।

বিশাল বুকখানা হাপরের মতো উঠিয়ে নামিয়ে বজ্রনাদে বললে ম্যাকগিন্টি, অনেকদিন ধরেই দেখছি বড্ড বেড়েছ তুমি, টেড বলডুইন, ভোটে আমাকে হারিয়ে বডিমাস্টার হওয়ার সাধ হয়েছে তাই না? লজ বিচার করবে, কে হবে না হবে। কিন্তু আমি যদ্দিন চিফ থাকব, তদ্দিন আমার মুখের ওপর কথা বলতে, আমার বিচার নিয়ে বেঁকা কথা বলতে কাউকে দেব না।

গলায় হাত বুলোতে বুলোতে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে বলডুইন, আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, বস।

মুহূর্তের মধ্যে আবার সেই রুক্ষ কিন্তু সরল আমুদে মেজাজে ফিরে এল ম্যাকগিন্টি। বললে, তাহলে তো মিটেই গেল। আগের মতোই ফের বন্ধু হয়ে গেলাম সবাই।

তাক থেকে এক বোতল শ্যাম্পেন নামিয়ে ছিপি খুলল। তিনটে উঁচু গেলাসে ঢালতে ঢালতে বললে, এসো, সবাই ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়ার মদ্যপান করা যাক। জানোই তো লজের নিয়ম, এরপর আর কারো রক্তে বিষ থাকার কথা নয়। এসো, বাঁ হাত রাখো আমার কণ্ঠায়। টেড বলডুইন, রাগ কেন?

আকাশ বড়ো মেঘলা, জবাব দিলে বলডুইন।

কিন্তু আকাশ তো এবার ঝলমলে হবে–জন্মের মতো।

আমিও শপথ নিলাম সেইমতো।

মদ্যপান করল তিন জনে। একই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেতে হল বলডুইন আর ম্যাকমুর্দোকেও।

দু-হাত ঘষে সোল্লাসে বললে ম্যাকগিন্টি, কালো রক্ত খতম হয়ে গেল এইখানেই। ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, আজ থেকে তুমি লজের নিয়মানুবর্তিতার অধীন হলে। যদি অন্যথা হয়, ব্রাদার বলডুইন জানে, কঠোর হাতে হবে তার শাস্তি।

বিশ্বাস রাখুন আমার ওপর, বলডুইনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে ম্যাকমুর্দো। আমি যেমন হঠাৎ ঝগড়া করি, তেমনি হঠাই মিটিয়ে নেই মনেও রাখি না। লোকে বলে

আমার রগচটা আইরিশ রক্তের জন্যেই এমনি হয়। জানবেন আমার মনে আর রাগ নেই। ভেতর পরিষ্কার হয় গেল।

হাত বাড়িয়ে ধরেছে ম্যাকমুর্দো, ভয়ানক বসের কুচুটে চক্ষুও নিবদ্ধ বলডুইনের ওপর কাজেই হাতে হাত মেলাতে হল তাকে। কিন্তু অন্ধকার মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল, ম্যাকমুর্দোর কথায় সে ভেজেনি।

সশব্দে দু-জনের কাঁধে চাপড় মারল ম্যাকগিন্টি।

ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, যত নষ্টের গোড়া এই মেয়েগুলো। আমারই দুই চ্যালার মাঝে জুটেছে এই মেয়ে। একেই বলে পাথরচাপা কপাল। কিন্তু খুঁড়িটাই মেটাক ঝামেলা–ওসব কাজ বডিমাস্টারের নয়। মেয়ে ছাড়াই এত ঝঞ্জাট, আর নয়। ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, লজ ৩৪১-এ নাম লিখিয়ে নিয়ো। শিকাগোর নিয়মে আমরা চলি না আমাদের কাজকারবার একেবারেই আলাদা। আমাদের অধিবেশন বসে শনিবার রাতে। ভারমিস উপত্যকায়

লজ ৩৪১, ভারমিসা

এতসব চাঞ্চল্যকর ঘটনা যে-রাতে ঘটল, তার পরেই ম্যাকমুর্দো বৃদ্ধ জ্যাকব শ্যাফটারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে এল শহরের একদম শেষে বিধবা ম্যাকনামারার আস্তানায়। এর কিছুদিন পরেই ট্রেনের বন্ধু স্ক্যানল্যান চলে এল ভারমিসায়, উঠল সেই আস্তানাতেই, একসাথেই রইল দু-জনে। আর কোনো বোর্ডার ছিল না সেখানে। গৃহকর্ত্রী নিজেও খুব উদার প্রকৃতির বৃদ্ধা, আইরিশ মহিলারা যেমন হয়, তাই। ওদের ব্যাপারে নাক গলায় না কখনোই। ওরাও তাই চায়। যখন যা খুশি বলার স্বাধীনতা বা কিছু করার স্বাধীনতা ছিল। পুরোপুরি–জীবনে যাদের গুপ্ত রহস্য থাকে–এ-দুটি স্বাধীনতা তাদের একান্তই দরকার। একটা সুবিধে অবশ্য করে দিয়েছে শ্যাফটার। খিদে পেলে যদি তার আস্তানায় যাওয়ার ইচ্ছে হয়, তাহলে আসতে পারে ম্যাকমুর্দো। কাজেই এট্টির সঙ্গে তার মেলামোয় ভাটা পড়েনি। বরং জোয়ার এসেছে। যতই দিন গিয়েছে, ততই দু-জনে দু-জনের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। সম্পর্ক আরও নিবিড়, আরও মধুময় হয়েছে। নতুন আস্তানার শোবার ঘরে নির্বিঘ্নে জাল টাকার ছাঁচ বার করে কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিল ম্যাকমুর্দো। নানা অছিলায় চুপিসারে লজের ব্রাদাররা আসত সেখানে, মেকি মুদ্রার কিছু কিছু নমুনা পকেটে নিয়ে যেত–সুনিপুণ কৌশলে জাল করার ফলে সে-টাকা বাজারে চালাতে তিলমাত্র বেগ পেতে হত না কাউকে। এইরকম মহাগুণের অধিকারী হয়েও, আশ্চর্য এই শিল্পকে আয়ত্ত করা সত্ত্বেও ম্যাকমুর্দো কেন যে দিনভোর বাজে চাকরি নিয়ে মেতে আছে, এ-রহস্য দিবানিশি পীড়িত করেছে সঙ্গীদের। কেউ অবিশ্যি জিজ্ঞেস করলে সে

জবাব দিয়েছে এইভাবে যে, চোখে পড়ার মতো কাজ-টাজ না-নিয়ে থাকলে পুলিশের নেকনজর পড়তে কতক্ষণ।

একজন পুলিশের লোক তো সত্যি সত্যিই পেছনে পড়েছিল। কিন্তু কপাল ভালো তাই ঘটনাটায় ক্ষতির বদলে লাভই বরং হয়েছে ম্যাকমুর্দোর। প্রথম মোলাকাতের পর থেকে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই ম্যাকগিন্টির সেলুনে গিয়ে বয়দের সঙ্গে আলাপ জমাত ম্যাকমুর্দো। উপত্যকার উপদ্রব বিপজ্জনক এই দুবৃত্তদের মজা করে বয় নামেই ডাকার রেওয়াজ ছিল লজের স্যাঙাতদের মধ্যে। বেপরোয়া আচার আচরণ এবং নির্ভয়ে কথা বলার সাহসিকতা তাকে আরও প্রিয় করে তুলেছিল সঙ্গীসাথিদের মধ্যে। প্রতিপক্ষকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অতি দ্রুত ভেঁটে দেওয়ার ওর নিজস্ব পদ্ধতির জন্যেও নীচের মহলে নামডাক ছড়িয়েছে প্রচুর মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা নিয়ে যারা থাকে তাদের কাছে এ-গুণের কদর আছে। এরপর আর একটা ঘটনার পর এদের চোখে আরও উঁচু শ্রদ্ধার আসন পেয়ে গেল ম্যাকমুর্দো।

একদিন রাতের ঘটনা। সেলুনে তিলধারণের জায়গা নেই। হঠাৎ খুলে গেল দরজা। গটমট করে ভেতরে এল মোলায়েম নীলরঙের ইউনিফর্ম পরা একটি লোক মাথায় কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের চূড়া-উঁচু টুপি। সংঘবদ্ধ গুন্ডামির ফলে সাধারণ পুলিশ অসহায় হয়ে পড়ছে। দেখে বিশেষ এই আরক্ষাবাহিনিকে সৃষ্টি করেছে উপদ্রুত অঞ্চলের রেল আর কয়লাখনির মালিকরা। সিভিল পুলিশকে সাহায্য করাই এদের কাজ। জেলাব্যাপী আতঙ্কের অবসান ঘটানো এদের লক্ষ্য। লোকটা ঘরে ঢুকতেই চেঁচামেচি কমে এল, ফিসফাস আরম্ভ হয়ে গেল, কৌতূহলী চক্ষু সেদিকে নিবদ্ধ হল। কিন্তু আতঙ্ক-উপত্যকায় পুলিশের লোক আর বদমাশ গুন্ডার মধ্যে সম্পর্কটা এমন অদ্ভুত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে

ম্যাকগিণ্টি নিজেও বার-কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসা পুলিশ ইনস্পেকটরকে দেখে আশ্চর্য হল না।

কাউন্টারে এসে বললে পুলিশ অফিসার, কনকনে রাত–দেখি একটা সোড়া ছাড়া হুইস্কি। কাউন্সিলর, আগে দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না?

আপনিই নিশ্চয় নতুন ক্যাপ্টেন? শুধোয় ম্যাকগিন্টি।

ধরেছেন ঠিক, কাউন্সিলর। শহরের আইনরক্ষায় আপনার সাহায্য চাই, শীর্ষস্থানীয় নাগরিকদের সহযোগিতাও চাই। আমার নাম ক্যাপ্টেন মার্ভিন–কোল অ্যান্ড আয়রনের ক্যাপ্টেন মার্জিন।

হিমশীতল স্বরে ম্যাকগিন্টি বললে, ক্যাপ্টেন, আপনি না-এলেই বরং ভালোভাবে শান্তিরক্ষা করতে পারতাম। শহরের পুলিশ তো রয়েছেই–আমাদেরই পুলিশ বাইরে থেকে আমদানি করা পুলিশের দরকার দেখি না। আপনি তো এসেছেন ধনিকগোষ্ঠীর ভাড়াটে যন্ত্র হিসেবে গরিব নাগরিকদের হয় পিটিয়ে নয় গুলি করে বাহবা কিনবেন বলে।

সকৌতুকে বললে পুলিশ অফিসার, বেশ, বেশ, তা নিয়ে আর তর্কের মধ্যে যেতে চাই। আমরা তো চাই চোখে যা দেখব, কর্তব্যও করব সেইভাবে। কিন্তু চোখের দেখাটাই যে সবার সমান হয় না। গেলাস খালি করে যাবার জন্যে ফিরেছে অফিসার, এমন সময়ে

চোখ পড়ল জ্যাক ম্যাকমুর্দোর ওপর। ঠিক পাশেই কুটি হেনে দাঁড়িয়ে ছিল সে। আরে! আরে! ম্যাকমুর্দোকে দৃষ্টিশরে যেন বিদ্ধ করে ফেলে অফিসার, এই তো অনেকদিনের চেনা একজন বেরিয়ে গেল।

তফাতে সরে এল ম্যাকমুর্দো।

বললে, জীবনে আপনার বন্ধু ছিলাম না, ছুঁচো টিকটিকিদের সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব কীসের?

কাষ্ঠ হেসে অফিসার বললে, চেনা মানেই যে বন্ধু হবে কে বলছে? তুমি শিকাগোর জ্যাক মাকমুদো অস্বীকার করতে পারো?

কাঁধ ঝাঁকাল ম্যাকমুর্দো।

অস্বীকার করতে যাব কোন দুঃখে? নিজের নাম বলতে লজ্জায় মরে যাব ভেবেছেন নাকি?

কারণ আছে হে, জবর কারণ আছে।

দু-হাত মুঠি পাকিয়ে সিংহগর্জন করল ম্যাকমুর্দো, মানে? কী বলতে চান আপনি?

জ্যাক, ওসব গলাবাজিতে আমি ধসকাই না। কয়লার গাদায় আসার অনেক আগে শিকাগোয় অফিসার ছিলাম অনেকদিন। শিকাগোর বদমাশকে দেখেই চেনবার ক্ষমতা আমার আছে।

মুখ ঝুলে পড়ল ম্যাকমুর্দোর।

আপনিই কি শিকাগো সেন্ট্রালের মার্ভিন!

আজ্ঞে, তোমার সেবায় আবার এসেছি সেই টেডি মার্ভিন! জোনাস পিন্টোকে গুলি করে মারার ঘটনা এখনও আমরা ভুলিনি।

আমি তো গুলি করিনি।

করনি? নিরপেক্ষ সাক্ষীর জবানি হিসেবে মন্দ বলনি অবশ্য। জোনাস পিন্টো মরে তোমার কিন্তু সুবিধেই করে দিয়েছে, নইলে জাল টাকা বাজারে ছাড়ার দায়ে ধরা পড়তে। যাকগে যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না। তা ছাড়া শুধু তোমাকেই একটা ব্যাপার জানিয়ে রাখি–যদিও জানানোটা আমার সরকারি দায়িত্বের মধ্যে পড়ছে না—তোমাকে ফাঁসানোর মতো অকাট্য কেস খাড়া করা যায়নি–কাজেই শিকাগোেয় ফিরে যাওয়ার রাস্তা তোমার ভোলা চাইলে কালকেই যেতে পারো।

এখানেই বেশ আছি।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

আচ্ছা অসভ্য লোক তো তুমি! এমন একটা খবর দিলাম, ধন্যবাদটুকুও দিলে না।

খবরটা আশা করি আমার ভালোর জন্যেই দিয়েছেন–সেক্ষেত্রে ধন্যবাদ রইল, জবাব দেয় ম্যাকমুর্দো কিন্তু খুব একটা সদয় ভঙ্গিমায় নয়।

ক্যাপ্টেন বলে, শোনো হে, মুখে চাবি দিয়ে থাকব যদ্দিন সুবোধ থাকবে। কিন্তু বেচাল দেখলেই বিপদে পড়বে বলে দিলাম! গুডনাইট গুডনাইট, কাউন্সিলর।

বেরিয়ে গেল ক্যাপ্টেন মার্ভিন যাওয়ার আগে কিন্তু সৃষ্টি করে গেল একজন স্থানীয় নায়ককে। সুদূর শিকাগোয় ম্যাকমুদোর কীর্তিকাহিনি নিয়ে ফিসফাস হয়েছে এর আগে। প্রশ্ন করলে স্মিতমুখে এড়িয়ে গিয়েছে ম্যাকমুর্দো নিজেকে খুব বড়ো করে প্রকাশ করার অনিচ্ছেটা নীরবে প্রকাশ করছে। কিন্তু এখন সরকারিভাবে সমর্থিত হল গুজবটা। মদ্যশালার উজ্জ্বলার চারদিক থেকে হেঁকে ধরে আন্তরিকভাবে করমর্দন করে ধন্য ধন্য করতে লাগল শতমুখে। বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে সে আবদ্ধ হইল না সেইদিন থেকে। আকণ্ঠ গিললেও মদ্য পানের তিলমাত্র লক্ষণ কোনোদিন দেখা যেত না তার আচার আচরণে। সেইরাত্রে কিন্তু দোস্ত স্ক্যানল্যান তাকে টানতে টানতে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে উৎসব মুখর রাত পার করে দিত পানাগারেই।

শনিবার রাতে লজের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল ম্যাকমুর্দোর। ও ভেবেছিল শিকাগোর লজে আগে থেকেই অন্তর্ভুক্তির দরুন এখানে আবার নতুন করে

আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে না। কিন্তু ভারমিসার নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান নিয়ে গর্বের অবধি ছিল না ওখানকার সদস্যদের প্রত্যেক প্রার্থীকে যেতে হয় এইসব অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ইউনিয়ন হাউসে একটা বড়ো ঘর সংরক্ষিত আছে এইসব কাজের জন্যে। সদস্যরা জমায়েত হয় সেই ঘরে। ভারমিসায় জড়ো হল প্রায় আট জন সদস্য। কিন্তু এই সংখ্যাই সব নয়। কেননা, উপত্যকায় লজ আছে আরও অনেক, দু-পাশের পাহাড় পেরিয়েও লজের সংখ্যা নেহাত কম নয়। গুরুতর কাজে মাঝে মাঝে বিভিন্ন লজের সদস্য বিনিময় হয় যাতে বাইরের লোক এসে কুকর্মটি করে সরে পড়ে স্থানীয় লোক চিনতে না-পারে। সারা কয়লা জেলায় এইরকম সদস্য ছড়িয়ে আছে কম করেও পাঁচ-শো জন।

আসবাবহীন অধিবেশনকক্ষে প্রকাণ্ড একটা লম্বা টেবিলের চারধারে জমায়েত হল সদস্যরা। পাশে আর একটা টেবিলভরতি কেবল বোতল আর গেলাস। কিছু সদস্য এর মধ্যেই সেদিকে তাকাতে শুরু করেছে।

টেবিলের মাথায় বসেছে ম্যাকগিন্টি। মাথায় কালো চুলের জটার ওপর চেপটা কালো মখমলের টুপি, ঘাড়ের ওপর বেগুনি রঙের শাল পৈশাচিক অনুষ্ঠানে পুরোহিত যেন। ডাইনে বাঁয়ে বসে লজের উচ্চপদস্থ সদস্যরা, টেড বলডুইনের ক্রূর কিন্তু সুশ্রী মুখখানাও দেখা যাচ্ছে তাদের মধ্যে। প্রত্যেকেই পদমর্যাদার প্রতীক স্বরূপ একটা-না-একটা শাল বা মেডেল গায়ে চড়িয়েছে। এদের অধিকাংশই বয়স্ক পুরুষ কিন্তু বাদবাকি সবার বয়স আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে–অগ্রজের হুকুম তামিল করার জন্যে এক পায়ে খাড়া দুর্দান্ত এজেন্টের দল। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে অনেকের আকৃতি দেখেই কেবল বোঝা

যায় ভেতরটা তাদের বাঘের মতো হিংস্র, আইনকানুনের ধার ধারে না। কিন্তু সাগ্রহমুখে বসে থাকা পরমোৎসাহী এই তরুণদের দেখে বিশ্বাস করাই কঠিন হবে যে আসলে তারা বিপজ্জনক মানুষ খুনির দল, নীতি আর বিবেকের সম্পূর্ণ বিকৃতির ফলে চরিত্র দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ার দরুন খুনজখমের মধ্যে ভয়ংকর আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং যে-ব্যক্তি তথাকথিত পরিষ্কার কাজ-এর জন্য বিখ্যাত, তাকে সুগভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে। প্রকৃতি এদের বিকৃত বলেই যে-লোক কোনোদিন তাদের ক্ষতি করেনি, যাকে তারা, বহু ক্ষেত্রে জীবনে দেখেওনি, তাকেও খতম করে দেওয়ার অভিলাষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে যায়। মরণ-মারটা আসলে কে মেরেছে, খুন হয়ে যাওয়ার পর এই নিয়ে ঝগড়া করে নিজেদের মধ্যে। নিহত ব্যক্তির মরণ চিকার এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীভৎস বিকৃতি আর ছটফটানি নিয়ে সোল্লাসে আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে। চিৎকার করে শোনায় সবাইকে। প্রথম প্রথম কাজকর্ম চালাত গোপনে, তারপর–এ-কাহিনি যখনকার সেই সময়ে খুনটুন ঘটতে লাগল আশ্চর্যভাবে খোলাখুলি; কারণ আর কিছুই নয়, একদিকে যেমন শান্তিরক্ষক পুলিশ বারংবার ব্যর্থ হয়েছে আইন রক্ষা করতে, আর একদিকে তেমনি প্রাণের ভয়ে কোনো সাক্ষী হাজির হয়নি সাক্ষ্য দিতে কিন্তু নিজেদের অসংখ্য সাক্ষী তৈরি থেকেছে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে আসার জন্যে এবং দেশের সেরা আইনজীবীকে দিয়ে কেস লড়াবার জন্য সিন্দুকভরতি টাকারও কখনো অভাব হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর চলছে এই অত্যাচার, কিন্তু একজনকেও দণ্ড দেওয়া যায়নি। একটা বিপদকেই কেবল ভয় পেত স্কোরারসরা–স্বয়ং শিকার যে, তাকে অতর্কিতে এবং বহুজনে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাবু করে ফেললেও মরিয়া হয়ে হানাদারদের সে প্রায়ই অক্ষত রেখে যেত না।

ম্যাকমুর্দোকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল, অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তাকেও–কিন্তু পরীক্ষাটা কী ধরনের হবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবগম্ভীর দু-জন ব্রাদার ওকে নিয়ে গেল বাইরের একটা ঘরে। কাঠের তক্তার পার্টিশনের মধ্যে দিয়ে কানে ভেসে এল অধিবেশনকক্ষে জমায়েত বহু কণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি। দু-একবার নিজের নামও শুনতে পেল, বুঝল আলোচনা হচ্ছে নতুন প্রার্থীকে নিয়ে। তারপরে ঢুকল একজন রক্ষী; বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে সবুজ আর সোনালি ফিতে।

বললে, বডিমাস্টার হুকুম দিয়েছেন এঁদের দড়ি বেঁধে, চোখ বেঁধে মাথা ঢেকে ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। তিনজনে মিলে তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলল ম্যাকমুর্দোর কোট, গুটিয়ে দিল জামার আস্তিন, সবশেষে একটা দড়ি কনুয়ের ওপর দিয়ে গলিয়ে বাঁধল এঁটে। তারপর একটা পুরু কালো কাপড়ের টুপি পরিয়ে ঢেকে দিল মুখের ওপর অংশে ফলে কিছুই আর দেখতে পেল না দু-চোখে। এরপর ওকে হাত ধরে নিয়ে যাওয়া হল অধিবেশন কক্ষে।

থলির মতো টুপি থাকায় চোখে বিলকুল অন্ধকার দেখছে ম্যাকমুর্দো, অস্বস্তিও খুব। আশেপাশে বহুলোকের নড়াচড়া, ফিসফাস কথা বলার আওয়াজ এবং পরক্ষণেই দূর থেকে স্বয়ং ম্যাকগিন্টির চাপা স্বর ভেসে এল কানে কাপড়ের আবরণ ভেদ করে।

কণ্ঠস্বর বলল, জন ম্যাকমুর্দো, তুমি এনসেন্ট অর্ডার অফ ফ্রিম্যানের সদস্য?

মাথা নেড়ে সায় দেয় ম্যাকমুদো।

শিকাগোর ২৯ নম্বর লজের মেম্বার?

আবার মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ম্যাকমুর্দো।

অন্ধকার রাত অস্বস্তিকর, বললে কণ্ঠস্বর।

পথ যে চেনে না তার কাছে জবাব দিলে ম্যাকমুর্দো।

আকাশ বড়ো মেঘলা।

হ্যাঁ। ঝড় আসছে।

ব্রাদাররা সন্তুষ্ট? শুধোয় বডিমাস্টার।

সম্মিলিত কণ্ঠে সম্মতি শোনা যায়।

ম্যাকগিন্টি বললে, ব্রাদার, তোমার চিহ্ন আর পালটা চিহ্ন দেখেই বুঝেছি আমাদেরই একজন তুমি। শোনো, এ-জেলায় আর এ-অঞ্চলের অন্যান্য জেলাতেও ভালো লোক বেছে নেওয়ার জন্যে কিছু কর্তব্য আমাদের করতে হয়। কতকগুলো পরীক্ষা আমাদের নিজস্ব পরীক্ষা দিতে তৈরি তো তুমি?

নিশ্চয়।

তোমার কলজে শক্ত তো?

নিশ্চয়।

সামনে এক কদম এগিয়ে তার প্রমাণ দাও?

কথাটা বলার সঙ্গেসঙ্গে, ম্যাকমুর্দো অনুভব করল দুটো সূচীতীক্ষ্ণ বস্তু চেপে বসেছে দুই অক্ষিগোলকের ওপর। এক পা এগোলেই চোখ দুটো হারানোর সম্ভাবনা। পরোয়া করল না ম্যাকমুর্দো। সাহসে বুক বেঁধে পা বাড়াল সামনে–অমনি তীক্ষ্ণগ্র ফলাদুটোর চাপ মিলিয়ে গেল চোখের ওপর থেকে। শোনা গেল প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন।

কলজের জোর সত্যিই আছে, বললে একটা কণ্ঠ। যন্ত্রণা সইতে পারো?

সবাই যা পারে, আমি তাই পারি। জবাব দিলে ম্যাকমুর্দো।

দেখি পার কিনা!

কী কষ্টে যে আর্ত চিৎকারটাকে চেপে রাখতে হয়েছিল ম্যাকমুর্দোকে, তা শুধু সে-ই জানে। আচম্বিতে একটা স্নায়ু অসাড় করা অন্তরাত্মা-শিউরোনো অকথ্য যন্ত্রণা বাহু ভেদ করে যেন প্রবেশ করল শিরা উপশিরায়। যন্ত্রণাটা অকস্মাৎ তাই জ্ঞান হারাতে হারাতেও অসীম মনোবলে সামনে নিল নিজেকে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে, দুই হাত মুঠি পাকিয়ে অবর্ণনীয় সেই যন্ত্রণাকে গোপন করল অসামান্য ক্ষমতা বলে।

শুধু বললে, এ আর এমন কী! এর চাইতেও বেশি যন্ত্রণা আমি সইতে পারি।

এবার আর মৃদু প্রশংসা নয়, জোরালো করতালিতে ঘর যেন চৌচির হয়ে ফেটে উড়ে গেল। এ-লজে আজ পর্যন্ত কারো প্রথম আবির্ভাব এর চাইতে চমকপ্রদ হয়নি। পিঠ চাপড়ে স্বাগত জানানো হল ম্যাকমুর্দোকে, একটানে মাথা থেকে খুলে নেওয়া হল কালো আচ্ছাদন। স্মিতমুখে অভিনন্দন মুখর ব্রাদারদের মাঝে দাঁড়িয়ে রইল দুর্দান্ত ম্যাকমুর্দো–ঘন ঘন চোখের পাতা পড়তে লাগল কেবল হঠাৎ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, সবশেষে আর একটা কথা, বললে ম্যাকগিন্টি। আনুগত্য আর গোপনতার শপথ তুমি এর আগেই নিয়েছ। জানো নিশ্চয় এ-শপথ ভাঙলে শাস্তি একটাই–মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত মৃত্যু?

হ্যাঁ, জানি বললে ম্যাকমুর্দো।

যেকোনো পরিস্থিতিতে বডিমাস্টারের শাসন মাথা পেতে নেবে?

নেব।

তাহলে ভারমিসার ৩৪১ নম্বর লজে তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছি। এখন থেকে এ-লজের সমস্ত সুবিধেতে তোমার অধিকার রইল। ব্রাদার স্ক্যানল্যান, টেবিলে মদ রাখো, সুযোগ্য ব্রাদারের স্বাস্থ্যপান করা যাক।

ম্যাকমুর্দোর কোট আনা হয়েছে, কিন্তু পরবার আগে হাতের অবস্থাটা একবার দেখে নিলেও এখনও চিড়বিড়িয়ে জ্বলছে জায়গাটা। বাহুর মাংসের ওপর রক্তরঙের সুগভীর একটা চিহ্ন–সুস্পষ্ট একটা বৃত্ত মাঝে একটা ত্রিভুজ জ্বলন্ত লোহা দিয়ে ছ্যাকার চিহ্ন। পাশের দু-এক জন ব্রাদার কোটের হাতা গুটিয়ে বাহুর ওপর দাগাননা একই চিহ্ন দেখাল ম্যাকমুর্দোকে–লজের প্রতীকচিহ্ন।

বললে, প্রত্যেকেই সয়েছে এই যন্ত্রণা কিন্তু তোমার মতো বুকের পাটা কারোর দেখিনি।

আরে ছ্যাঃ! ও আর এমন কী, মুখে বলল ম্যাকমুর্দো, কিন্তু নিঃসীম যন্ত্রণায় জ্বলতে লাগল বাহু।

এই অনুষ্ঠানের পর এল মদ। মদ নিঃশেষিত হওয়ার পর ফের আরম্ভ হল লজের কার্যপরম্পরা। শিকাগোর লজের গদ্যময় মিটিং শুনে অভ্যস্ত ম্যাকমুর্দো অবাক বিস্ময়ে কান খাড়া করে শুনে গেল পরবর্তী অনুষ্ঠান।

ম্যাকগিন্টি বললে, আজকের আলোচনাসূচির প্রথমেই রয়েছে একটা চিঠি লিখেছে মার্টন কাউন্টির ২৪৯ নম্বর লজের ডিভিশন মাস্টার উইন্ডল। চিঠিটা এইঃ–

সবিনয় নিবেদন,

রে-অ্যান্ড স্টারমাশ নামে একটা কয়লাখনি আছে এদিকে। মালিকের নাম অ্যানড্র রে। এর লাশ ফেলতে হবে। গত ঋতুতে পেট্রলম্যানের সেই ব্যাপারটায় আমাদের দু-জন ব্রাদার গিয়ে কাজ সেরে এসেছিল মনে আছে নিশ্চয় তার প্রতিদানে আপনার দু-জন ব্রাদারের সহযোগিতা আমাদের প্রাপ্য হয়েছে। দু-জন কাজের লোক পাঠাবেন। লজের কোষাধ্যক্ষ হিগিন্সের ঠিকানা আপনি জানেন। হিগিন্স হবে এদের অধিনায়ক। সে-ই বলে দেবে কোথায় গিয়ে কীভাবে কাজ সারতে হবে।

ভবদীয়

জে ডব্লিউ উইল, D. M. A. 0. F.

কাজের লোকের দরকার হলে উইন্ডল কখনো বিমুখ করেনি আমাদের। আমরাও করব , একটু থামল ম্যাকগিন্টি, নিষ্প্রভ কিন্তু নারকীয় দুই চোখের দৃষ্টি ঘরময়। কে ভলান্টিয়ার হবে?

বেশ কয়েকজন তরুণ হাত তুলল। দেখে অনুমোদনসূচক হাসি হাসল বডিমাস্টার।

টাইগার করম্যাক, তুমি হলেই চলবে। গতবারের মতো এবারেও যদি পাকা হাতের খেল দেখাও, তাহলেই জানবে ভুলচুক হবে না। উইলসন, তুমিও যাবে।

শেষোক্ত ছোকরা নেহাতই ছেলেমানুষ, বয়স উনিশও পেরোয়নি। বললে, আমার তো পিস্তল নেই।

এই তোমার প্রথম কাজ, না? সত্যিই তোমার একবার রক্তস্নান দরকার। এই কাজ দিয়েই শুরু করো। পিস্তল নিয়ে ভেবো না–ঠিক সময়ে পেয়ে যাবে। সোমবার চলে যেয়ো ওখানে। তারপরেও সময় থাকবে হাতে। ফিরে এলে বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হবে।

পুরস্কার-টুরস্কার মিলবে এবার? জিজ্ঞেস করে করম্যাক। গাঁট্টাগোট্টা, পাশবিক চেহারার কালচে মুখ এই তরুণের টাইগার নামকরণ হয়েছে অমানুষিক হিংস্রতার জন্যে।

পুরস্কার নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। কাজের খাতিরে কাজ করে যাও। কাজ শেষ হলে পর

হয়তো দেখবে বাক্সের তলায় কিছু ডলার জমা পড়েছে।

লোকটার অপরাধ? শুধোয় উইলসন।

কার কী অপরাধ তা জিজ্ঞেস করার দরকার তো তোমার নেই। বিচার হয়েছে সেখানে সাজার ব্যবস্থা করেছে ওখানকার লজ। আমাদের কাজ ওদের জল্লাদগিরি করা–যেমনটা ওরা আমাদের হয়ে করে দিয়ে যায়। মার্টন লজ থেকে সামনের সপ্তাহেই তো দু-জন আসছে এদিকে কিছু কাজ সারতে।

তারা কারা? কে যেন জিজ্ঞেস করে।

সেটা না-জিজ্ঞেস করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। তুমি যদি কিছু না-জানো, বলতেও কিছু পারবে না, বিপদেও পড়বে না। তবে যারা আসছে তারা ওস্তাদ লোক, কাজ করে পরিষ্কার।

সময়ও হয়েছে ওদের আসবার! চেঁচিয়ে ওঠে টেড বলডুইন। এ-তল্লাটের অনেকেই আজকাল নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই তো গত সপ্তাহে আমাদের তিনজন লোককে গলা ধাক্কা দিয়েছে ফোরমেন ব্রেকার। অনেকদিন ধরেই বড্ড বেড়েছে লোকটা এবার ওকে ফুল ডোজ দেব।

কীসের ফুল ডোজ? ফিসফিস করে পাশের লোককে শুধোয় ম্যাকমুর্দো।

বাকশট কার্তুজের। অট্টহেসে বলে লোকটি, আমাদের কাজকারবার তো ওইরকমই ব্রাদার।

ম্যাকমুর্দোর অপরাধপ্রবণ অন্তর-প্রকৃতি আকৃষ্ট হয়েছিল নীচ সমিতির নারকীয় কার্যকলাপের দিকে। এখন থেকে এই সংঘেরই সদস্য সে।

বললে, এই সবই তো ভালো লাগে আমার। সাহস যার আছে, এ-জায়গা তার উপর্যুক্ত।

আশেপাশে যারা বসেছিল, কথাটা শুনে তারা হাততালি দিয়ে উঠল।

টেবিলের প্রান্ত থেকে কালো কেশর ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে বডিমাস্টার–কী হল?

নতুন ব্রাদার বলছে, আমাদের ব্যাপার-স্যাপার তার মনের মতো।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায় ম্যাকমুর্দো।

বলে, শ্রদ্ধেয় হুজুর, লজকে সাহায্য করার সুযোগ পেলে বর্তে যাব–লোকের দরকার হলে আমাকে নিন।

দারুণ হাততালি আরম্ভ হয়ে গেল এই কথায়। বেশ বোঝা গেল, দিগন্তপারে উঁকি দিচ্ছে নতুন এক সূর্য। এইভাবে এগিয়ে আসাটা যেন একটু বেশি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হল কয়েকজন বয়স্কর কাছে।

চেয়ারম্যানের কাছেই বসে ছিল সেক্রেটারি হ্যার্যাওয়ে। মুখখানা শকুনের মতো। দাড়ির রং ধূসর। বললে, আমি বলব; লজ যতক্ষণ না কাজ দিচ্ছে, ততক্ষণ যেন ব্রাদার ম্যাকমুর্দো অপেক্ষা করে।

আমিও তাই বলতে চাই। যখনই বলবেন, বেরিয়ে পড়ব। বললে ম্যাকমুর্দো।

তোমার পালা যথাসময়ে আসবে, ব্রাদার, বললে চেয়ারম্যান। কাজে তোমার ইচ্ছে আছে এটা যখন লক্ষ করেছি, তখন কাজ দিলে নিশ্চয় তা শেষ করতেও পারবে নিখুঁতভাবে। আজ রাতেই এই একটা ছোটো কাজ আছে, ইচ্ছে করলে যেতে পারো।

কাজের মতো কাজের জন্যে অপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত।

তাহলেও আজ রাতে তুমি আসতে পারো। এলে বুঝবে আমাদের এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্যটা কী। ব্যাপারটা পরে খুলে বলছি। ইতিমধ্যে–বলে আলোচনাসূচিতে চোখ বুলিয়ে নেয় ম্যাকগিন্টি–মিটিংয়ে আরও দু-একটা বিষয় তুলতে চাই। প্রথমে বলব, ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে আমাদের, কোষাধ্যক্ষ যেন বলেন। জিম কারনাওয়েজের বিধবাকে পেনশন দিতে হবে। লজের কাজ করতে গিয়েই মরেছে সে কাজেই আমাদের দেখা দরকার বিধবা যেন পথে না-বসে।

মালি ক্রিকের চেস্টার উইলকক্সকে খুন করতে গিয়ে গত মাসে গুলি খেয়ে মরেছে জিম, পাশের লোকটি জানায় ম্যাকমুর্দোকে।

ব্যাঙ্কের খাতা সামনে রেখে বললে কোষাধ্যক্ষ, টাকাপয়সা এখন ভালোই আছে। ইদানীং ভালোই চাদা দিচ্ছে কোম্পানিগুলো। ম্যাক্সলিন্ডার অ্যান্ড কোম্পানি একাই দিয়েছে পাঁচ-শো। ওয়াকার ব্রাদার্স এক-শো পাঠিয়েছিল কিন্তু আমি তা ফেরত পাঠিয়েছি–পাঁচ-শো চেয়েছি। ঝুঁকিটা আমার! বুধবারের মধ্যে জবাব না-পেলে ওয়াইডিং গিয়ার বিকল হয়ে যাবে। গত বছর ব্রেকার পুড়িয়ে দিয়েছিলাম বলেই সুমতি হয়েছিল। ওয়েস্ট সেকশন কোলিং কোম্পানি বার্ষিক চাঁদা পাঠিয়ে দিয়েছে। যেকোনো দায়দায়িত্ব মিটিয়ে দেওয়ার মতো টাকা আমাদের হাতে আছে।

আর্চি সুইনড়নের খবর কী? শুধোয় একজন ব্রাদার।

কারবার বেচে দিয়ে তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। যাওয়ার আগে আমাদের একটা চিঠি লিখে গেছে বুড়ো শয়তান! লিখেছে, ব্ল্যাকমেলারদের রাজত্বে বিরাট খনির মালিক হওয়ার চাইতে নিউইয়র্কের রাস্তার ঝাড়ুদার হওয়া অনেক ভালো। কপাল খারাপ আমাদের। চিঠিটা পেলাম ওর তল্লাট ছেড়ে পালানোর পর! উপত্যকায় আর কখনো মুখ দেখানোর সাহস হবে বলে তো মনে হয় না আমার।

চেয়ারম্যান টেবিলের যে-প্রান্তে বসে, ঠিক তার উলটো দিকের প্রান্তে উঠে দাঁড়াল একজন প্রবীণ ব্যক্তি। পরিষ্কার কামানো গাল, মুখটি মায়াদয়ায় কোমল, ভুরুর গড়ন ভালো।

বললে, কোষাধ্যক্ষ মশাই দয়া করে বলবেন কি তল্লাট ছেড়ে এই যে লোকটা পালিয়ে গেল, এর সম্পত্তি কিনেছে কে?

নিশ্চয় বলব, ব্রাদার মরিস। কিনেছে স্টেট অ্যান্ড মার্টন কাউন্ট রেলরেড কোম্পানি।

গত বছর এইভাবেই জেলা ছেড়ে পালানোর আগে খনি বেচে দিয়ে গেছে টডম্যান আর লি। কে কিনেছে এদের সম্পত্তি?

ওই একই কোম্পানি, ব্রাদার মরিস।

ইদানীং আরও কয়েকটা লোহার কারখানা বিক্রি হয়ে গেছে। বলতে পারেন, ম্যানসনের শুমানের, ভ্যান ডেহেরের আর আটউডের লোহার কারখানাগুলো কিনেছে কে?

সবক-টাই কিনেছে ওয়েস্ট গিলমারটন জেনারেল মাইনিং কোম্পানি। চেয়ারম্যান বললে, ব্রাদার মরিস, খনি আর কারখানা যখন মাথায় করে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন কে কিনল জেনে আমাদের দরকারটা কী?

শ্রদ্ধেয় হুজুর, দরকার অনেক। আপনাকে অসম্মান করতে চাই না, কিন্তু জানবেন এই ধরনের কেনাবেচার ব্যাপারটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ দশ বছর ধরে চলছে এই রকম কেনাবেচা। আস্তে আস্তে সবকটা ছোট্ট ব্যাবসাদারকে কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য করছি আমরা। পরিণামটা কী জানেন? এদের জায়গায় দেখছি রেলরোড বা

জেনারেল আয়রনের মতো বিরাট বিরাট কোম্পানি যাদের ডিরেক্টররা বহাল তবিয়তে বসে আছে নিউইয়র্ক অথবা ফিলাডেলফিয়ায়–তোয়াক্কাও করে না আমাদের আমাদের ভয়ে কম্পিত নয় তাদের হৃদয়। এদের স্থানীয় কর্তাদের আমরা শায়েস্তা করতে পারি, কিন্তু তাদের জায়গায় আসবে নতুন লোক। আমাদের অবস্থা কিন্তু একটু একটু করে সঙিন হয়ে উঠছে। ছোটো ব্যাবসাদাররা আমাদের গায়ে আঁচড় কাটতেও পারবে না। সে-টাকা বা শক্তি কোনোটাই তাদের নেই। খুব বেশি নিংড়ে না-নেওয়া পর্যন্ত ওরা এখানেই থেকে যেত আমাদের দাপটে মাথা হেঁট করে থাকবে। কিন্তু এই বিরাট কোম্পানিগুলো যদি দেখে লাভের টাকায় আমরা বখরা বসাতে যাচ্ছি, খোলামকুচির মতো টাকা উড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে আমাদের একে একে পাকড়াও করবে, আর কোর্টে টেনে নিয়ে যাবে।

কথাগুলো বুক কাঁপানো। মুখ শুকিয়ে গেল ঘরসুদ্ধ লোকের। ভয়ার্ত দৃষ্টিবিনিময় ঘটল সদস্যদের মধ্যে এবং শোনা গেল গুঞ্জন। পাপ করলে যে ফল পেতে হয়, এই সহজ ব্যাপারটিই মন থেকে উবে গিয়েছিল এদের একটার পর একটা খুনখারাপি করেছে, কেউ বাধা না-দেওয়ায় সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে ভেবে নিয়েছিল নিজেদের। তা সত্ত্বেও ব্রাদার মরিসের কথাগুলো বরফের ছুরির মতো গেঁথে গেল দুরতম দুঃসাহসীরও অন্তরের কন্দরে।

বক্তা আরও বললে, আমার উপদেশ যদি নেন বলব, ছোটোখাটো ব্যাবসাদারদের ওপর আমরা যেন একটু কম চাপ দিই। যেদিন এদের প্রত্যেকেই পালাবে, সেদিন তো এ-সমিতির শক্তিও ভেঙে পড়বে।

অপ্রিয় সত্য কারো ভালো লাগে না। বক্তা বসতে-না-বসতেই ক্রুদ্ধ চিৎকার শোনা গেল চারদিকে। ভ্রুকুটি-কুটিল চোখে উঠে দাঁড়ায় ম্যাকগিন্টি।

বলে, ব্রাদার মরিস, কেঁউ কেঁউ করা তোমার স্বভাব। ছায়া দেখে চমকে ওঠা তোমার চরিত্র। লজের সব সদস্য এক থাকলে যুক্তরাষ্ট্রে হেন ক্ষমতা নেই যা আমাদের ছুঁতে পারে। আদালতে বার বার কি তা যাচাই হয়ে যায়নি? ছোটো কোম্পানিরা যেমন দেখেছে লড়ে যাওয়ার চাইতে টাকা দিয়ে রফা করে নেওয়া মঙ্গল, বড়ো কোম্পানিরাও ঠিক তাই করবে বলে আমি মনে করি। বলতে বলতে মাথা থেকে কালো টুপি আর কাঁধ থেকে শাল খসিয়ে এনে বললে ম্যাকগিন্টি, মিটিং প্রায় শেষ, একটা কাজ শুধু বাকি যাওয়ার আগে তা বলব। এখন হোক ভাইয়ে ভাইয়ে বন্ধন নিবিড় করার উদ্দেশ্যে খানাপিনা।

মানুষের প্রকৃতি সত্যিই বড়ো অদ্ভুত। খুন জিনিসটা এদের প্রত্যেকের কাছে একটা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার। পরিবারের জনককে এরা খুন করেছে অসহায় বউ ছেলে মেয়ে কেঁদে ভাসিয়েছে কিন্তু এদের প্রাণ কাঁদেনি যাকে মেরেছে তার ওপর তিলমাত্র আক্রোশ নেই, তবুও তাকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিতে এদের চোখের পাতা কাঁপেনি এই এরাই কিন্তু সুরেলা, বিষণ্ণ, মধুর গানবাজনায় চোখের জল ধরে রাখতে পারে না। ম্যাকমুর্দোর গানের গলা বড়ো চড়া কিন্তু সুরেলা। এতক্ষণের সাহসিকতা দিয়েও যাদের মন জয় করতে পারেনি, এবার কিন্তু তারাও তার পর পর দুটো গান শুনে রোমাঞ্চিত না হয়ে পারল না। প্রথম রাতের প্রথম আবির্ভাবেই নতুন ব্রাদারটি এইভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং উচ্চতর পদের পথ আপনা থেকেই প্রশস্ত হয়ে এল। ভাইয়ে ভাইয়ে সম্প্রীতি বজায় রাখার গুণপনা ছাড়াও চৌকস ফ্রি-ম্যান হতে গেলে আরও অনেক গুণের দরকার।

সান্ধ্য-অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার আগেই পাওয়া গেল তার প্রমাণ। বোতল বোতল হুইস্কি ঘুরে এল হাতে হাতে, রক্ত গরম হয়ে উঠল প্রতিটি সদস্যের, নতুন কুকর্মের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল প্রতিটি রক্তকণিকা–এখন সময়ে ফের উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করল বডিমাস্টার।

বলল, শোনো বয়রা, এ-শহরে একটা লোক বড় বাড় বেড়েছে, তাকে একটু ভেঁটে দেওয়া দরকার। ভার দিলাম তোমাদের ওপর। হেরাল্ড পত্রিকার জেমস্ স্ট্যানজারের কথা বলছি। দেখেছ নিশ্চয় ইদানীং আবার আমাদের পিণ্ডি চটকাতে শুরু করেছে?

সমবেত গুঞ্জনধ্বনির মধ্যে প্রকাশ পেল সবার সম্মতি। কয়েকজনের অস্ফুট গালাগালও শোনা গেল। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে টুকরো কাগজ বার করল ম্যাকগিন্টি।

হেডিংটা শোনো–আইনশৃঙ্খলা! কয়লা এবং লৌহ জেলায় বিভীষিকার রাজত্ব। আমাদের মধ্যেই যে একটা অপরাধীদের সংগঠন রয়েছে, এক যুগ আগে কয়েকটা গুপ্ত হত্যাতেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তারপর এই বারোটি বছরে ক্রিয়াকলাপ তো কমেইনি, বরং এত বেড়েছে যে সভ্য সমাজের একটা কলঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছি আমরা। অপশের আর সীমা নেই। এইজন্যেই কি ইউরোপের স্বৈরতন্ত্রের জ্বালায় পলাতকদের বুকে ঠাঁই দেয় এই বিরাট দেশ? আশ্রয় দেওয়ার অপরাধেই কি আশ্রয়দাতাদের ওপর আশ্রিতরা অত্যাচারের লাঠি ঘুরিয়ে যাবে? প্রাচ্যের রাজতন্ত্রে যেসব অরাজকতা আর নিপীড়নের কাহিনি পড়লে শিউরে উঠি, সেইসব ঘটনাই কি অনুষ্ঠিত হয়ে চলবে তারকালাঞ্ছিত পতাকাশোভিত এই মহাদেশে? আতঙ্ক আর নৈরাজ্য বিরাজ করবে স্বাধীনতার প্রতীক মহান এই পতাকার

ছায়াতলে? এরা কারা আমরা জানি। সংঘঠনটা বিধিবদ্ধ এবং গুপ্তসমিতির নয়। কিন্তু আর কতদিন সইতে হবে? আমরা কি আর স্বাধীনভাবে যত্তো সব রাবিশ উচ্ছ্বাস। অনেকটা পড়ে ফেলেছি, আর নয়। কাগজটা টেবিলে ছুঁড়ে ফেলে দেয় চেয়ারম্যান। শুনলে তো কী লিখেছে আমাদের সম্বন্ধে? এখন তোমরাই বলো কী করা উচিত এ-লোককে নিয়ে।

খুন! রক্তজমানো কণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে এক ডজন গলা।

আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি, বললে ব্রাদার মরিস সেই ভদ্রলোক, ভুরু যার সুন্দর, গাল পরিষ্কার কামাননা। ভাইগণ, ফের বলছি, এ-উপত্যকায় আমরা এত চাপ সৃষ্টি করছি যে শেষ পর্যন্ত সবাই এককাট্টা হয়ে আমাদের পিষে মেরে ফেলবে। জেম্‌স স্ট্যানজার বৃদ্ধ মানুষ। শহরে আর জেলায় সবার শ্রদ্ধার পাত্র। এ-উপত্যকায় যেকোনো জনহিতকর ব্যাপারে তাঁর পত্রিকার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এ-লোককে খুন করলেই হইচই পড়ে যাবে সারাদেশে শেষপর্যন্ত ধ্বংস হতে হবে আমাদের।

ধ্বংস করা হবে কী করে, মি. ল্যাজগুটোনো? চিৎকার করে ওঠে ম্যাকগিন্টি। কে করবে? পুলিশ? ওদের অর্ধেক আমাদের টাকা খায়, বাকি অর্ধেক আমাদের ভয়ে মরে। নাকি আইন আদালত আর জজ-জুরি? সে-পরীক্ষাও কি হয়ে যায়নি, ফলাফলটা নিশ্চয় জানা আছে?

ব্রাদার মরিস বললে, বিচারপতি লিঞ্চ কেস হাতে নিতে পারেন।

প্রত্যুত্তরে শোনা গেল সম্মিলিত কণ্ঠে রাগত চিৎকার।

গলাবাজি করে বললে ম্যাকগিন্টি, একটা আঙুল তুললেই জেনো দু-শো লোক এখনই এ-শহরের এক মাথা থেকে আর এক মাথা পর্যন্ত সাফ করে ছাড়বে। পরক্ষণেই গলার স্বর উঠে গেল আরও চড়া পর্দায় বিশাল কালো ভুরু জোড়ায় লাগল ভয়ংকর ভ্রুকুটি : ব্রাদার মরিস, বেশ কিছুদিন ধরেই তোমার ওপর আমার নজর আছে জানো। তোমার নিজের কলজেতে জোর নেই–যার আছে তার জোরটুকুও কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করো যখন-তখন। আলোচনাসূচিতে যেদিন তোমার নাম উঠবে সেদিন তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে জানবে নামটা তুলব কিন্তু আমিই।

মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল মরিস ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে, নিশ্চয় হাঁটু পর্যন্ত কমজোরি হয়ে গিয়েছিল বলে। কঁপা হাতে সুরাপাত্র তুলে নিয়ে এক চুমুকে নিঃশেষ না-করা পর্যন্ত কথা ফুটল না মুখে।

বলল–শ্রদ্ধেয় হুজুর, আমার মুখে যেটুকু বলা দরকার তার বেশি যদি কিছু বলে থাকি তো ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে, ক্ষমা চাইছি এই লজের প্রত্যেক সদস্যের কাছে। আমার আনুগত্য কতখানি তা আপনি জানেন–পাছে লজের ক্ষতি হয়ে যায় এই ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় অনেক সময়ে অনেক কথা বলে ফেলি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার নিজের বিচার বুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি ভরসা রাখি আপনার বিচারবুদ্ধির ওপর। শ্রদ্ধেয় হুজুর, কথা দিচ্ছি। আর আপনার বিরাগভাজন হব না।

বিনয়ন কথাগুলো শুনতে শুনতে সরল হয়ে এল বডিমাস্টারের ভ্রূকুঞ্চন।

বললে, ঠিক আছে ব্রাদার মরিস, ঠিক আছে। তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার দরকার যেদিন হবে, সেদিন জানবে সবচেয়ে দুঃখ পাব আমি নিজে। কিন্তু আমি যদ্দিন চেয়ারে আছি, কথায় কাজে আমরা সবাই এক থাকব এই লজে। বলে আশপাশে দৃষ্টি সঞ্চালন করে নিয়ে এবার বলি আমার কথা। স্ট্যানজারকে ফুলডোজ দিলে এমন গোলমাল আরম্ভ হয়ে যাবে যা আমরা চাই না। সাংবাদিকরা সব এককাট্টা। সবক-টা পত্রিকা পুলিশ আর মেলেটারি চেচিঁয়ে গলা ফাটিয়ে ফেলবে। কিন্তু লোকটাকে বেশ একটু কড়কে দিতে পার–তাতেই সাবধান হয়ে যাবে। ব্রাদার বলডুইন, তুমি ভার নেবে?

নিশ্চয়! সাগ্রহে বললে তরুণ বলডুইন।

ক-জনকে নেবে সঙ্গে?

জনাছয়েক। দরজা আগলাতে আরও দু-জন। গোওয়ার, তুমি আসবে। ম্যানসেল, তুমিও চলো। স্ক্যানল্যান, তুমি থাকবে। উইলেবাই-ভাই দু-জনও আসবে।

চেয়ারম্যান বললে, নতুন ব্রাদারকে কথা দিয়েছি কিন্তু যাওয়ার জন্যে।

ম্যাকমুর্দোর দিকে চোখ ফেরাল টেড বলডুইন–চাহনি দেখে বোঝা গেল সে কিচ্ছু ভোলেনি–ক্ষমাও করেনি।

বললে তেতো গলায়, বেশ তো, আসতে চায় আসুক। ব্যস, আর দরকার নেই। যত তাড়াতাড়ি কাজে নামা যায়, ততই মঙ্গল।

মাতালদের গান, চিকার, হুল্লোড়ের মধ্যে ভঙ্গ হল সভা। মদ্যশালায় তখনও হই-হুল্লোড় চলছে, কিছু ব্রাদার থেকে গেল সেখানে। কাজের ভার যাদের ওপর পড়েছে, তারা বেরিয়ে গেল দু-জন তিনজন করে যাতে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হয়। রাত বেশ ঠান্ডা, হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে ছাড়ছে। তারকাখচিত, কুয়াশামলিন আকাশে ঝলমল করছে আধখানা চাদ। একটা বড়ো বাড়ির সামনের উঠোনে গিয়ে জড়ো হল এরা। আলো ঝলমল দুটো জানলার মাঝে সোনালি হরফে লেখা ভারমিসা হেরাল্ড। ভেতর থেকে ভেসে আসছে ছাপাখানার ঘটাং ঘটাং আওয়াজ।

বলডুইন বলে ম্যাকমুর্দোকে, তুমি নীচে দরজার সামনে দাঁড়াও পালাবার পথ যেন খোলা থাকে। আর্থার উইলেবাই থাকবে আমার সঙ্গে, বাকি সবাই এসো আমার সঙ্গে। ভয় নেই। এই মুহূর্তে আমরা যে ইউনিয়ন বারে আছি, বারোজন সাক্ষী তৈরি হয়েছে তা বলবার জন্যে।

তখন প্রায় মাঝরাত। গৃহাভিমুখী দু-একজন মদ্যপ ছাড়া রাস্তা ফাঁকা। রাস্তা পেরিয়ে খবরের কাগজের অফিসের সামনে পৌঁছোলো ছোট্ট দলটি এবং এক ধাক্কায় দরজা

খুলেই সামনের সিঁড়ি বেয়ে বেগে ওপরে উঠে গেল সদলবলে বলড়ুইন। নীচে পাহারায় রইল ম্যাকমুর্দো এবং আরেকজন। ওপরের ঘর থেকে আগে একটা চিৎকার শোনা গেল। তারপর বাঁচাও বাঁচাও আর্তচিৎকার, দুমদাম ছোটাছুটির আওয়াজ এবং চেয়ার ছিটকে পড়ার শব্দ। পরক্ষণেই দৌড়ে চাতালে বেরিয়ে এল এক ভদ্রলোক মাথার চুল সব সাদা। কিন্তু তার বেশি আর যেতে পারল না। পেছন থেকে এসে চেপে ধরল আততায়ীরা–বৃদ্ধের চশমাটা ঠনঠনঠন শব্দে সিঁড়ির ওপর দিয়ে ছিটকে এসে পড়ল ম্যাকমুর্দোর পায়ের কাছে। ধপ করে একটা আওয়াজের সঙ্গেসঙ্গে ককিয়ে উঠল বৃদ্ধ। মুখ থুবড়ে পড়েছে স্ট্যানজার এবং ছ-টা লাঠি এইসঙ্গে উঠছে আর পড়ছে দেহের নানা জায়গায়। দুমড়ে মুচড়ে দীর্ঘশীর্ণ শরীর বেঁকিয়ে চুরিয়ে প্রত্যেকটা মারের সঙ্গেসঙ্গে কাতরাচ্ছে বৃদ্ধ। আর সবাই শেষ পর্যন্ত থেমে গেলেও নিষ্ঠুর আনন্দে বিকৃত নারকীয় হাসি হাসতে হাসতে মাথার ওপর লাঠি চালাচ্ছে বলড়ুইনদু-হাতে বৃদ্ধ বৃথাই চেষ্টা করছে মাথা বাঁচাবার। রক্তে লাল হয়ে গেছে সাদা চুল। বাহুর ফাঁকে কোথাও মাথা দেখা গেলেই ঝুঁকে পড়ে সেই জায়গা টিপ করে লাঠি মারছে বলড়ুইন, এমন সময়ে ঝড়ের মতো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে ম্যাকমুর্দো।

বললে, মেরে ফেলবে নাকি! ফ্যালো লাঠি!

হকচকিয়ে গেল বলড়ুইন।

পরক্ষণেই বললে গলার শির তুলে, গোল্লায় যাও তুমি! কে-হে তুমি লজে নতুন এসেই বাগড়া দিতে এসেছ আমার কাজে? সরে দাঁড়াও। বলেই লাঠি তুলল মাথার ওপর। কিন্তু তার আগেই ফস করে হিপ-পকেট থেকে পিস্তল টেনে বার করেছে ম্যাকমুর্দো।

তুমি সরে দাঁড়াও! আমার গায়ে হাত দিলেই মুণ্ডু উড়িয়ে দেব। খুব তো লজের দোহাই পাড়ছ, কী বলেছিল বডিমাস্টার? খুন করা চলবে না। কিন্তু তুমি তো একে খুন করতেই যাচ্ছ।

স্যাঙাতদের মধ্যে একজন বললে, ঠিক কথা।

নীচ থেকে ভেসে এল চিৎকার, তাড়াতাড়ি করো! জানলায় জানলায় আলো জ্বলে উঠছে। শহরের সমস্ত লোক তাড়া করবে তোমাদের পাঁচ মিনিটের মধ্যে।

সত্যিই রাস্তায় চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। নীচের হল ঘরে জড়ো হচ্ছে কম্পোজিটর আর টাইপসেটাররা সাহসে বুক বাঁধছে এগিয়ে আসার জন্য। সম্পাদকের নিথর নিস্পন্দ দেহটা সিঁড়ির মাথায় ফেলে রেখে তরতরিয়ে নেমে এল আততায়ীরা, দ্রুত মিলিয়ে গেল রাস্তায় ইউনিয়ন হাউসে পৌঁছেই জনাকয়েক বেমালুম মিশে গেল ম্যাকগিন্টির সেলুনে ভিড়ের মধ্যে বার কাউন্টারে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বসকে জানিয়ে দিল, কাম ফতে এবং ভালোভাবেই। বাকি ক-জন পাশের রাস্তা দিয়ে রওনা হল যে-যার বাড়ির দিকে এদের মধ্যে রইল ম্যাকমুর্দো।

ভ্যালি অফ ফিয়ার

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার সঙ্গেসঙ্গে ম্যাকমুর্দোর মনে পড়ল, হ্যাঁ, গতকাল তার লজ-অন্তভুক্তির দীক্ষাই হয়েছে বটে। হাড়ে হাড়ে তা টের পাওয়া যাচ্ছে। মদ্যপানের ফলে মাথা দপদপ করছে, এবং বাহুর যে অংশে ছ্যাকা দেওয়া হয়েছে, সেখানটা ফুলে ঢোল হয়ে দারুণ টাটিয়েছে। যেহেতু তার রোজগারের উৎস একটু অদ্ভুত, তাই কাজে বেরোনোর মধ্যে কোনো বাঁধা নিয়ম ছিল না। সুতরাং ব্রেকফাস্ট খেল বেলা করে, বাড়িতেই কাটাল সকালটা এবং একটা দীর্ঘ পত্র লিখল এক বন্ধুকে। তারপর পড়ল ডেইলি হেরাল্ড পত্রিকা। শেষ মুহূর্তেও একটা বিশেষ স্তম্ভে ছাপা হয়েছে খবরটা :–হের্যাল্ড অফিসে হামলা। সম্পাদক গুরুতরভাবে আহত। এরপর যে-ঘটনার বিবরণ ছাপা হয়েছে, তার খবর ম্যাকমুর্দোই বেশি রাখে সংবাদদাতার চেয়ে। খবরের শেষে লেখা হয়েছে এই ক-টি লাইন :

বিষয়টি এখন পুলিশের হাতে, কিন্তু অতীতের মতো এ-অত্যাচারেরও কোনো সুরাহা তাদের কাছে আশা করা যায় না। আততায়ীদের কয়েকজনকে চেনা গিয়েছে, আশা করা যায় এদের সাজাও হবে। হামলার উৎস কিন্তু সেই কুখ্যাত সমিতি–দীর্ঘকাল যাবৎ যারা এ-তল্লাটে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে এবং যাদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি লেখা শুরু করেছিল হেরাল্ড কোনোরকম চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হয় নি। মি. স্ট্যানজারের বন্ধুবর্গ শুনে সুখী হবেন যে মারাত্মকভাবে বহুস্থানে জখম হওয়া সত্ত্বেও এবং করোটির বেশ কয়েকস্থানে চোট লাগা সত্ত্বেও তার প্রাণের শঙ্কা আর নেই।

এর নীচে বেরিয়েছে আর একটা খবর। কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের একজন প্রহরী উইনচেস্টার রাইফেল নিয়ে যাতে অফিস পাহারা দেয়, সেই ব্যবস্থা চলছে।

কাগজ নামিয়ে রাখে ম্যাকমুর্দো। গত রাতের বাড়াবাড়ির দরুন হাত কাঁপছে তখনও। কাঁপা হাতেই ধরিয়ে নেয় তামাকের পাইপ। এমন সময়ে টোকা পড়ল দরজায়। গৃহকত্রী একটা চিঠি নিয়ে এল ভেতরে। এইমাত্র একটা ছেলে দিয়ে গেল চিঠিটা। চিঠিতে কারো সই নেই। বয়ানটা এই :

আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, কিন্তু আপনার বাড়িতে নয়। মিলার হিলে। যেখানে পতাকা উড়ছে, তার পাশে আমাকে পাবেন। যদি আসতে পারেন তাহলে এমন কিছু বলব যা আপনার আমার দু-জনের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ।

অত্যন্ত অবাক হয়ে দু-দুবার চিঠিটা পড়ল ম্যাকমুর্দো, কিছুতেই বুঝতে পারল না চিঠি কে লিখেছে, মানেটাই-বা কী, মেয়েলি হাতের লেখা হলে না হয় ধরে নিত অতীত জীবনের মতোই আর একটা অ্যাডভেঞ্চার শুরু হতে চলেছে বর্তমান জীবনেও। কিন্তু এ-লেখা পুরুষের এবং বেশ শিক্ষিত পুরুষের। শেষকালে বেশ কিছুটা দ্বিধার পর ঠিক করলে দেখাই করবে অজ্ঞাত পত্রলেখকের সঙ্গে।

শহরের ঠিক কেন্দ্রে অত্যন্ত অযত্নে রক্ষিত পাবলিক পার্কের নাম মিলার হিল। গ্রীষ্মকালে লোকজনের ভিড় হয়, কিন্তু শীতকালে খাঁ-খাঁ করে। মিলার হিলের মাথা থেকে পঙ্কিল,

নোংরা, বিক্ষিপ্ত শহরটাকেই কেবল আগাগোড়া দেখা যায় না, তারও ওদিকে বহুদূরবিস্তৃত এঁকাবেঁকা পেঁচালো উপত্যকা, উপত্যকার দু-পাশে সাদা বরফের গায়ে কালো কলঙ্কের মতো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়লা খনি আর লোহার কারখানা, এবং সব কিছু ঘিরে তুষারকিরীট শোভিত জঙ্গলাকীর্ণ খাড়া পাহাড়ের পর পাহাড়। পার্কের ঠিক মাঝে একটা রেস্তোরাঁ আছে। গ্রীষ্মকালে সেখানে হই চই হয়–এখন পরিত্যক্ত। চিরসবুজ আগাছায় ঢাকা এঁকাবেঁকা একটা পথ বেয়ে সকালে পৌছোলো ম্যাকমুর্দো। পাশেই একটা পতাকাবাহী দণ্ড–পতাকা এখন নেই। তলায় দাঁড়িয়ে একজন পুরুষ, টুপি টেনে নামানো এবং ওভারকোটের কলার ঠেলে তোলা। মুখ ঘোরাতেই চিনতে পারল ম্যাকমুদো। ব্রাদার মরিস গতরাতে বডিমাস্টারকে রাগিয়ে দিয়েছিল যে। লজের প্রতীকচিহ্ন বিনিময়ের পর শুরু হল কথাবার্তা।

ব্রাদার মরিস কিন্তু কথা আরম্ভ করে বেশ দ্বিধার সঙ্গে যেন বক্তব্য বিষয় অতিশয় ভঙ্গুর–ভরসা পাচ্ছে না। বললে, মিস্টার ম্যাকমুর্দো, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। দয়া করে এসেছেন বলে ধন্যবাদ জানবেন।

চিঠিতে নিজের নাম লেখেননি কেন?

মিস্টার, সাবধানের মার নেই। দিনকাল এখন এমন যে ছোটোখাটো ব্যাপারও কীভাবে ঘুরে আসবে নিজের কাছে কেউ তা বলতে পারে না। কাকে বিশ্বাস করা উচিত, কাকে করা উচিত নয়–তাও কেউ জানে না।

লজের ব্রাদারদের বিশ্বাস করা কি যায় না?

আরে না। সবসময়ে নয়। তেড়েফুঁড়ে বললে মরিস। যাই বলি না কেন, এমনকী মনে মনেও যদি কিছু ভাবি, খবরটা যেন হাওয়ায় পৌঁছে যায় এই ম্যাকগিন্টি লোকটার কাছে।

কঠিন কণ্ঠে বললে ম্যাকমুর্দো, দেখুন, গতকাল রাত্রে শপথ নিয়েছি বডিমাস্টারের সামনে। আপনি কি সেই শপথ ভাঙতে বলছেন?

বিষণ্ণভাবে মরিস বললে, আপনি যদি ওইভাবে নেন, তাহলে আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য দুঃখিত। পরিস্থিতি এখন সত্যিই খুব সঙিন। দু-জন স্বাধীন নাগরিকও মনের কথা পরস্পরের কাছে বলতে পারে না।

অত্যন্ত সংকীর্ণ চোখে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ করছিল ম্যাকমুর্দো। এই কথার পর একটু সহজ হল।

বললে, আমি তো শুধু আমার কথাই বললাম। নতুন এসেছি, সব কিছুই অদ্ভুত লাগছে। কাজেই, আমার পক্ষে মুখ খোলা সমীচীন হবে না, মি. মরিস। তবে আপনি যদি কিছু বলতে চান তো শুনতে পারি।

তারপর গিয়ে বলবেন বস ম্যাকগিন্টিকে? তিক্তস্বরে বলে মরিস।

অবিচার করলেন। লজের প্রতি আমি বিশ্বস্ত ঠিকই, কিন্তু কেউ যদি বিশ্বাস করে কোনো কথা বলে, সে-কথা পেটে রাখতে পারব না–এমন বান্দা আমি নই। যা বলবেন তা আমি ছাড়া কেউ জানবে না কথা দিলাম কিন্তু আমার দিক দিয়ে কোনো সাহায্য বা সহানুভূতিও যে পাবেন না, তাও বলে রাখলাম।

মরিস বললে, দুটোর কোনোটারই প্রত্যাশা আর করি না কারো কাছে ভিক্ষাও আর চাই। আমার কথা বলবার পর জানবেন কিন্তু আমার জীবনটাও আপনার হাতের মুঠোয় চলে যাবে। কিন্তু আপনি যত খারাপই হোন না কেন–কাল রাতে তো দেখলাম ওদের মতো জঘন্য হওয়ার ঝোঁক আপনার মধ্যে রয়েছে–তাহলেও এসব ব্যাপারে আপনি এখনও নতুন, ওদের মতো বিবেক বস্তুটা এখনও শক্ত হয়নি। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে কথা বলব।

বলুন কী বলবেন?

যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন, নরকেও জায়গা হবে না বলে দিলাম।

বললাম তো করব না।

তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করা যাক শিকাগোয় যখন ফ্রিম্যানদের সোসাইটিতে নাম লিখিয়ে দানধ্যান আর আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন, তখন কি ঘুণাক্ষরেও ভেবেছিলেন যে পাপের পথে নামতে যাচ্ছেন? অপরাধ করতে চলেছেন?

এর নাম কি অপরাধ?

অপরাধ নয়! আবেগে গলা কেঁপে গেল মরিসের। কতটুকু-বা আর দেখেছেন আপনি, তাই ও-কথা বলতে পারলেন। গতকাল রাত্রে যা ঘটল সেটা কি অপরাধ নয়? আপনার বাবার বয়সি এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে রক্ত বার করে দেওয়াটা যদি অপরাধ না হয়, তবে আর কাকে অপরাধ বলে শুনি?

ম্যাকমুর্দো বললে, অনেকে কিন্তু এর নাম দিয়েছে যুদ্ধ। দুই শ্রেণির মধ্যে লড়াই। যে যত জোরে মারতে পারবে, সেই জিতবে।

শিকাগোয় ফ্রিম্যানদের সোসাইটিতে নাম লেখানোর সময়ে এ-জিনিস কি ভেবেছিলেন? তা অবশ্য ভাবিনি।

আমিও ভাবিনি ফিলাডেলফিয়ার সোসাইটির মেম্বার হওয়ার সময়ে। সেটা ছিল পাঁচজনের উপকার করার ক্লাব, মেম্বারদের আড্ডা মারার জায়গা। তারপর এই জায়গার নামটা শুনলাম–শুনেছিলাম খুবই অশুভ লগ্নে, অভিশপ্ত মুহূর্তে। চলে এলাম ভবিষ্যৎটা ভালো করার জন্যে, নিজের আরও মঙ্গলের জন্যে। কী মঙ্গল হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন! সঙ্গে এল বউ আর ছেলে-মেয়ে। মার্কেট স্কোয়ারে দোকান দিলাম–শুকনো জিনিসপত্রের দোকান–কপাল ফিরতে লাগল একটু করে। খবর ছড়িয়ে গেল আমি ফ্রিম্যান, গতরাতে যেভাবে জোর করে মেম্বার করা হল আপনাকে ঠিক সেইভাবে গায়ের জোরে আমাকেও

টেনে আনা হল স্থানীয় লজে। আমার বাহুতেও ছ্যাকা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই চিহ্ন–যে-চিহ্ন কাউকে দেখানো যায় না–লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়–এ ছাড়াও আরও জঘন্য চিহ্ন আঁকা হয়ে গেছে আমার এই বুকের মধ্যে। দু-দিনেই টের পেলাম একটা পিশাচের হুকুমে আমাকে ওঠ-বস করতে হচ্ছে, জড়িয়ে পড়েছি অপরাধের জালে। নিরুপায় হয়ে পড়লাম। করবার কিছুই আর ছিল না। আমার প্রত্যেকটা ভালো কথাকে যে বিশ্বাসঘাতকতার বুলি হিসেবে ধরা হয়েছে, গতরাত্রে দেখলেন। পালানোর পথও বন্ধ–আমার সর্বস্ব ওই দোকানে। সোসাইটির সদস্যপদ ত্যাগ করা মানেই কিন্তু খুন হয়ে যাওয়া ছেলে-মেয়ে বউয়ের কী হাল হবে ভগবান জানেন। উঃ, কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! বলতে বলতে দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মরিস কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে সারাদেহ।

দু-কাঁধ ঝাঁকায় ম্যাকমুর্দো।

বলে, আপনি তো দেখছি বড্ড তুলতুলে–এসব কাজের উপর্যুক্ত মোটেই নন।

আমার বিবেক ছিল, ধর্ম ছিল, কিন্তু ওরা আমাকে ওদের মতোই অপরাধী বানিয়ে নিয়েছে। যদি পেছোই, কপালে কী দুর্গতি আছে তা আমি জানি। হয়তো আমি ভীতু। হয়তো বউ আর ছেলে-মেয়েদের কথা ভেবেই এমনি হয়ে গিয়েছি। তাই যাওয়া ছাড়া আর পথ ছিল না। সারা জীবনটা হয়তো সেই চিন্তা নিশায় দুঃস্বপ্নের মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে আমাকে। বাড়িটা নিরিবিলি, এখান থেকে বিশ মাইল দূরে। দরজা আগলানোর ভার পড়েছিল আমার ওপর–ঠিক যেভাবে আপনি কাল রাতে দরজা পাহারা দিয়েছিলেন।

খুনটুনের ব্যাপারে আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি ওরা। তাই বাকি সবাই গেল ভেতরে। বেরিয়ে এলে পর। দেখলাম কবজি পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে রক্তে। চলে আসার সময়ে শুনলাম আর্ত চিৎকার করতে করতে একটা বাচ্চা ছেলে ছুটে বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে। ছেলেটার বয়স মোটে পাঁচ বছর, বাবার খুন হয়ে যাওয়া দেখেছে নিজের চোখে। দৃশ্যটা দেখে প্রায় অজ্ঞান হতে বসেছিলাম। তবুও মুখে হাসি টেনে বেপরোয়া থাকতে হয়েছে। কেননা তা না-করলে পরের দিনই হয়তো আমার বাড়ি থেকেই কবজি পর্যন্ত রক্তে ডুবিয়ে বেরিয়ে আসত এরা মাটিতে মুখ খুঁজড়ে বাবার জন্যে কেঁদে ভাসাত আমারই ছোটো ছেলে ফ্রেড। এইভাবেই কিন্তু অপরাধীদের একজন হয়ে গেলাম আমি। খুনিদের সাহায্য করলাম, এ-সংসারে খুনি এখন আমিও। আমি ক্যাথলিক। যত খাঁটিই হোক না আমার ধর্ম বিশ্বাস, আমি স্কোরারস, এ-কথা শোনবার পর কোনো ধর্মযাজক আর আমার সঙ্গে কথা বলবে না, আমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। এইভাবে দিন কাটছে আমার। আপনিও নেমে চলেছেন সেই পথে, শেষটা কোথায় জানেন? ঠান্ডা মাথায় যারা মানুষ খুন করে বেড়ায়, আপনি কি তাই হতে চান? নাকি সবাই মিলে চেষ্টা করে এসব বন্ধ করে দেব?

কী করতে চান? সহসা শুধোয় ম্যাকমুর্দো। পুলিশকে খবর দেবেন?

আঁতকে ওঠে মরিস, বলেন কী! ও-কথা ভাবলেও যে আমার প্রাণ যাবে।

তাহলে তো মিটেই গেল। আপনি দুর্বল, তিলকে তাল করেন আপনার সম্বন্ধে এর বেশি আর বলার নেই আমার।

তিলকে তাল করি! দু-দিনেই বুঝবেন খন। তাকিয়ে দেখুন উপত্যকার দিকে। শ-খানেক চিমনি থেকে ধোঁয়া উঠে আকাশ কীরকম কালো হয়ে গেছে দেখুন। ধোঁয়ার ওই মেঘের চাইতেও কিন্তু অনেক নীচে প্রত্যেকের মাথার ওপর ঝুলছে খুনের মেঘ। এ হল ভ্যালি অফ ফিয়ার–ভ্যালি অফ ডেথ, আতঙ্ক-উপত্যকা। মৃত্যু উপত্যকা। সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত আতঙ্ক বিরাজ করে এখানকার মানুষের অন্তরে। ইয়ংম্যান, দু-দিন যাক আপনিও টের পাবেন।

বেপরোয়া ভঙ্গিমায় ম্যাকমুর্দো বললে, সে-রকম কিছু টের পেলে আপনাকে না হয় জানিয়ে দেব। আসল কথাটা কী জানেন, এ-জায়গায় থাকার উপর্যুক্ত আপনি নন। জলের দরেও যদি কারবার বেচতে হয়, তবে তাই করুন। আমাকে যা বললেন তা কাকপক্ষী জানবে না। কিন্তু যদি আপনি ইনফরমার হন, খবর চালাচালির কারবার করেন, তাহলে কিন্তু—করুণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে মরিস, না, না, না।

তাহলে তো মিটেই গেল। যা বললেন, তা মনে রাখব। যদি কখনো সে-রকম ঘটনা ঘটে, আপনার কথা নতুন করে ভাবব। এবার বাড়ি ফেরা যাক।

যাওয়ার আগে আর একটা কথা, বললে মরিস। দু-জনকে একসঙ্গে যদি কেউ দেখে থাকে, প্রশ্ন উঠতে পারে কী কথা বলছিলাম।

আরে হ্যাঁ, বলে ভালো করলেন তো!

বলবেন, আপনাকে আমার দোকানে কেরানির কাজ করতে বলছিলাম। এবং আপনি তাতে রাজি হননি। কেমন? ঠিক আছে, এবার চলি। ভবিষ্যৎ আপনার ভালোভাবে কাটুক, এই ইচ্ছেই জানিয়ে যাই যাবার সময়ে।

সেইদিনই বিকেলে বসবার ঘরে আগুনের চুল্লির পাশে চিন্তামগ্নভাবে বসে রয়েছে ম্যাকমুর্দো, এমন সময়ে দড়াম করে দরজা খুলে গেল দেখা গেল চৌকাঠ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বস ম্যাকগিন্টির সুবিপুল মুর্তি। চিহ্ন বিনিময়ের পর বসল যুবাপুরুষের বিপরীত চেয়ারে, চেয়ে রইল নিস্পলক চোখে–একইভাবে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল ম্যাকমুদোও।

অবশেষে মুখ খোলে ম্যাকগিন্টি, ব্রাদার ম্যাকমুর্দো, সচরাচর কারো বাড়ি আমি যাইনি। বাড়ি বয়ে যারা আসে দেখা করতে ব্যস্ত থাকি তাদেরই নিয়ে। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে নেওয়ার জন্যে ভাবলাম তোমার বাড়ি আমার আসা দরকার।

আলমারি থেকে হুইস্কির বোতল বার করতে করতে আন্তরিকভাবে বললে ম্যামুর্দো, আমার পরম সৌভাগ্য, কাউন্সিলর। এত সম্মান আমি আশা করিনি।

হাত কীরকম আছে?

মুখভঙ্গি করে ম্যাকমুর্দো, হাতের ব্যথা কি ভোলা যায়। তবে যা পেলাম, তার তুলনায় ব্যথাটা কিছু নয়।

তা ঠিক, যারা অনুগত; এ-ব্যথা তারা সয়, লজের অনেক কাজও করে দেয়। আজ সকালে মিলার হিলে ব্রাদার মরিসের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল।

প্রশ্নটা আচমকা–ভাগ্যিস বুদ্ধি করে জবাবটা আগে থেকে ভেবে রেখেছিল ম্যাকমুর্দো, নইলে বিপদে পড়ত! হেসে উঠল হো হো করে। প্রাণখোলা অট্টহাসি।

বললে, মরিস জানে না আমি এই ঘরে বসেই দু-হাতে টাকা রোজগার করতে পারি। জানতেও পারবে না। কেননা আমার সম্বন্ধে ধারণা ওর খুবই ভালো। লোকটার মনটা কিন্তু ভালল। ওর ধারণা আমার নাকি খাঁকতির দশা চলছে–তাই ইচ্ছে করলে ওর দোকানে চাকরি করতে পারি।

ও, এই ব্যাপার?

হ্যাঁ।

তুমি রাজি হওনি?

তা আর বলতে। মাত্র চার ঘণ্টা খেটে দশগুণ রোজগার তো এই ঘরে বসেই করতে পারি।

তা বটে। তবে মরিসের সঙ্গে বেশি মেলামেশা না-করাই ভালো।

কেন বলুন তো?

সেটা না বলাই ভালো। এ-অঞ্চলের বেশির ভাগ লোক কিন্তু এইটুকু শুনলেই যথেষ্ট মনে করবে।

বেশির ভাগ লোকের পক্ষে যা যথেষ্ট, আমার কাছে তা নয়। জোর গলায় বলে ম্যাকমুর্দো। এতেই যদি মানুষ চেনার ক্ষমতা থাকে তো আমাকে চেনা আপনার উচিত ছিল।

জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে নোমশ দুই হাত মুঠি পাকিয়ে ঝুঁকে পড়ল দানব দেহ–এই বুঝি ঘুসি মেরে বসে সহচরের মাথায়। পরক্ষণেই ফেটে পড়ে কপট অট্টহাসিতে। বললে, তুমি তো দেখছি আচ্ছা সৃষ্টিছাড়া জীব। ঠিক আছি, কারণ জানতে চাও তো, বলছি কারণটা লজের পিণ্ডি চটকে কোনো কথা বলছে মরিস?

না।

আমার শ্রাদ্ধ করেনি?

না।

তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি বলেই বলেনি। ভেতরে ভেতরে ও কিন্তু বিশ্বস্ত ব্রাদার মোটেই নয়। সে-খবর আমরা রাখি বলেই ওকে চোখে চোখে রেখেছি–সুযোগমতো সরিয়ে দেব। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই বলেই মনে হচ্ছে। মামড়ি-পড়া ভেড়াদের ঠাঁই নেই আমাদের খোঁয়াড়ে। বিদ্রোহী ব্রাদারের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে তোমাকেও কিন্তু বিদ্রোহী বলতে বাধ্য হব। বুঝছ?

মেলামেশার সম্ভাবনাই নেই–লোকটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারি না আমি, বললে ম্যাকমুর্দো। আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে বিদ্রোহী বললে কিন্তু মুখনাড়া বন্ধ করে দিতাম।

গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললে ম্যাকগিন্টি, ওতেই হবে। সময় থাকতে হুঁশিয়ার করব বলে এসেছিলাম।

মরিসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে আপনি জানলেন কী করে?

হেসে উঠল ম্যাকগিন্টি।

বললে, এ-শহরের কোথায় কী হচ্ছে সব নখদর্পণে রাখাটাই আমার কাজ। আমি যা বলব তা ধ্রুব সত্য বলেই জানবে। যাই হোক, সময় হয়েছে, এবার আমি–

কিন্তু বিদায় নেওয়াটা আটকে গেল মাঝপথে–অপ্রত্যাশিতভাবে। আচমকা দড়াম করে সবুট পদঘাতে খুলে গেল পাল্লা এবং টুপি মাথায় তিনজন পুলিশের লোককে জ্বলন্ত চোখে, ভ্রূকুটি কুটিল ললাটে তাকিয়ে থাকতে দেখা গেল দরজার কাছে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই রিভলবার টেনে বার করতে গেল ম্যাকমুর্দো–কিন্তু আধখানা টেনেই থেমে যেতে হল তিন তিনটে উইনচেস্টার রাইফেলের নল মাথার দিকে তাক করে রয়েছে দেখে। ছ-ঘড়া রিভলবার হাতে ইউনিফর্মধারী এক ব্যক্তি ঢুকল ঘরে। শিকাগোর সেই ক্যাপ্টেন মার্ভিন–এখন কোল অ্যান্ড আয়রন কন্সট্যাবুলারির অফিসার। ফিক করে হেসে ম্যাকমুর্দোর পানে চেয়ে মাথা নাড়ল ক্যাপ্টেন।

বললে, শিকাগোর মি. মহাবদমাশ ম্যাকমুর্দো, কপালে তোমার অনেক দুর্গতি আছে দেখছি। বদমাইশি না-করলে বুঝি ঘুম হয় না? টুপি নিয়ে চলে এসো।

গর্জে উঠল ম্যাকগিন্টি, ক্যাপ্টেন মার্ভিন, এর ফল কিন্তু আপনাকে ভুগতে হবে বলে দিলাম। সজ্জন আইনভক্ত নাগরিকের বাড়িতে এভাবে হামলা করতে এসেছেন কেন?

কাউন্সিলর ম্যাকগিন্টি, কর্তব্যে বাধা দিচ্ছেন মনে রাখবেন। আমরা এসেছি ম্যাকমুর্দোকে গ্রেপ্তার করতে আপনার উচিত আমাদের সাহায্য করা কর্তব্যে বাধা দেওয়া নয়।

ম্যাকমুর্দো আমার বন্ধু সে যদি কিছু করে থাকে আমাকে জিজ্ঞেস করুন–আমি জবাব দিচ্ছি, বললে বস।

মি. ম্যাকগিন্টি, আপনার নিজের কীর্তিকলাপের জবাব আপনাকেই একদিন দিতে হতে পারে। এ-লোকটা এককালে চূড়ান্ত বদমাইশ ছিল, এখনও রয়েছে। পেট্রলম্যান, রাইফেল তুলে রাখো পকেট থেকে রিভলবারটা সরিয়ে নিন।

শাক্তস্বরে বললে ম্যাকমুর্দো, এই নিন পিস্তল। ক্যাপ্টেন মার্ভিন, আপনি যদি একা আসতেন, আর আমি যদি একা থাকতাম, এত সহজে নিয়ে যেতে পারতেন না আমাকে।

ম্যাকগিন্টি বলে, ওয়ারেন্ট কোথায় আপনার? কী আশ্চর্য! রাশিয়ায় থাকা আর ভারমিসায় থাকা দেখছি একই ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল পুলিশের ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে হবে।

এ-অত্যাচারের ফল আপনাকে ভুগতে হবে, বলে দিলাম।

কাউন্সিলর, আপনার কাজ আপনি করুন ভালোভাবেই করুন। আমাদের কাজ আমরা করব।

আমার অপরাধটা কী? শুধোয় ম্যাকমুর্দো। হেরাল্ড অফিসে চড়াও হয়ে বৃদ্ধ সম্পাদক স্ট্যানজারকে ধরে পিটোনো। খুনের চার্জ নিয়ে আসতে হয়নি, এই যথেষ্ট দোষটা অবশ্য তোমার নয়।

হেসে উঠল ম্যাকগিন্টি, এইটেই যদি ওর একমাত্র অপরাধ বলে মনে করে থাকেন, তাহলে আর কষ্ট করতে হবে না। কাল রাত বারোটা পর্যন্ত আমার সঙ্গে সেলুনে পোকার খেলেছে ম্যাকমুর্দো–ডজনখানেক সাক্ষী হাজির করব তা প্রমাণ করার জন্যে।

ওটা আপনার ব্যাপার, আপনি করুন। কালকে কোর্টে গিয়ে বরং সাক্ষী হাজির করুন। চলে এসো ম্যাকমুর্দো, সুবোধ ছেলের মতো না-এলে বন্দুকের বাঁট দিয়ে মারব মাথায়। সরে দাঁড়ান মি. ম্যাকগিন্টি, ডিউটিতে যতক্ষণ আছি, কোনো বাধাই বাধা বলে মানব না জানবেন।

ক্যাপ্টেনের সংকল্প দৃঢ় মুখচ্ছবি দেখে ট্যা-ফেঁা করার সাহস পেল না ম্যাকগিন্টি আর ম্যাকমুর্দো। যাওয়ার আগে খাটো গলায় অবশ্য কথা হয়ে গেল দুই মূর্তিমানের মধ্যে।

বুড়ো আঙুলটা ওপরে উঁচিয়ে টাকা জালের যন্ত্রটাকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে শুধোল ম্যাকগিন্টি, ওটার কি

ওসব ঠিক আছে, বসকে আশ্বস্ত করে ম্যাকমুর্দো। মেঝের তলায় চোরা খুপরির মধ্যে যন্ত্রটা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা সে করেছিল।

করমর্দন করে বস বলে, তাহলে বিদায়। আইনবিদ রিলির সঙ্গে এখুনি দেখা করে তোমাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। জেনে রেখো, তোমাকে আটকে রাখার ক্ষমতা ওদের নেই।

ও-ব্যাপারে আর বাজি ধরব না। কয়েদিকে সামলে রাখবে তোমরা দু-জনে–বেচাল দেখলেই গুলি করবে। যাওয়ার আগে বাড়িটা তল্লাশ করব আমি।

তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিন্তু টাকা জালের যন্ত্র পেল না মার্ভিন। নীচে নেমে পাহারাদারদের সঙ্গে ম্যাকমুর্দোকে নিয়ে গেল সদরদপ্তরে। অন্ধকার গাঢ় হয়েছে, ছুরির মতো ধারালো তুষার ঝড়ে চোখ-মুখ যেন ফালাফালা হয়ে যাচ্ছে, রাস্তা তাই প্রায় জনহীন–দু-একজন নিষ্কর্মা ছাড়া। পেছন পেছন এল এরা অন্ধকার আর তুষার ঝড়ের আড়ালে নিজেদের অদৃশ্য রেখে সাহসে বুক বেঁধে মুণ্ডুপাত করতে লাগল কয়েদির।

জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নিন শয়তান স্কোরারস-এর! পুলিশ ফাঁড়িতে ম্যাকমুর্দোকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার পর হাতে হাতে নানারকম টিটকিরি বর্ষণ করে চলল নিষ্কর্মার দল। ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেকটর রুটিনমাফিক জিজ্ঞাসাবাদ করে তাকে পুরে দিল গারদঘরে। বলডুইন এবং আরও তিনজন অপরাধী রয়েছে সেলে–গ্রেপ্তার হয়েছে গত রাতে, বিচার হবে আগামী সকালে!

আরক্ষাবাহিনীর সুদৃঢ় এই দুর্গেও দেখা গেল ফ্রি-ম্যানদের কারচুপি পৌঁছেছে। গভীর রাতে বিছানার জন্যে এক বান্ডিল খড় নিয়ে এল একদল কারারক্ষক। বান্ডিলের ভেতর

থেকে বেরোল দু-বোতল হুইস্কি, খানকয়েক গেলাস এবং এক প্যাকেট তাস। দারুণ ফুর্তিতে কাটল সারারাত পরের দিনের অগ্নিপরীক্ষা নিয়ে তিলমাত্র দুশ্চিন্তা রইল না কারুর মনে।

দুশ্চিন্তার কারণও ছিল না। যথাসময়ে তা বোঝা গেল। উচ্চতর আদালতে মামলা সুপারিশ করার মতো সাক্ষ্যপ্রমাণ পেলেন না ম্যাজিস্ট্রেট। কম্পােজিটর আর প্রেসের লোকরা বললে, হানাদারদের মধ্যে কয়েদিরা ছিল বলেই তাদের বিশ্বাস কিন্তু শপথ নিয়ে শনাক্তকরণ সম্ভব নয় দুটি কারণে। প্রথমত কম আলোয় হানাদারদের স্পষ্ট দেখা যায়নি, দ্বিতীয়ত প্রত্যেকেই ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। ম্যাকগিন্টি একজন তুখোড় আইনবিদকে লাগিয়েছিল কেস লড়বার জন্যে। সে-ভদ্রলোক চোখা চোখা জেরা আরম্ভ করতেই প্রেসের লোক আর কম্পােজিটরদের সব কথাই আরও ভাসা ভাসা হয়ে এল। আহত ব্যক্তি এসেই বলেছিলেন, অতর্কিতে আক্রান্ত হওয়ার দরুন কাউকেই তিনি চিনে রাখবার মতো সময় পাননি–একজনের গোঁফ আছে, এইটুকুই শুধু মনে আছে। প্রথমে লাঠি মেরেছে সে! আরও বললে, হানাদাররা নিঃসন্দেহে স্কোরারস-দের দল। এরা ছাড়া সমাজে আর তার শত্রু নেই। অনেকদিন ধরেই সম্পাদকীয়তে খোলাখুলি এদের আক্রমণ করেছিলেন তিনি। এই গেল একদিনের ব্যাপার। আর একদিনে উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাউন্সিলর ম্যাকগিন্টি স্বয়ং এবং ছ-জন নাগরিক একবাক্যে এবং সুকৌশলে বলে গেল, ঘটনাটি যখন ঘটে তারও কিছুক্ষণ পর পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রত্যেকে ইউনিয়ন হাউসে তাস খেলায় মত্ত ছিল। ফলে, হয়রানির জন্যে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি দেওয়া হল আসামিদের এবং ভৎসনা করা হল ক্যাপ্টেন মার্ভিন এবং পুলিশকে তাদের পুলিশি আক্রোশের জন্যে।

রায় শুনে উল্লাস আর হাততালিতে আদালত কক্ষ যেন ফেটে গেল ভিড়ের মধ্যে অনেক চেনা মুখ চোখে পড়ল ম্যাকমুর্দোর। লজের ব্রাদাররা হাসছে, হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছে। কাঠগড়া থেকে সারবেঁধে নেমে আসার সময়ে আসামিদের চোখে পড়ল আরও কয়েকটি মুখ ঠোঁট তাদের দৃঢ়সংবদ্ধ, চোখে কুটি। ওদের মধ্যে একজন খর্বকায়, মুখভরতি কালো দাড়ি, চোহারাটিও গোঁয়ার টাইপের। বেকসুর খালাস কয়েদিরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে সঙ্গীদের এবং নিজের কথা স্পষ্ট বলেই ফেলল।

বলল, শয়তান খুনি কোথাকার! তোদের আমি শেষ করবই করব!

নীরন্ধ্রতম অন্ধকার মুহূর্ত

সঙ্গীদের মধ্যে জ্যাক ম্যাকমুর্দো আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল গ্রেপ্তার আর খালাস হওয়ার পর। সোসাইটিতে নাম লেখানোর সঙ্গেসঙ্গে সেই রাত্রেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করানোর মতো কুকর্ম সে করেছে, সমিতির ইতিহাসে কিন্তু এ-নজির আর নেই। জমাটি সঙ্গী, ফুর্তিবাজ মদ্যপ এবং চড়া মেজাজের দরুন এর মধ্যেই বেশ সুনাম হয়েছিল তার মেজাজ তার এমনই যে স্বয়ং বসের মতো সর্বশক্তিমানও তাকে অপমান করলে আর রক্ষে নেই–রুখে সে দাঁড়াবেই। কিন্তু এসব ছাড়াও কমরেডদের চোখে সে আরও একটা ব্যাপারে মার্কামারা হয়ে উঠেছিল, রক্ত ঝরানো যেকোনো চক্রান্ত সৃষ্টি করাই শুধু নয়, সেই চক্রান্ত অনুযায়ী কাজ হাসিল করার মতো ক্ষমতা যে তার ব্রেনে আছে এবং সেই ব্রেনের মতো আর একটি ব্রেনও সংগঠনে আর দ্বিতীয় নেই–তা স্পষ্ট হয়ে গেছিল। প্রবীণরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, ছোকরা কাজ করে খুব পরিষ্কার। এমন লোককে নিজের কাজে লাগানোর সুযোগ খুঁজত প্রত্যেকেই। কাজের যন্ত্রর অভাব ছিল না ম্যাকগিন্টির, কিন্তু এখন দেখলে সব যন্ত্রর সেরা যন্ত্র এই ম্যাকমুর্দো–তার ধারেকাছেও আসতে পারে না কেউ। ম্যাকমুর্দো যেন মানুষ নয়, রক্তখেকো ভয়ংকর একটা ব্লাডহাউন্ড কুত্তা–অতি কষ্টে ম্যাকগিন্টি যেন তাকে গলায় চেন বেঁধে টেনে রেখেছে। ছোটোখাটো কাজের জন্যে খেকি কুকুরই যথেষ্ট, কিন্তু সে-রকম শিকার পেলে লেলিয়ে দেওয়া যাবেখন একে। টেড বলড্উইন এবং আরও কয়েকজন লজসদস্য নবাগতের এইভাবে চড়চড়িয়ে উঠে যাওয়া ভালো চোখে দেখল না–ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে

গেলেও কিন্তু ঘাঁটাতে কখনো গেল না–কেননা ম্যাকমুর্দো হাসতে যেমন তৈরি, লড়তেও তেমনি একপায়ে খাড়া।

বন্ধুবান্ধবদের চোখের মণি হয়ে ওঠা ছাড়াও ম্যাকমুর্দোর জীবনে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল যেখানে সে তখন হাবুডুবু খেয়ে মরেছে। বন্ধুদের কাছে খাতির জমানোর ব্যাপারে সে-তুলনায় কিছুই নয়। এটি শ্যাফটারের বাবা ম্যাকমুদোর সঙ্গে আর খাতির বজায় রাখতে রাজি নন এমনকী বাড়িতে ঢুকতে দিতেও নারাজ। ম্যাকমুর্দোকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসলেও এটি নিজেও বুঝেছিল ক্রিমিন্যাল বলে পরিচিত কাউকে বিয়ে করার পরিণতি কী হতে পারে। তাই সারারাত না-ঘুমিয়ে একদিন সকালে উঠে মন ঠিক করে ফেলল এট্টি। ম্যাকমুর্দোর সঙ্গে দেখা করে কুসঙ্গীদের খপ্পর থেকে তাকে ফিরিয়ে আনার শেষ চেষ্টা সে করবে। এদের জন্যেই তো পাপের পথে ক্রমশ নেমে চলেছে সে–শেষ চেষ্টা সে করবে কুপ্রভাব থেকে তাকে সরিয়ে আনার এবং হয়তো এই দেখাই হবে শেষ দেখা। ম্যাকমুর্দো আগে অনেকবার কাকুতি মিনতি করে এটিকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এতদিন এট্টি যায়নি, কিন্তু সেদিন গেল! সোজা উঠে গেল বসবার ঘরে। এট্টির দিকে পিঠ ফিরিয়ে টেবিলে বসে একটা চিঠি লিখছিল ম্যাকমুদো। এট্টি বয়স তখন মোটে উনিশ বলেই হঠাৎ একটা মেয়েলি দুষ্টমিতে পেয়ে বসল তাকে। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেছে এট্টি, কিন্তু তন্ময় থাকায় শুনতে পায়নি ম্যাকমুর্দো! পা টিপে টিপে পেছনে এসে আলগোছে হাত রাখল ঝুঁকে নেমে থাকা দু-কাঁধের ওপর।

ম্যাকমুর্দোকে চমকে দেওয়ার জন্যেই এই দুষ্টুমি। এবং তাতে কাজও হল। কিন্তু এট্টিকেও চমকে উঠতে হল। বাঘের মতো লাফে নিমেষের মধ্যে এট্টির দিকে ঠিকরে

গেল ম্যাকমুর্দো এবং ডান হাত বাড়িয়ে ধরল গলার দিকে। একইসঙ্গে বাঁ-হাতে দলা পাকিয়ে ফেলল সামনে রাখা কাগজটা। মুহূর্তের জন্যে চেয়ে রইল গনগনে চোখে। তারপর আনন্দ আর বিস্ময় এসে মুখ থেকে বিদেয় করল প্রচণ্ড জিঘাংসা। আত্যন্তিক প্রকোপে মুখের প্রতিটি পেশি বিকৃত হয়েছিল এতক্ষণ এবং যে জিঘাংসার ভয়ংকর চেহারা দেখে আতঙ্কে পাণ্ড হয়ে ছিটকে পেছনে সরে গিয়েছিল এটি বেচারা। নরম ধাঁচের মেয়ে সে জীবনে এমন বন্য বিকট রূপ সে দেখেনি।

কপাল মুছে নিয়ে বলল ম্যাকমুর্দো, আরে তুমি! কী কাণ্ড দেখো তো! আমার প্রাণের দেবী এসেছে আমারই ঘরে, আর আমি কিনা যাচ্ছি তার টুটি টিপে ধরে শেষ করে দিতে। এসো প্রাণেশ্বরী, এসো–দু-বাহু বাড়িয়ে দেয় ম্যাকমুর্দো–দেখো আবার কেমন সুন্দর করে তুলি নিজেকে তোমার কাছে।

কিন্তু প্রিয়তমের মুখে এইমাত্র ক্ষণের জন্যে অপরাধের যে-ভয়ার্ত ছবি সে দেখেছে, এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেই ধাক্কা। মেয়ে মানুষের সহজাত অনুভূতি দিয়ে সে নিমেষের মধ্যে বুঝে নিয়েছে, চমকে ওঠাটা নিছক ভয়ের জন্যে নয়। ভেতরে চাপা আছে বলেই ভয়টা ফুটে বেরিয়েছে এইভাবে।

জ্যাক, কী হয়েছে তোমার অমন চমকে উঠলে কেন আমাকে দেখে? বিবেক পরিষ্কার থাকলে তো ওভাবে তাকাতে পারতে না।

আরে, পাঁচরকম চিন্তা নিয়ে মশগুল হয়ে রয়েছি, এমন সময়ে পরির মতো হালকা পা ফেলে এমনভাবে ঘরে ঢুকলে—

না, জ্যাক না, চমকেছ অন্য কারণে, বলতে বলতে হঠাৎ সন্দেহ নিবিড় হয় এট্টির চোখে, দেখি কী লিখছিলে।

এট্টি, সেটি পারব না।

সন্দেহ আর সন্দেহ রইল না–ধ্রুব বিশ্বাস হয়ে গেল।

বটে! অন্য মেয়েকে চিঠি লেখা হচ্ছে! ঠিক ধরেছি, নইলে দেখাচ্ছ না কেন? কাকে লিখছ? স্ত্রীকে? কী করে জানব তোমার বিয়ে হয়নি? ঘরে বউ আছে? এ-অঞ্চলে কেউ তোমায় চেনে না কোনো খবরও রাখে না।

এট্টি, ঈশ্বরের নামে বলছি, আমার বিয়ে হয়নি। তুমি ছাড়া আমার জীবনে দ্বিতীয় নারী আর নেই।

বলতে বলতে আতীব্র আবেগে নীরক্ত হয়ে এল ম্যাকমুর্দোর মুখের চেহারা–সাদা পাঁশুটে সেই মুখ দেখে আর অবিশ্বাস করতে পারল না এট্টি।

তাহলে দেখাচ্ছ না কেন?

সখী, সত্যি কথাটা তাহলে বলি। শপথ করেছি এ-চিঠি কাউকে দেখাব না–যাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, তাদের কাছে যাতে আমার মুখ থাকে, তাই এ নিয়ে কোনো কথা তোমাকেও বলব না। শুধু জেনে রাখো, চিঠিটা আমাদের লজ সংক্রান্ত কোনো একটা ব্যাপারে। বোঝো না কেন, আচমকা পিঠে হাত পড়া মানেই তাই ভেবে নিয়েছিলাম নিশ্চয় গোয়েন্দা এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে।

এট্টি বুঝল ম্যাকমুর্দো সত্যি কথাই বলছে। দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের ওপর টেনে নেয় ম্যাকমুর্দো। মুখচুম্বন করে ধুয়ে মুছে উড়িয়ে দেয় সব সন্দেহ, সব ভয়কে।

বোসসা এখানে। তোমার মতো রানির পক্ষে খুবই অদ্ভুত সিংহাসন, কিন্তু এর চাইতে ভালো আসন তত তোমার প্রিয়তম বেচারা দিতে পারবে না। এখন না-পারলেও একদিন কিন্তু দেবে–নিশ্চিন্ত থেকো। মনটা এখন আবার ঠিক হয়ে গেছে তো?

কী করে ঠিক হবে বলতে পারো? তুমি ক্রিমিন্যাল এবং কবে যে খুনের দায়ে কাঠগড়ায় উঠবে ঈশ্বর জানেন–এর পর মন কখনো ঠিক থাকতে পারে জ্যাক? সেদিন একজন বোর্ডার বলছিল, ম্যাকমুর্দো আর স্কোরারস–কথাটা ছুরির মতো বিঁধে গেল আমার বুকে।

তাতে কী, যত রূঢ়ই হোক না কেন, হাড়গোড় তো ভেঙে দেয় না। গায়ে ফোঁসকা পড়ে না।

কিন্তু কথাটা তো সত্যি।

যতটা খারাপ ভাবছ, ততটা নয়। আমরা গরিব, অধিকার ফিরিয়ে আনার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

দু-বাহু দিয়ে প্রিয়তমের কণ্ঠ বেষ্টন করে এট্টি।

এ-লড়াই ছাড়ো জ্যাক, ছেড়ে দাও। এই কথা বলব বলেই আজ আমি এসেছি তোমার কাছে। হাঁটু গেড়ে ভিক্ষে চাইছি, জ্যাক! তোমার পা ধরে বলছি, মিনতি করছি–এ-কাজ ছেড়ে দাও।

এটিকে তুলে ধরে ম্যাকমুর্দো। মাথাটা টেনে নিয়ে রাখে বুকে। আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয় মাথায় মুখে।

ডার্লিং কী বলছ বুঝতে পারছ না। শপথ ভঙ্গ করে, কমরেডদের ত্যাগ করে চলে আসা কি সম্ভব? আমার অবস্থাটা জানলে এ-অনুরোধ কখনো করতে না। তা ছাড়া, আমি চাইলেও তো আসা সম্ভব নয়। ওরা ছাড়বে কেন? লজের গুপ্ত রহস্য একবার যে জানে, লজ থেকে আর তাকে বেরোতে দেওয়া হয় না।

তাও ভেবেছি, জ্যাক। প্ল্যানও করেছি। বাবা কিছু টাকা জমিয়েছে। এ-জায়গা বাবার আর ভালো লাগছে না। সবসময়ে ভয়ে ভয়ে আধখানা হয়ে থাকতে হয় এখানে। তাই বাবা

যাওয়ার জন্যে এক পায়ে খাড়া। ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে যদি পালিয়ে যাই, এরা আর তোমার নাগাল পাবে না।

হেসে ফেলে ম্যাকমুর্দো। লজের নাগাল কদ্দূর পৌঁছোয় তোমার জানা নেই এট্টি। ফিলাডেলফিয়া বা নিউইয়র্কে পৌঁছোবে না ভেবো না।

তাহলে চলো যাই পশ্চিমে, নয় তো ইংলন্ডে, অথবা সুইডেনে বাবার দেশে। ভ্যালি অফ ফিয়ার থেকে পালিয়ে পৃথিবীর যেকোনো জায়গায়।

প্রবীণ ব্রাদার মরিসের কথা মনে পড়ল ম্যাকমুর্দোর।

বললে, ভ্যালি অফ ফিয়ার নামটা এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শুনলাম। সত্যিই এ-উপত্যকার কিছু লোক ভয়ে কুঁকড়ে আছে আতঙ্ক ছায়ার তলায়। তুমি তাদের একজন।

প্রতি মুহূর্তে এই ছায়ার কালো হয়ে আসছে আমাদের জীবন। টেড বলডুইন কি তোমাকে মন থেকে ক্ষমা করেছে মনে কর? শুধু তোমাকে যমের মতো ভয় করে বলে–নইলে আমাদের কপালে কী ঘটত ভাবতে পারো? আমার দিকে যখন তাকায় তখন ওর কালো চোখের খিদেটা দেখোনি?

আমার চোখে পড়লে মেয়েদের দিকে তাকাতে হয় কী করে শিখিয়ে ছাড়বখন। কিন্তু আমি যে এ-জায়গা ছেড়ে যেতে পারছি না, সখী। একেবারেই নয়–এই আমার শেষ

কথা। তবে হ্যাঁ, তুমি যদি ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও–সম্মানের সঙ্গে কীভাবে এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায়; সে-চেষ্টা আমি করব।

এ ধরনের কাজে সম্মান আবার কীসের?

]যা খুশি বলতে পারো। কিন্তু যদি ছ-মাস সময় দাও আমাকে এমনভাবে কেটে বেরিয়ে যাব যে পরে লজ্জায় মাথা হেঁট হবে না–কেউ ধিক্কার দিতেও পারবে না।

আনন্দে হেসে ওঠে এট্টি।

ছ-মাস তো? কথা দিচ্ছ?

ছ-মাস, হয়তো সাত আট হয়ে যেতে পারে। বড়োজোর এক বছর হতে পারে তার মধ্যেই জানবে উপত্যকা ছেড়ে চলে যাব আমরা সবাই।

এর বেশি কথা আদায় করতে পারল না এট্টি, কিন্তু যা পেল তা নেহাত কম নয়। তমিস্রাময় ভবিষ্যতে আশার আলো নিয়ে পিতৃগৃহে ফিরল সে। জ্যাক ম্যাকমুর্দো তার জীবনে আবির্ভূত হওয়ার পর থেকে এত খুশি সে কখনো হয়নি।

ম্যাকমুর্দো ভেবেছিল, লজের সদস্য হিসেবে সব কথা তাকে বলা হবে। কিন্তু দু-দিনেই দেখলে সংগঠনটা মামুলি লজের মতো সাদাসিদে নয়–অনেক বেশি ব্যাপক এবং জটিল।

এমনকী বস ম্যাকগিন্টিও বহু ব্যাপারে অজ্ঞ। জেলা প্রতিনিধি নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী থাকে হবসঙ্গ প্যাঁচ-এ–বেশ কয়েকটা লজের ওপর শক্তি খাটায় লোকটা এবং সেটা ঘটে আচম্বিতে আর খেয়ালখুশি মতো। লোকটাকে একবারই দেখেছিল ম্যাকমুর্দো। মাথার চুল তার সাদা, শঠতায় ভরপুর, চলাফেরা চোরের মতো চুপিসারে, আড়ে আড়ে তাকানোর ধরন–বিদ্বেষবিষে জর্জরিত–ঠিক যেন একটা ধেড়ে ইঁদুর। নাম তার ইভান্স পট। বস ম্যাকগিন্টির মতো ডাকাবুকো মানুষও লোকটাকে দেখলে বিতৃষ্ণায় সিটিয়ে উঠত, ভয়ে শিউরে উঠত–পুঁচকে কিন্তু বিপজ্জনক রোম্পায়াকে দানবাকার ড্যান্টন যেমন ভয় পায়, অনেকটা সেইরকম।

একদিন স্ক্যানল্যান একটা চিঠি পেল ম্যাকগিন্টির কাছ থেকে সেইসঙ্গে ইভান্স পটেরও চিঠি রয়েছে একটা। ম্যাকমুর্দোর সঙ্গে একই ডেরায় থাকত স্ক্যানল্যান। ইভান্স পট লিখেছে, দু-জন কাজের লোক পাঠাচ্ছে সে। ললার আর অ্যানড্রজ এদের নাম। এদিকে আসছে কিছু কাজ সারবার জন্যে। কী কাজ সেটা বলা সংগত হবে না। কাজের লগ্ন না-আসা পর্যন্ত ওদের থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত কি বডিমাস্টার করে দেবেন? ম্যাকগিন্টি লিখেছে, ইউনিয়ন হাউসে থেকে গোপনীয়তা রক্ষা করা অসম্ভব। কাজেই ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান দিন কয়েকের জন্যে তাদের বোর্ডিং হাউসে আগন্তুকদের ব্যবস্থা করে দিলে সে বাধিত হবে।

সেইদিনই সন্ধেবেলা এসে হাজির হল দু-জনে–প্রত্যেকের হাতে ঝুলিয়ে নেওয়া ব্যাগ। ললারের বয়স হয়েছে, অতিশয় সেয়ানা, কথা বিশেষ বলে , সংযত। গায়ে পুরোনো কালো ফ্রক-কোট, মাথায় নরম ফেল্ট হ্যাট আর গালে কর্কশ, ধূসর দাড়ি থাকার ফলে

দেখে মনে হয় যেন ভ্রাম্যমাণ পুরুতঠাকুর বাণী দেওয়াই একমাত্র কাজ। সহচর অ্যানড্রুজের সবে গোঁফ উঠেছে, খোলামেলা, ফুর্তিবাজ ছেলে। হইচই আর উল্লাস দেখে মনে হয় যেন ছুটি কাটাতে এসেছে এবং উপভোগ করে যাবে প্রতিটি মুহূর্ত। দু-জনের কেউই মদ ছোঁয় না। ব্যবহার অত্যন্ত ভালো–সমিতির অন্যান্য সদস্যের কাছে দৃষ্টান্তস্থানীয়–শুধু যা দু-জনেই দক্ষ গুপ্তঘাতক। মানুষ খুনের এই সমিতিতে নরহত্যার যন্ত্র হিসাবে দু-জনেই বারংবার প্রমাণ দিয়েছে নিজেদের নিখুঁত যোগ্যতার। এর মধ্যেই চোদ্দোটা খুনের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছে, ললার আর অ্যানড্রুজ করেছে তিনটের।

ম্যাকমুর্দো দেখলে, অতীত কীর্তিকলাপ নিয়ে জমিয়ে গল্প করতে দু-জনেই উন্মুখ। লজ্জাশরমের বালাই খুব একটা নেই–ভাবখানা যেন সমাজের মহা উপকার করছে–খুন করে বুক তাই দশ হাত। কী কাজ নিয়ে আগমন, সে-ব্যাপারে দু-জনেই কিন্তু টু শব্দটি করতে রাজি নয়।

ললার বললে, আমি আর ওই ছোকরা দু-জনেই মদ খাই না–তাই এ-কাজের জন্যে বেছে নেওয়া হয়েছে আমাদের। আমরা মুখ খুলি, এটা তারা চায় না। ভুল বুঝো না। জেলা-প্রতিনিধির হুকুম আমাদের তামিল করতেই হবে।

চারজনে খেতে বসে কথা হচ্ছিল। জবাব দিল ম্যাকমুর্দোর দোস্ত স্ক্যানল্যান, কিন্তু আমরা তো সবাই এক।

তা ঠিক। আগে যেসব খুন করেছি, যেমন চার্লি উইলিয়ামসের ব্যাপার বা সাইমন বার্ডের কাণ্ড নিয়ে সন্ধে পর্যন্ত গল্প চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু হাতের কাজ শেষ হওয়ার আগে এ-ব্যাপারে একটি কথাও নয়।

খিস্তি করে ম্যাকমুর্দো বললে, এ-অঞ্চলের জনাবাঝোর লাশ আমি নিজে ফেলতে চাই। কার পিছু নিয়েছ বলো দিকি? জ্যাক নক্স, না, আয়রন হিল?

আরে না, ওদের কেউ নয়।

তবে কি হারম্যান স্ট্রস?

না, সে-ও নয়।

না যদি বলতে চাও, তাহলে আর বলাই কী করে বল। কিন্তু জানলে খুশি হতাম।

ললার একটু হাসল কেবল। মাথা নাড়ল সামান্য। টলানো গেল না।

অতিথিরা মুখ টিপে থাকলেও, ম্যাকমুর্দো, স্ক্যানল্যান দু-জনেই ঠিক করেছিল, মজাটা যখন হবে, তখন সেখানে হাজির থাকবেই থাকবে। একদিন ভোররাতে পায়ের আওয়াজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যেতে শুনেই স্ক্যানল্যানকে ঘুম থেকে টেনে তুলল ম্যাকমুর্দো। ঝটপট জামাকাপড় পরে নিলে দু-জনে। নেমে এসে দেখলে দরজা খোলা রেখেই দুই অতিথি

বেরিয়ে পড়েছে নৈশ অভিযানে। ভোর তখনও হয়নি। বেশ কিছু দুরে রাস্তায় হাঁটছে দুই মূর্তিমান। পিছু নিল এরা দু-জন, পুরু বরফে পা ডুবে যাওয়ায় শব্দ হল না একদম।

বোর্ডিং হাউসটা টাউনের একদম শেষের দিকে। দেখতে দেখতে ওরা শহর ছাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। রাস্তার ক্রসিংয়ে আসতেই দেখা গেল তিনজন লোক দাঁড়িয়ে সেখানে। ললার আর অ্যানড্রুজ সংক্ষেপে কথা সেরে নিলে তিনজনের সঙ্গে। কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত হলেও আগ্রহপূর্ণ। তারপর এগিয়ে চলল পাঁচজনে। নিশ্চয় কাজটা বড়ো ধরনের দল ভারী করতে হয়েছে সেই কারণে। এক জায়গায় এসে অনেকগুলো পায়ে-চলা-পথ চলে গিয়েছে নানান খনির দিকে। যে-রাস্তাটা ক্রো হিলের দিকে গিয়েছে, আগন্তুকরা পা বাড়াল সেইদিকে। ক্রো হিলের কারবার খুব বড়ো। নিউ ইংল্যান্ডের প্রাণবন্ত নির্ভীক ম্যানেজার জোসিয়া এইচ ডান-এর জন্যে এহেন অরাজক অঞ্চলেও এই খনিতে উজ্জ্বলতা ঢুকতে পারেনি। কারবারের পরিচালনা শক্ত হাতে থাকার দরুন তা সম্ভব হয়েছে।

ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। শ্রমিকরা সারি দিয়ে কাজে চলেছে। কখনো একলা, কখনো দল বেঁধে হাঁটছে কালো পথের ওপরে।

এদের সঙ্গে মিশে গেল ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান। সামনের পাঁচমূর্তিকে চোখে চোখে রাখল প্রতি মুহূর্তে। ঘন কুয়াশা চেপে বসছে চারিদিকে। কুয়াশা ছুঁড়ে হঠাৎ শোনা গেল স্টিম হুইসলের কানফাটা আর্তনাদ। খনিগর্ভে খাঁচা নেমে যাওয়ার দশ মিনিট আগের সংকেতধ্বনি দশ মিনিট পরেই শুরু হবে দিনের কাজ।

খোলা চত্বরে পৌঁছে দেখা গেল শ-খানেক খনি-শ্রমিক জড়ো হয়ে ঠান্ডায় হি-হি করে কাঁপছে। মাটিতে পা ঠুকছে, মুখের সামনে আঙুল জড়ো করে ফুঁ দিচ্ছে। অপেক্ষারত প্রত্যেকেই। ইঞ্জিন-হাউসের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গেল পাঁচজনের ছোট্ট দলটা। গাদের টিলায় উঠে গেল ম্যাকমুর্দো আর স্ক্যানল্যান–চারিদিক স্পষ্ট দেখা যায় এখান থেকে। দেখল, ইঞ্জিন-হাউস থেকে বেরিয়ে আসছে খনি-ইঞ্জিনীয়ার মেনজিস। স্কটল্যান্ডের মানুষ, বিশাল চেহারা, গালে দাড়ির জঙ্গল। বাইরে এসেই ফুঁ দিল বাঁশিতে অর্থাৎ খনিগর্ভে খাঁচা এবার নামবে। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেল একজন ঢ্যাঙা ছোকরা, ঢিলে-ঢালা হাত-পা, দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার কামানো। সাগ্রহমুখে সে এগোল খনির মুখের দিকে। আসার পথে চোখ পড়ল পাঁচজনের দলটির ওপর। ইঞ্জিন-হাউসের ছায়ায় নীরবে নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে পাঁচটি লোক। প্রত্যেকের কপালের ওপর টেনে নামানো মাথার টুপি এবং কোটের কলার উলটে মুখ পর্যন্ত ঢাকা। দৃশ্যটা দেখেই ছাঁৎ করে ওঠে ম্যানেজারের নির্ভীক বুক–মৃত্যুর করাল ছায়া চকিতের জন্যে শিহরিত করে অন্তর। পরক্ষণেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলে অকারণ ভয়, কর্তব্যের তাড়নায় এগিয়ে যায় অনাহূত আগন্তুকদের দিকে।

যেতে যেতেই শুধোয়, কে আপনারা? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

কেউ জবাব দিল না, অ্যানড্রূজ ছোকরা কেবল এক এগিয়ে এসে ম্যানেজারের পেটে গুলি করল। সম্মোহিতের মতো এক-শো খনিশ্রমিক দাঁড়িয়ে দেখল সেই দৃশ্য নিথর নিস্পন্দ দেহ দেখে মনে হল যেন পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গেছে প্রত্যেকে। দু-হাতে ক্ষতমুখ চেপে ধরে ঝুঁকে পড়ল ম্যানেজার। পরক্ষণেই টলতে টলতে যেই এক পা

ফেলেছে, অমনি পাঁচ গুপ্তঘাতকের আর একজন গুলি করল বুকে পাশের দিকে ছিটকে গিয়ে ইট-ছাই-জঞ্জালের ওপর পড়ল ম্যানেজার পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে খামচে ধরল আবর্জনা স্তূপ। এই দেখেই বাঘের মতো গর্জন করে একটা লোহার স্প্যানার যন্ত্র তুলে নিয়ে তেড়ে এল মেনজিস–কিন্তু দু-দুটো গুলি ছুটে গিয়ে মুখে বিধতেই ছিটকে এসে মুখ থুবড়ে পড়ল পাঁচ ঘাতকের পদতলে। রাগে চেঁচাতে চেঁচাতে খনিশ্রমিকরা সামনের দিকে বন্যার জলের মতো ধেয়ে আসতেই ছ-ঘরা রিভলবার থেকে পরপর ছ-বার তাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলিবর্ষণ করল একজন ঘাতক। সঙ্গেসঙ্গে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল শ্রমিকরা। যে যেদিকে পারলে দৌড়াতে শুরু করে দিলে, কেউ কেউ পাগলের মতো দৌড়ে পৌঁছে গেল ভারমিসায় নিজেদের বাড়িতে। শেষকালে কিছু সাহসী শ্রমিক পলায়মান কুলিদের ঠেলেঠুলে একজায়গায় জড়ো করে খনিতে ফিরে এল বটে, কিন্তু ততক্ষণে গুপ্তঘাতকরা যেন কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। এক-শো সাক্ষীর চোখের সামনেই ডবল খুন করেও তারা রয়ে গেল ধরা ছোঁয়ার বাইরে–কেউ তাদের মুখ দেখেনি– শনাক্তকরণও সম্ভব নয়।

বাড়ি রওনা হল স্ক্যানল্যান আর ম্যাকমর্দো। ঝিমিয়ে পড়েছে স্ক্যানল্যান–খুন জিনিসটা এই প্রথম সে দেখল। আগে ভেবেছিল না-জানি কী মজা, এখন আর তা ভাবতে পারছে না। নিহত ম্যানেজারের স্ত্রীর বুকফাটা হাহাকার ওদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল শহর পর্যন্ত। ম্যাকমুর্দো আত্মনিমগ্ন, নীরব। কিন্তু বিন্দুমাত্র সমবেদনা নেই সহচরের দুর্বলতার প্রতি।

বার বার বলছে একটাই কথা, আরে, এ তো যুদ্ধ। ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ। সুযোগ পেলেই মারব–সমস্ত শক্তি দিয়ে মারব।

দারুণ উৎসব হয়ে গেল সেই রাতে ইউনিয়ন হাউসের লজ রুমে–মদ্যপানের উৎসব। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হয়েছে। ক্রোহিল খনির ম্যানেজার আর ইঞ্জিনীয়ার বধ তো হয়েছেই, এ-তল্লাটের অন্যান্য ত্রাসকম্পিত কোম্পানির লাইনেও এতদিনে আনা গেল এই কোম্পানিটিকেও প্রত্যেককে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে, এবার একেও করা হবে। এ ছাড়াও লজের সুদূরপ্রসারী বিজয় গৌরবও নেহাত কম নয়। জেলা প্রতিনিধি বাইরে থেকে যেমন পাঁচজনকে এনে ভারমিসায় রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তেমনি ভারমিসা লজেরও তিনজনকে তলব করা হয়েছিল স্টেকরয়ালে উইলিয়াম হে-কে নিধনের জন্যে। লোকটা গিলমারটন জেলার নামকরা এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় খনি-মালিক। অজাতশত্রু পুরুষ–কারণ অন্নদাতা হিসেবে অতুলনীয়। একটা অপরাধ তিনি করেছেন। কাজে নৈপুণ্যর ওপর চাপ দিয়েছেন। গাফিলতির দায়ে কয়েকজনকে ছাঁটাই করেছেন। ঘরের দরজায় কফিন নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও যখন আক্কেল হয়নি তখন সুসভ্য, স্বাধীন এই সমাজে তার মরা ছাড়া আর পথ ছিল না। রায় বেরিয়েছিল প্রাণদণ্ডের।

জল্লাদ গিয়ে দিয়ে এসেছে সেই প্রাণদণ্ড। দলের নেতা হয়ে গিয়েছিল টেড বড়ইন–এখন সে-সম্মানে বসে আছে বডিমাস্টারের পাশে। মুখ টকটকে লাল, চোখ রাঙা–সারারাত না-ঘুমিয়ে মদ খাওয়ার লক্ষণ। দুই সঙ্গীকে নিয়ে সে সারারাত কাটিয়েছে পাহাড়ে পাহাড়ে। চুল উশকোখুশকো, পোশাক অবিন্যস্ত, খোলা প্রকৃতির দৌরাত্মের ছাপ ফেলেছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু যুদ্ধ জয় করে এসে এমন অভ্যর্থনা আর কোনো কমরেড পায়নি। একই কাহিনি বার বার শুনেও তৃপ্তি হচ্ছে না কারুর, হাসি উল্লাসে ফেটে পড়ছে প্রত্যেকেই। ঘাতক দল দাঁড়িয়েছিল একটা খাড়া পাহাড়ের চূড়ায়। রাত হতেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তি ঘোড়ায়

চড়ে বাড়ি ফিরছিল সেই পথে। ঠান্ডায় এমন জমে গিয়েছিল বেচারা যে পিস্তলে হাত পর্যন্ত দিতে পারেনি। এরা তাকে টেনে নামিয়ে পর-পর গরম গুলি ঢুকিয়েছে বুকের মধ্যে।

তিনজনের কেউই তাকে চেনে না। কিন্তু নরহত্যার মধ্যে যে অন্তহীন নাটক আছে, সেই নাটকীয়তা দিয়ে গিলমারটন স্কোরারস-দের বুঝিয়ে দেওয়া গেল ভারমিসাতেও কাজের লোক আছে। খুন-খারাপির ব্যাপারে তাদের ওপরেও ভরসা রাখা যায়। এই সময়ে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। মনের সুখে নিস্পন্দ দেহের মধ্যে রিভালবারের সবক-টা গুলি ঢুকিয়ে দিতে যখন ওরা মশগুল, ঠিক সেই সময়ে একটা লোক তার বউকে নিয়ে এসে পড়ে সেখানে। তৎক্ষণাৎ তাদেরও গুলি করার কথা উঠেছিল। কিন্তু যেহেতু তারা খনির সঙ্গে যুক্ত নয়, নিরীহ মানুষ তাই স্রেফ হুমকি দিয়ে পথ দেখতে বলা হয় দু-জনকে চেঁচামেচি করলে ফলটা ভালো হবে না। তারপর এরা গা ঢাকা দেয় পাহাড়ে। ফার্নের আর গাদ স্কুপের কিনারা থেকেই শুরু হয়েছে বন্য প্রকৃতি। সেখানকার উদ্দামতায় হারিয়ে যায় প্রতিহিংসা পাগল মহান তিন নরঘাতক পাথর কঠিন অন্নদাতাদের হৃদয় কাঁপানোর জন্যে রক্তাক্ত লাশটা পড়ে থাকে শুধু পাহাড়ের গায়ে।

তাই বিজয়োৎসবে মত্ত হয়েছে স্কোরারস-রা। দিনটা স্মরণীয় তাদের কাছে। আগের চাইতেও মরণের ছায়া আরও গাঢ় হয়েছে সারাউপত্যকায়–কুটিল হয়েছে আতঙ্কমেঘ। কিন্তু সেনাপতিরা ঝোপ বুঝে কোপ মারে মনের মতো মুহূর্ত পেলে আক্রমণ দ্বিগুণবেগে চালিয়ে যায়–শত্রু যাতে সামলে নেওয়ার ফুরসত না-পায়। বস ম্যাকগিন্টিও পাকা সেনাপতি। রণক্ষেত্রের দৃশ্যটা মনের চোখে দেখে নিয়ে পথের কাঁটাদের ওপর নতুন

আঘাত হানবার পরিকল্পনা ঠিক করে নিল তখুনি। তার চিন্তাকুটিল বিদ্বেষ-বিষে আচ্ছন্ন ভয়ংকর চাহনি যার ওপর পড়ে তার আর রক্ষে নেই। সেই রাতেই প্রায় মাতাল স্যাঙাতরা বিদেয় নিলে পর ম্যাকমুর্দোর বাহু স্পর্শ করে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরের ঘরে–এই ঘরেই প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল দু-জনের।

বললে, ছোকরা, তোমার উপর্যুক্ত একটা কাজ পাওয়া গেছে। কাজটা তোমাকে নিজের হাতে করতে হবে।

এ তো গর্বের কথা, জবাব দিলে ম্যাকমুর্দো।

ম্যানডাস আর রিলি–এই দু-জনকে সঙ্গে নেবে তুমি। চাকরিতে এদের ধমকানো হয়েছে–চাকরি যেতে পারে এমনি হুমকি দেওয়া হয়েছে। চেস্টার উইলকক্সের লাশ না-ফেলা পর্যন্ত এ-তল্লাটে কাজের কাজ কিছুই করা হচ্ছে না–কয়লাখনি অঞ্চলের প্রত্যেকটা লজ তোমাকে বাহাদুর বলবে এ-কাজ যদি করতে পারো।

আমার সাধ্যমতো আমি করব। লোকটাকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে?

দাঁতের ফাঁক থেকে আধপোড়া, আধচোষা অষ্টপ্রহরের সঙ্গী চুরুটটা সরিয়ে নিয়ে নোট বইয়ের ছেঁড়া পাতায় নকশা আঁকতে লাগল ম্যাকগিন্টি।

চেস্টার উইলকক্স হল আয়রন ডাইক কোম্পানির চিফ ফোরম্যান। একের নম্বরের উঁদে, লোহাপেটা শরীর, আগে যুদ্ধে ছিল, সারাগায়ে কাটার দাগ। লোকটাকে দু-বার খতম করতে গিয়ে দু-বারই ব্যর্থ হয়েছি–জিম কারনাওয়েকে জান দিতে হয়েছে এইজন্যে। এবার তোমার পালা। ম্যাপ খুলে আয়রন ডাইক ক্রসরোডের মুখে এই যে বাড়িটা দেখছ, এইখানে ও থাকে। নিরালা বাড়ি। ধারেকাছে কেউ থাকে না। দিনের বেলা সুবিধে করতে পারবে না। কাছে পিস্তল রাখে, ভীষণ তাড়াতাড়ি সোজাসুজি গুলি চালায় জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে না। কিন্তু রাত্রে তোমার পোয়াবারো। বউ, তিন ছেলে-মেয়ে আর একজন ঠিকে মেয়েছেলে ছাড়া বাড়িতে কেউ থাকে না। বাছবিচার করলে চলবে না। হয় সবাইকে ঘায়েল করতে হবেনয় সবাইকে ছেড়ে দিতে হবে। সদর দরজায় বোমার বারুদ রেখে পলতেতে আগুন ধরিয়ে দিলে—

তার অপরাধ?

বললাম না জিম কার্নাওয়েকে গুলি করেছে।

গুলি করল কেন?

আরে গেল যা! নিয়ে তোমার দরকার কী? রাতে বাড়িতে ঢুকেছিল কানাওয়ে–গুলি খেয়েছে সঙ্গেসঙ্গে। এর বেশি কিছু তোমার আমার জানার দরকার নেই। বদলা তোমাকে নিতে হবে।

মেয়েছেলে দু-জন আর বাচ্চা তিনটের ওপরেও?

নইলে ওকে তো ঘায়েল করতে পারবে না!

কিন্তু ওরা কী দোষ করেছে? অবিচার হয়ে যাচ্ছে না?

এ আবার কী কথা? রাজি নও মনে হচ্ছে?

আস্তে, কাউন্সিলর, আস্তে। কী এমন বলেছি যা থেকে ধরে নিলেন বডিমাস্টারের হুকুম মানতে রাজি নই আমি? ন্যায়-অন্যায় বিচার করবেন আপনি।

তাহলে যাচ্ছ?

আলবত।

কবে?

দু-একটা রাত সময় দিন। বাড়িটা নিজের চোখে দেখে প্ল্যান করতে হবে তো। তারপর–

ঠিক আছে, ম্যাকমুর্দোর সঙ্গে করমর্দন করে বলে ম্যাকগিন্টি। সব ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। খবরটা আসার পর জানবে বিরাট উৎসব হবে তোমাকে নিয়ে। এইটাই

হবে এ-অঞ্চলে আমাদের চরম আঘাত এরপর প্রত্যেকেই দেখবে পা জড়িয়ে ধরবে আমাদের।

হঠাৎ-পাওয়া গুরুদায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করল ম্যাকমুর্দো। লাগোয়া একটা উপত্যকায় মাইল পাঁচেক দূরে নিরালা বাড়িতে থাকে চেস্টর উইকলক্স। সেই রাতে একলাই বেরিয়ে পড়ল তোড়জোড় করতে। ফিরে এল দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই। পরের দিন কথা বললে দুই স্যাঙাতের সঙ্গে।

ম্যানডার্স আর রিলি দু-জনেই উচ্চুঙ্খল ছোকরা যেন হরিণ শিকারে যাচ্ছে এমনি উকট উল্লাস দেখা গেল দু-জনেরই কথাবার্তায়। দু-রাত পরে শহরের বাইরে একত্র হল তিনজনে–সশস্ত্র প্রত্যেকেই একজনের হাতে একটা থলি ভরতি বোমা আর বারুদ। নিরালা বাড়িটায় পোঁছোল রাত দুটোয়। জোর হাওয়া বইছে, শুক্লপক্ষের চাঁদের ওপর দিয়ে ভেঁড়া মেঘ দ্রুত ভেসে যাচ্ছে। ব্লাডহাউন্ড কুত্তা থাকতে পারে আগেই জানা ছিল বলে পিস্তলের ঘোড়া তুলে এগোচ্ছে তিনজনে পা টিপে টিপে। কিন্তু ঘোড়া হাওয়ায় গোঁ-গোঁ শব্দ আর মাথার ওপর দুলন্ত ডালের শব্দ ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। সদর দরজায় পৌঁছে কান খাড়া করেও কোনো আওয়াজ পেল না ম্যাকমুর্দো। ভেতরে সব চুপচাপ। বারুদের থলি দরজায় ঠেস দিয়ে রেখে ছুরি দিয়ে ফুটো করল থলির গায়ে ঢুকিয়ে দিল পলতে। আগুন লাগিয়ে তিনজনে ছুটতে ছুটতে চলে এল বেশ খানিকটা তফাতে একটা নালির মধ্যে। তারপরেই ঘটল বিস্ফোরণ। কানের পর্দা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল, গুর গুর দুমদাম শব্দে ভেঙে পড়তে লাগল গোটাবাড়িটা। আওয়াজ শুনেই বোঝা গেল কাজ হাসিল হয়েছে। সমিতির রক্ত-কলঙ্কিত ইতিহাসে এর চাইতে

পরিচ্ছন্ন কাজের নজির আর নেই। কিন্তু হায়রে! এমন একটা সুপরিকল্পিত আর সুসংগঠিত অভিযানের শেষটার কিন্তু পাওয়া গেল একটি অশ্বডিম্ব! অন্যান্য হত্যাকাণ্ড দেখে হুঁশিয়ার হয়েছিল চেস্টার উইলকক্স, জানত তাকেও একদিন খতম করবে ঘাতকরা, তাই এমনই কপাল যে ঠিক আগের দিন সপরিবারে পালিয়েছে নিরাপদ অঞ্চলে রয়েছে পুলিশ পাহারায়। বোমার বারুদে গুঁড়িয়েছে শূন্য ভবন। যুদ্ধফেরত পুঁদে অফিসার আয়রন ডাইক খনিশ্রমিকদের নিয়মানুবর্তিতা শিখিয়ে চলেছে আগের মতোই।

ম্যাকমুর্দো বলেছিল, ওকে আমার ওপর ছেড়ে দিন। যা করবার আমি করব। বছর ঘুরে গেলেও জানবেন ওর নিস্তার নেই।

লজের প্রত্যেকে ভোটের মাধ্যমে প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল এবং ম্যাকমুর্দোর প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করেছিল। কাজেই তখনকার মতো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়েছিল সেইখানে। কয়েক সপ্তাহ পরেই খবরের কাগজে একটা খবর বেরুল। ওত পেতে বসে ছিল গুপ্তঘাতক। উইলকক্সকে অতর্কিতে গুলি মেরেছে সে। এ-খবর যখন বেরুল, তখন কিন্তু সবাই জানত অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে ম্যাকমুর্দো।

ফ্রিম্যান-সমিতির কাজকারবারই এইরকম। কাজ সারবার পদ্ধতিও অদ্ভুত। এইভাবেই স্কোরারসরা সুদীর্ঘকাল ধরে আতঙ্ক বিস্তার করে চলেছে বিশাল এই উপত্যকায়। প্রতিটি মানুষকে শিহরিত রেখেছে তাদের ভয়াবহ অস্তিত্বের রক্ত-হিম-করা বিজ্ঞপ্তি মারফত। এদের রুধিররঞ্জিত কাহিনি দিয়ে আরও কয়েক পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করার আর দরকার আছে কি? এদের কর্মকাণ্ড আর কুকর্মের নায়কদের সম্বন্ধে যথেষ্ট বলা কি হয়নি? ইতিহাসে

লেখা হয়ে গেছে কীর্তিকলাপ। কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ সমন্বিত বহু নথিপত্র পাওয়া যাবে যদি খোঁজা যায়। এই নথি পড়লেই জানা যাবে পুলিশম্যান হান্ট আর ইভান্সকে ঠান্ডা মাথায় গুলি করে মারার মর্মন্তুদ কাহিনি। ঘটনাটা ঘটেছিল ভারমিসায়–প্ল্যান করেছিল লজের নরমেধ যজ্ঞের সেনানীরা। সোসাইটির দু-জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করছিল পুলিশ দু-জন। তাই সম্পূর্ণ অসহায় নিরস্ত্র অবস্থায় ডবল নরহত্যা করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে লজের নরপিশাচরা! এই নথিপত্রেই পাওয়া যাবে মিসেস লারবিকে গুলি করে মারার লোমহর্ষক কাহিনি। ভদ্রমহিলা তখন শুশ্রূষা করছিলেন অসুস্থ স্বামীকে। বস ম্যাকগিন্টির হুকুমে প্রায় পিটিয়ে হত্যা করা হয় স্বামী ভদ্রলোককে। সেই শীতেই পর-পর আরও কয়েকটি নরহত্যায় শিউরে ওঠে সমস্ত উপত্যকা। প্রবীণ জেনকিন্সকে খতম করার পরেই শেষ করা হয় তার ভাইকে, মেরে হাড়গোড় ভেঙে লাশ বিকৃত করে ফেলা হয় জেমস মুরডকের, বোমা বিস্ফোরণে শেষ করে দেওয়া হয় গোটা স্ট্যাপহাউস পরিবারকে, নৃশংসভাবে খুন করা হয় স্টেনড্যালসকে। আতঙ্কের কালোছায়া আরও গাঢ়ভাবে চেপে বসে ভ্যালি অফ ফিয়ারে; শীত গেল, এল বসন্ত। ফলে ফুলে ভরে উঠল গাছ, ঝিরঝির ধারায় বয়ে চলল নিঝরিণী। লোহার থাবার মধ্যে থেকেও আশার বাণী নিয়ে জাগ্রত হল প্রকৃতি কিন্তু তিলমাত্র আশার অনুরণন জাগল না আতঙ্ক ছায়ায় ম্রিয়মাণ নরনারীর অন্তরে। ১৮৭৫ সালের গ্রীষ্মের শেষে মাথার ওপরে ঝুলন্ত মেঘ যে নৈরাশ্য আর তমিস্র বয়ে এনেছিল তেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি অভিশপ্ত সেই উপত্যকার।

বিপদ

চরমে উঠল সন্ত্রাসের রাজত্ব। ম্যাকমুর্দো এখন ইনার ডীকন নিযুক্ত হয়েছে। যেকোনো দিন

বডিমাস্টার ম্যাকগিন্টির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তার পরামর্শ আর সাহায্য ছাড়া উপদেষ্টা পরিষদ এখন এক পা-ও চলে না। সঙ্গীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গেসঙ্গে রাস্তাঘাটে বেরুলেই ম্যাকমুর্দোর প্রতি জনসাধারণের প্রাকুটি নিক্ষেপ বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষ্ণতর হয়েছে ঘৃণামিশ্রিত চাহনি। আতঙ্ক অবশ্য চিত্তেও কিন্তু শহরবাসীরা অত্যাচারীকে আঘাত হানবার জন্যে জোট বাঁধতে চেয়েছে গোপনে, সাহস এনেছে মনে। হেরাল্ড অফিসে নাকি গোপন-সভা বসেছিল এবং আইন-ভক্ত নাগরিকদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বিলি করা হয়েছে, এমন গুজবও এসেছে লজে। কিন্তু এসব গুজবে কান দেয়নি বস ম্যাকগিন্টি আর স্যাঙাতরা কানাঘুসোয় বিচলিত হবার পাত্র তারা নয়। সংখ্যায় তারা অগণিত, দৃঢ়চিত্ত এবং সশস্ত্র। শত্রুপক্ষ বিক্ষিপ্ত এবং শক্তিহীন। অতীতের মতো এবারও এই আন্দোলন স্রেফ লক্ষ্যহীন গুলতানি আর কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ধরপাকড়ের মধ্যে দিয়েই নিশ্চয় শেষ হবে। ম্যাকগিন্টি ম্যাকমুর্দো এবং লজের অন্যান্য ডাকাবুকো সদস্যরা একবাক্যে প্রকাশ করল এই অভিমত।

মে মাস। শনিবারের সন্ধে। শনিবারেই মিটিং বসে লজের। ম্যাকমুর্দো বেরুতে যাচ্ছে বাড়ি থেকে মিটিংয়ে যাবে বলে, এমন সময়ে দেখা করতে এল দুর্বলচিত্ত মরিস। ভুরু চিন্তাক্লিষ্ট, সৌম্য, মুখখানি উৎকণ্ঠায় কালো, উদ্ভ্রান্ত।

মি. ম্যাকমুর্দো, মন খুলে কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে?

নিশ্চয়।

একদিন আপনাকে আমার প্রাণের কথা বলেছিলাম, বস ম্যাকগিন্টি নিজে এসে জিজ্ঞেস করেও আপনার পেট থেকে তা বার করতে পারেনি। আমি তা ভুলিনি মি. ম্যাকমুর্দো।

আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন বলেই বলতে পারিনি। আপনার সঙ্গে একমত হয়েছিলাম বলে মুখ খুলিনি ভাববেন না যেন।

তা জানি, ভালোভাবেই জানি। কিন্তু কী জানেন আপনি একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলেও নিরাপদে থাকা যায়। নিজের বুকে হাত রেখে বললে মরিস, এইখানে একটা গুপ্তকথা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে জ্বলেপুড়ে মরতে বসেছি। খবরটা আমার কানে না-এসে আপনাদের কারুর কানে গেলে বাঁচতাম। কিন্তু আমি যদি বলি, রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে আরও খুন হবে। যদি না-বলি, আমাদের প্রত্যেকের দিন ফুরিয়েছে জানবেন। ভগবান ছাড়া এই সমস্যা থেকে কেউ আর আমাদের উদ্ধার করতে পারবে না। আমার মাথায় আসছে না কী করা উচিত এখন।

তীক্ষ্ম চোখে মরিসকে লক্ষ করছিল ম্যাকমুর্দো। আপাদমস্তক থরথর করে কাঁপছে বেচারার। গেলাসে হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দেয় ম্যাকমুর্দো।

বলে, এই তো আপনাদের শরীরে অবস্থা! নিন, খান, তারপর বলুন।

এক নিশ্বেসে গেলাস খালি করে দেয় মারিস। বলে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে, এক কথায় খবরটা এই–পেছনে একজন ডিটেকটিভ লেগেছে।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে ম্যাকমুর্দো।

মাথা খারাপ হল নাকি? পুলিশ আর ডিটেকটিভে চেয়ে ফেলেছে যে-জায়গা, সেখানে পুলিশকে ভয় পাওয়ার কী আছে?

আরে না, জেলার পুলিশের কথা আমি বলছি না। ওদের আমি চিনি–কিসু করতে পারবে না, কিন্তু পিনকারটনের নাম শুনেছেন?

ওই নামের কিছু লোকের কাহিনি আমি পড়েছি।

এরা যদি পেছনে লাগে, পাঁয়তারা কষবারও সুযোগ পাওয়া যায় না জানবেন। এ সরকারি তদন্ত নয়। হলে হল না-হলে নাহল গোছের মনোবৃত্তি এদের নয়। এরা ফল

ছাড়া আর কিছু চায় না এবং যেন-তেন-প্রকারেণ সেই ফল লাভের জন্যে লেগে থাকে পেছনে। পিনকারটন ডিটেকটিভ যদি পেছনে লাগে তো জানবেন আমাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

খুন করলেই হল।

আমিও প্রথমে তাই ভেবেছিলাম। লজেও সবাই তাই ভাববে। বললাম না খবর দিলেই রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে! আরও খুন হবে!

তাতে কী? খুন তত আকছার হচ্ছে এ-অঞ্চলে। খুন কি একটা নতুন ব্যাপার?

তা ঠিক। কিন্তু আমি নিমিত্ত হতে চাই না। আমি চিনিয়ে দেবার পর একজন খুন হবে, এ আমি চাই না। জীবনে শান্তি পাব না। অথচ আমাদের ঘাড়ের ওপরেও মাথা থাকবে না এমনি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। হা ঈশ্বর! কী করি আমি? সামনে পেছনে দুলতে দুলতে চরম দোটানায় পড়ে যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে মরিস।

কথাগুলো কিন্তু গভীরভাবে নাড়া দিল ম্যাকমুর্দোকে। বেশ দেখা গেল, বিপদ সম্পর্কে এবং বিপদের মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে একই মত সে পোষণ করছে মরিসের সঙ্গে। তাই মরিসের কাঁধ খামচে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠল প্রায় চিলের মতো আরে মশাই, চুপচাপ বসে ভেবে আকুল হয়ে কোনো লাভ আছে কি?

জানেন তা বলুন। লোকটা কে? এখন সে কোথায়? কীভাবে জানলেন তার খবর? আমার কাছেই-বা এলেন কেন?

একমাত্র আপনিই এ-বিপদে আমাকে পরামর্শ দিতে পারেন জেনেই এসেছি আপনার কাছে। আগেই বলেছি আপনাকে, এখানে আসার আগে পূর্বাঞ্চলে একটা দোকান ছিল আমার। অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের অভাব নেই সেখানে এদের একজন কাজ করে টেলিগ্রাফ অফিসে। গতকাল তার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়েছি। চিঠির মাথায় যেটুকু আছে পড়ুন।

ম্যাকমুর্দো যা পড়ল, তা এই :

ও তোমাদের ওদিকে স্কোরারস-দের হালচাল কীরকম? কাগজে এদের অনেক কাহিনিই পড়ছি। শুধু তোমাকেই বলি, খুব শিগগিরই আরও খবর তোমার মুখে শোনার আশা করছি। পাঁচটা বড়ো কর্পোরেশন আর দুটো রেলকোম্পানি এই অরাজকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। খুব শিগগিরই দেখবে খেলা আরম্ভ হয়েছে। অনেক এগিয়েছে এর মধ্যে। পিনকারটন নিজে লোক লাগিয়েছেন এদের হুকুমমতো। ওঁর সেরা গোয়েন্দা বার্ডি এডোয়ার্ডস কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এই অনাচারের ইতি হতে আর দেরি নেই।

এবার পুনশ্চটা পড়ুন।

কাজের মধ্যে ডুবে থাকি বলেই অনেক রকম সংকেতলিপি চোখে পড়ে! অদ্ভুত সেইসব গুপ্ত সংকেতের মানে সাধারণ চোখে পড়ে না। আমি যা জেনেছি, তা যেন আর কেউ na-জানে।

অস্থির হাতে চিঠিখানা নাড়াচাড়া করতে করতে নিশ্চুপ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল ম্যামুর্দো। ক্ষণেকের জন্যে সরে গেছে কুয়াশার পর্দা সামনে দেখা যাচ্ছে নিতল খাদ।

শুধোয়, আর কেউ জানে এ-চিঠির কথা?

কাউকে বলিনি।

কিন্তু আপনার এই বন্ধু চেনা-জানা আর কাউকে লেখেননি তো?

সে-রকম চেনা-জানা আরও দু-একজন এ-তল্লাটে আছে বটে।

লজের মেম্বার?

হতে পারে।

বার্ডি এভোয়ার্ডস দেখতে কীরকম, হয়তো আর কাউকে লিখেছেন আপনার বন্ধু। জানা থাকলে খুঁজে বের করতে সুবিধে হত। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।

তা হত ঠিকই কিন্তু অত খবর আমার বন্ধু জানে বলে মনে হয় না। কাজ করতে করতে চোখে যা পড়েছে, তাই লিখেছে। পিনকারটন ডিটেকটিভকে দেখতে কীরকম জানব কী করে?

ভীষণ চমকে ওঠে ম্যাকমুর্দো।

আরে সর্বনাশ! বুঝেছি কে। কী বোকা আমি, আগেই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু কপাল ভালো আমাদের! ঠিক আছে, দিচ্ছি বাছাধনকে টিট করে। মরিস, এ-ব্যাপার আমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছেন কিনা বলুন।

নিশ্চয়। কিন্তু আমাকে এর মধ্যে রাখবেন না।

কথা দিলাম। আপনি সরে দাঁড়ান আপনার কোনো দায়িত্ব আর নেই–যা করবার আমি করব। আপনার নাম পর্যন্ত প্রকাশ পাবে না। সব ঝুঁকি আমি নিলাম চিঠিখানা যেন আমিই পেয়েছি–আপনি নন। খুশি?

আমি তাই বলতে যাচ্ছিলাম।

তাহলে সব আমার ওপর ছেড়ে দিন, মুখে চাবি দিয়ে রাখুন। লজে চললাম। পিনকারটনের আক্কেল দাঁত গজিয়ে ছাড়ছি।

খুন করবেন নাকি?

দোস্ত মরিস, খবর যত কম জানবেন, ততই পরিষ্কার থাকবে আপনার বিবেক, ঘুম হবে ভালো। প্রশ্ন করবেন না, দেখুন কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। যা ঘটবার তা ঘটবে। দায়দায়িত্ব আমার।

যাওয়ার আগে বিষণ্নভাবে মাথা নেড়ে গেল মরিস।

বললে ভাঙা গলায়, বেশ বুঝেছি, লোকটার রক্তে হাত রাঙিয়ে গেলাম।

কুটিল হেসে বললে ম্যাকমুর্দো–আত্মরক্ষার নাম নরহত্যা নয়। এ-লোক যদি খুশিমতো ঘুরে বেড়ায় উপত্যকায়, আমরা কেউ নিরাপদ নই। সবাইকে শেষ করে ছাড়বে একাই। ব্রাদার মরিস, লজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আপনি কিন্তু বডিমাস্টার নির্বাচিত হতে পারেন।

মুখে পরিহাস করলেও ম্যাকমুর্দোর কার্যকলাপ দেখে বোঝা গেল উটকো উৎপাত এই লোকটিকে নিয়ে সে যথেষ্ট সিরিয়াস। নিজের মনে পাপ থাকার জন্যেই হোক, পাঁচ পাঁচটা শক্তিশালী সমৃদ্ধ কর্পোরেশন এক জোট হয়ে স্কোরারসদের সাফ করে দেওয়ার খবর কানে আসার দরুনই হোক–চরম অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার মতোই তৎপর হতে দেখা গেল তাকে। নিজেকে দোষী প্রতিপন্ন করা যায়, এ-রকম সব কাগজ পুড়িয়ে

ফেলল বাড়ি ছেড়ে বেরোনোর আগে। কাগজপত্র ধ্বংস করে বেশ বড়ো রকমের একটা তৃপ্তির নিশ্বেস ফেলেও মনে হল বোধ হয় বিপদ এখনও কাটেনি, তাই লজে যাওয়ার পথে গেল বুড়ো শ্যাফটারের বাড়ি। যদিও এ বাড়িতে প্রবেশ তার নিষেধ, কিন্তু জানলায় টোকা মারতেই এটি বেরিয়ে এল বাইরে। দেখল, প্রিয়তমের দুই চোখ থেকে উধাও হয়েছে আইরিশ শয়তানির নাচানাচি। মুখভাব সিরিয়াস। দেখেই বুঝল এট্টি, বিপদে পড়েছে ম্যাকমুর্দো।

শুধোল উদবিগ্ন কণ্ঠে, কী হয়েছে, জ্যাক? কী হয়েছে তোমার? ঝামেলায় পড়েছ নিশ্চয়?

খুব একটা সাংঘাতিক কিছু নয়। তবুও সময় থাকতেই সরে পড়া দরকার।

সরে পড়ার কথা বলছ?

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, সময় হলেই এ-তল্লাট ছেড়ে চলে যাব। সেই সময় এখন আসছে বলেই মনে হচ্ছে। আজ রাতেই একটা খবর পেয়েছি। খুবই খারাপ খবর বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

পুলিশ নাকি?

পিনকারটন। কিন্তু অতকথা জানবার তোমার দরকার নেই, সখী। আমাদের মতো লোকদের কাছে পিনকারটন মানে কী, তাও শোনবার দরকার নেই। খুব জড়িয়ে পড়েছি

এইসব ঝামেলায়, তাই যত তাড়াতাড়ি কেটে বেরিয়ে যেতে পারি, ততই মঙ্গল। তুমি বলেছিলে, আমি গেলে আমার সঙ্গে তুমি আসবে।

জ্যাক, তাহলেই জানবে বেঁচে গেল এ-যাত্রা।

এট্টি, কয়েকটা ব্যাপারেও আমি কিন্তু সৎ– অসততার চিহ্ন পাবে না আমার মধ্যে। বিশ্ব যদি একদিকে থাকে, আর আমি একদিকে তাহলেও জানবে তোমার কেশাগ্র ছুঁতে দেব না কাউকে, মেঘলোকের যে সোনার সিংহাসনে তোমাকে বসিয়েছি–কোনোদিন সেই আসন থেকে আমার চোখে তুমি বিচ্যুত হবে না। বিশ্বাস করবে আমাকে?

মুখে একটি কথাও বলল না এট্টি–শুধু হাত রাখল প্রিয়তমের হাতে।

তাহলে যা বলি শোনো এবং সেইমতো কাজ করো–এ ছাড়া জানবে বাঁচবার পথ আর নেই। শিগগিরই অনেক কিছু ঘটতে চলেছে এই উপত্যকায় আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তা অনুভব করছি। আমাদের অনেককেই পালাতে হবে এখান থেকে আমি তাদের একজন। দিনে বা রাতে যখনই যাই না কেন, তোমাকে আসতে হবে আমার সঙ্গে।

আসব জ্যাক, আমি আসব, তোমার পরেই আসব।

না, না, আমার সঙ্গে আসতে হবে। পরে নয়। এ-উপত্যকায় আর কোনোদিন ঢুকতে নাও পারি, তোমাকে ফেলে রেখে যাওয়া তাই সম্ভব নয় পুলিশের জ্বালায় হয়তো আর কখনো

খবর পর্যন্ত পাঠাতে পারব না। যেখান থেকে এখানে আমি এসেছি, সেখানে এক ভদ্রমহিলাকে আমি চিনি। অত্যন্ত ভালো মানুষ। তার কাছেই তুমি থাকবে আমাদের বিয়ে না-হওয়া পর্যন্ত। আসবে?

আসব জ্যাক, নিশ্চয় আসব।

আমার ওপর তোমার এই বিশ্বাসের জন্যে ভগবান তোমার ভালো করবেন। শোনন, খবর পেলেই সব ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে সোজা চলে আসবে ডিপোর ওয়েটিং হলে আমি না-আসা। পর্যন্ত থাকবে। খবর পাঠাব খুব অল্প কথায়–কিন্তু সে-খবর যদি একটা শব্দও হয় সব ফেলে চলে আসবে।

দিনে অথবা রাতে যখন ডাকবে, আমি আসব, জ্যাক।

পলায়নের প্রস্তুতিপর্ব এইভাবে শুরু করে এবং মনে মনে অনেকটা হালকা হয়ে লজে গেল ম্যাকমুর্দো! সদস্যরা এসে গেছে অনেকেই। চিহ্ন আর পালটা চিহ্ন বিনিময় করে ভেতরের আর বাইরের প্রহরীদের বেড়াজাল পেরিয়ে হল ঘরে ঢুকল ম্যাকমুর্দো। স্বাগত সম্ভাষণের সানন্দ গুঞ্জরণে মুখরিত হল কক্ষ। তিলধারণের জায়গা নেই সুদীর্ঘ ঘরে, চুরুটের ধোঁয়ার ঝাঁপসা আবরণের মধ্যে দেখা গেল বডিমাস্টারের কালো চুলের জটা, বলডুইনের নৃশংস বৈরী মুখচ্ছবি, হ্যারাওয়ের শকুনি মুখ এবং লজের নেতৃস্থানীয় আরও ডজনখানেক মুখ! এতগুলি মানুষের সামনে খবরটা প্রকাশ করতে পারবে দেখে আনন্দে উল্লসিত হল ম্যাকমুর্দো।

সোল্লাসে বললে চেয়ারম্যান, এসো ব্রাদার এসো। একটা ঝামেলা করছে–বড়ো বিচারক দরকার!

ম্যাকমুর্দো আসন গ্রহণ করতেই বুঝিয়ে দিলে পাশের লোক, ল্যান্ডার আর ইগানের মধ্যে ঝগড়া লেগেছে। স্টাইলসটাউনে বুড়ো ক্যাবিকে খুন করার পারিতোষিকটা দু-জনেই দাবি করছে। বুলেটটা ছুঁড়েছে কে, সমস্যা সেইটাই।

উঠে দাঁড়াল ম্যাকমুর্দো। হাত তুলল। মুখের ভাব দেখেই আকৃষ্ট হল প্রত্যেকে। চাপা গুঞ্জন শোনা গেল ঘরময় নতুন কিছু শোনবার প্রত্যাশায়।

ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললে ম্যাকমুর্দো, শ্রদ্ধেয় হুজুর, জরুরি কথা আছে।

ম্যাকগিন্টি বললে, ব্রাদার ম্যাকমুর্দোর জরুরি কথা আছে। লজের নিয়ম অনুসারে দাবি মঞ্জুর হল। বলো কী বলবে।

পকেট থেকে চিঠিটা বার করল ম্যাকমুর্দো।

শ্রদ্ধেয় হুজুর এবং ভাইগণ, খুব খারাপ খবর এনেছি আজ রাতে। কিন্তু খবরটা না-জেনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগে জেনে গিয়ে সেইমতো তৈরি হওয়া ভালো। আমি একটা গোপন খবরে জেনেছি, যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচটা অত্যন্ত শক্তিশালী আর সমৃদ্ধ সংস্থা

একজোট হয়েছে আমাদের নিকেশ করার জন্য এবং এই মুহূর্তে বার্ডি এডোয়ার্ডস নামে একজন পিনকারটন ডিটেকটিভ এ-অঞ্চলে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে যাতে আমাদের অনেককে ফাঁসিকাঠে তুলতে পারে। বাকি সবাইকে গারদঘরে ঢুকিয়ে রাখতে পারে। এই ব্যাপার নিয়ে জরুরি আলোচনা দরকার।

ঘরের মধ্যে সূচীভেদ্য স্তব্ধতা। তারপর শোনা গেল চেয়ারম্যানের গলা।

ব্রাদার ম্যাকমুর্দো প্রমাণ কী?

প্রমাণ এই চিঠি হাতে এসেছে একটু আগে। বলে অনুচ্ছেদটা উচ্চকণ্ঠে পড়ে শোনায় ম্যাকমুর্দো। কথা দিয়েছি বলেই এ-চিঠি আপনাদের হাতে দিতে পারছি না, চিঠি সম্বন্ধে এর বেশি একটা কথাও আর বলতে পারব না। এছাড়া আর কোনো কথাও নেই। যেভাবে এ-কেস এসেছে আমার কাছে, সেইভাবেই হাজির করলাম আপনাদের কাছে।

একজন বয়স্ক ব্রাদার বললে, মি. চেয়ারম্যান, বার্ডি এডোয়ার্ডসের নাম আমি শুনেছি। পিনকারটন সার্ভিসের সবসেরা গোয়েন্দা হিসেবে তার সুনাম আছে।

তার চেহারা দেখে চিনতে পারবে এমন কেউ আছে এখানে? শুধোয় ম্যাকগিন্টি।

আমি পারি, জবাব দেয় ম্যাকমুর্দো।

বিস্ময়ের গুঞ্জর ভেসে যায় ঘরময়।

চোখে-মুখে উল্লাসের হাসি ভাসিয়ে আরও বলে ম্যাকমুর্দো, সে এখন আমাদের মুঠোর মধ্যে বললেই চলে। বুদ্ধিমানের মতো এখন যদি চটপট চড়াও হতে পারি, ঝটপট শেষ করে ফেলা যাবে ব্যাপারটা। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন, সাহায্য করেন–ভয়ের কোনো কারণ নেই জানবেন।

ভয়টা কীসের? আমাদের কাজকারবার সে জানবে কী করে?

কাউন্সিলর, আমরা প্রত্যেকেই আপনার মতো শক্ত হলে ও-কথা মানাত। কিন্তু এ-লোকের পেছনে ধনকুবেরদের কোটি কোটি টাকার শক্তি কাজ করেছে। টাকায় কেনা যায় না এমন দুর্বলচিত্ত ব্রাদার কি এই লজে নেই মনে করেছেন? সব খবরই সে পাবে এতদিনে হয়তো পেয়েও গেছে। ওষুধ এখন একটাই।

এ-উপত্যকা ছেড়ে সে যেন বাইরে যেতে আর না-পারে, বললে বলডুইন।

মাথা হেলিয়ে সায় দেয় ম্যাকমুর্দো।

বললে, ব্রাদার বলডুইন, অনেক ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল হয়নি। আজ রাতে কিন্তু তুমি আমার মনের কথা বলেছ।

কোথায় সে? চিনব কী করে?

শ্রদ্ধেয় হুজুর, সাগ্রহ কণ্ঠে বলল ম্যাকমুর্দো। বিষয়টা গুরুতর। প্রকাশ্যভাবে আলোচনা করা ঠিক নয়। আমাদেরই কোনো একজনকে আমি সন্দেহ করছি–ঈশ্বর যেন ক্ষমা করেন সেজন্যে। কিন্তু কথাটা যদি ঘুণাক্ষরেও সেই লোকের কানে পৌঁছায়, তাহলে আমরা তার টিকি পর্যন্ত আর ধরতে পারব না। মি. চেয়ারম্যান, আমি প্রস্তাব করছি, আপনাকে ব্রাদার বলডুইনকে এবং আরও পাঁচজনকে নিয়ে একটি ট্রাস্টি কমিটি করা হোক। সেখানেই আমি জানি মন খুলে আলোচনা করতে পারব এবং কী করা উচিত তাও বলতে পারব।

সঙ্গেসঙ্গে গৃহীত হল প্রস্তাব। নির্বাচিত হল কমিটি! চেয়ারম্যান আর বলডুইন ছাড়াও কমিটিতে রইল শকুনি-মুখ সেক্রেটারি, হ্যারাও; নরপশু তরুণ গুপ্তঘাতক, টাইগার করম্যাক; কোষাধ্যক্ষ, কার্টার; এবং উইলাবি ভ্রাতৃদ্বয় ভয়শূন্য বেপরোয়া প্রকৃতির জন্যে যারা হেন কাজ নেই যা পারে না। লজের অধিবেশনে মদ খাওয়াটা একটা প্রথা। কিন্তু সেদিন এই পর্বটি সংক্ষেপে এবং প্রায় চুপচাপ সাঙ্গ হল। মাথার ওপর বিপদের কালোমেঘ দেখলে প্রাণে তার ফুর্তি থাকে না। এতদিন যে নির্মেঘ নির্মল আকাশের তলায় সবাই যা খুশি তাই করে বেড়িয়েছে, সেই আকাশ থেকে প্রতিহিংসা পাগল আইনের থাবা নেমে আসছে এই কল্পনাতেই অনেকের বুকে কাঁপন ধরল এই প্রথম। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকের প্রাণে শিহরন জাগিয়ে এরা অভ্যস্ত পালাবদলের কল্পনাও কখনো করেনি। তাই পালটা মার হঠাৎ এত কাছে এসে পড়েছে দেখে চমকিত

প্রত্যেকেই। সেই কারণেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল সবাই লজ ছেড়ে—শলা-পরামর্শ করতে বসল ট্রাস্টি কমিটি।

শুরু করো ম্যাকমুর্দো, বললে ম্যাকগিন্টি। সাতটি চেয়ারে পাথরের মতো বসে রইল সাতটি পুরুষ।

ম্যাকমুর্দো বললে, বার্ডি এডোয়ার্ডকে চিনি এইমাত্র বলেছি আপনাদের। সে যে স্বনামে এ-অঞ্চলে নেই, তা না-বললেও চলে। লোকটার সাহস আছে, কিন্তু মাথা পাগলা নয়। স্টিভ উইলসন—এই নাম নিয়ে উঠেছে হবসন্স প্যাঁচ-এ।

তুমি জানলে কী রে?

তার সঙ্গে গল্প করে। তখন কিন্তু ভাবিওনি, পরেও মাথায় আসেনি—এই চিঠিখানা হাতে পেতেই বুঝলাম সেই লোকই বটে। গত বুধবার গাড়িতে আলাপ। আমাকে বলল পেশায় সে সাংবাদিক। কথাটা বিশ্বাস করেছিলাম তখনকার মতো। এসেছে নিউইয়র্ক প্রেস পত্রিকার তরফ থেকে। স্কোরারস সম্পর্কে যত রকমের খবর আছে, সব তার চাই। পুরো ব্যাপারটা নাকি ওর ভাষায় একটা প্রকাশ্য অত্যাচার। অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞেস করল আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। উদ্দেশ্য : খবরের কাগজে ছাপানোর মতো খবর। কিন্তু বিশ্বাস করুন একটা বেফাঁস কথাও বলিনি। বলে কিনা, সম্পাদকের মনের মতো খবর হলে কাঁড়ি কাড়ি টাকা দেব। তখন এমন সব খবর দিলাম যা শুনলে খুশি হয় সে। পুরস্কার

স্বরূপ পেলাম বিশ ডলারের নোট। বললে, এর দশগুণ পাবে যদি আরও খবর আনতে পারো।

কী বললে তখন?

মুখে মুখে বানিয়ে বলে গেলাম রাশি রাশি গল্প।

সে যে আসলে খবরের কাগজের লোকই নয়, বুঝলে কী করে?

তা-ও বলছি। ও নেমে গেল হবসন্স প্যাঁচ-এ, আমিও নামলাম। টেলিগ্রাম ব্যুরোয় আমি যখন ঢুকছি, ও তখন বেরুচ্ছে।

বেরিয়ে যাওয়ার পর অপারেটর বলল আমাকে এ-জিনিসের ডবল চার্জ হওয়া উচিত। আমি বললাম ঠিক কথা। ফর্মটা দেখলাম। আগাগোড়া উদ্ভট কথা আমাদের কাছে চৈনিক ভাষা ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। ক্লার্কটা বললে, রোজ এইরকম একখানা টেলিগ্রাম পাঠায়। আমি বললাম–খবরের কাগজের বিশেষ খবর কিনা। পাছে আর কেউ মানে বুঝে ফেলে তাই সংকেতে খবর লেখে। অপারেটর নিজেও কিন্তু তাই ভেবেছিল। আমিও এর বেশি ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখন আর তা ভাবি না।

ম্যাকগিন্টি বললে, ধরেছ ঠিক। কিন্তু এখন কী করা উচিত বলে মনে হয় তোমার?

একজন বললে, এক্ষুনি গিয়ে খতম করে দিলেই হয়।

হ্যাঁ, হা যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই মঙ্গল।

ম্যাকমুর্দো বললে, কোথায় তাকে পাওয়া যাবে জানলেই বেরিয়ে পড়ব। হবসন্স প্যাঁচ-এ থাকে জানি, কিন্তু বাড়িটা চিনি না। একটা ফন্দি এঁটেছি, শুনবেন?

বলো।

কাল সকালে প্যাঁচ-এ যাব আমি। অপারেটরকে জপিয়ে ঠিক বার করে নেব সে কোথায় আছে। অপারেটর খুঁজে পাবে সহজেই। দেখা করে বলব, আমি নিজেই একজন ফ্রিম্যান। লজের সমস্ত গুপ্ত কথা ফাঁস করতে রাজি আছি, কিন্তু ভালো দাম দিতে হবে। বাজি ফেলে বলতে পারি, এ-টোপ সে গিলবেই। বলব কাগজপত্র আমার বাড়িতেই আছে। রাত দশটায় যদি আসে, তখন বাড়িতে আর কেউ থাকবে না বেরিয়ে যাবে যে যার কাজে–কিন্তু কাগজগুলো সেই ফাঁকে সে দেখে নিতে পারবে। লোকটা চতুর বুঝে নেবে। আমরাও তাকে কবজায় পাব।

তারপর?

তারপর কী করবেন, সে-প্ল্যান আপনার। বিধবা ম্যাকনামারার বাড়ি এমনিতে ফাঁকা। নিরিবিলি। ভদ্রমহিলার ধাত শক্ত, কানে একদম কালা। বাড়িতে থাকি শুধু আমি আর

স্ক্যানল্যান। লোকটা যদি কথা দেয়, আসব, আপনাদেরকে জানিয়ে দেব। রাত ন-টার মধ্যেই আপনারা সাতজন হাজির থাকবেন আমার ঘরে। ভেতরে তাকে ঢোকাব–তারপর যদি জ্যান্ত বেরিয়ে যেতে পারে তো বাকি জীবনটা বলে বেড়াবেখন বার্ডি এডোয়ার্ডয়ের কপাল ভালো।

ম্যাকগিন্টি বললে, পিনকারটন সার্ভিসে শিগগিরই একটা চাকরি খালি হতে চলেছে। ম্যাকমুর্দো, ওই কথাই রইল। রাত নটায় তোমার ঘরে আসছি। ভেতরে ঢুকিয়ে দরজাটা বন্ধ করার পর বাকিটা ছেড়ে দিয়ে আমাদের ওপর।

ফাঁদে পড়ল বার্ডি এডোয়ার্ডস

ম্যাকমুর্দো ঠিকই বলেছিল, বিধবা ম্যাকনামারার বাড়ি সত্যিই খুব নিরিবিলি জায়গায় পরিকল্পনামতো খুনের পক্ষে আদর্শ। শহরের একদম শেষে রাস্তা থেকে অনেক ভেতরে। চক্রীরা সাধারণত যাকে মারে, তার নাম ধরে ডেকে রিভলবার দিয়ে দেহটা ঝাঁঝরা করে ফেলে রেখে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে ওভাবে খুন করলে চলবে না। লোকটা কতদূর জেনেছে, কীভাবে জেনেছে এবং কী-কী খবর মালিকের কাছে পাঠিয়েছে সেই খবর আগে পেট থেকে বার করতে হবে। কে জানে হয়তো খুবই দেরি হয়ে গেছে–খবর পাঠাননাও শেষ হয়েছে। সেক্ষেত্রে, এ-কাজ যে করেছে, অন্তত তার ওপর প্রতিশোধ তো নেওয়া যাবে। তবে সে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জেনেছে বলে মনে হয় না। জানেনি বলেই ম্যাকমুর্দোর বানিয়ে বলা গল্পগুলো পরের দিন টেলিগ্রাম করে পাঠিয়েছিল। যাই হোক, কী খবর পাঠিয়েছে অ্যাদ্দিন, স্বমুখেই এবার শোনা যাবে। একবার কবজায় আনতে পারলে কথা বলিয়ে তবে ছাড়বে। এই তো প্রথম নয়, বেঁকে বসা অনেক সাক্ষীকেই ঢিট করা হয়েছে এর আগে।

বন্দোবস্তমতো হবসন্স প্যাঁচ-এ গেল ম্যাকমুর্দো। সেদিন সকালেই যেন পুলিশের নেকনজর একটু বেশিভাবে পড়তে দেখা গেল ওর ওপর। ডিপোতে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাকমুর্দো গায়ে পড়ে এসে কথা বলে গেল ক্যাপ্টেন মার্ভিন সেই মার্ভিন যে নাকি শিকাগো থেকে এসেছে এবং ম্যাকমুর্দোকে এক নজরেই চিনেছে। ম্যাকমুর্দো কিন্তু কথা

বলেনি–সরে এসেছে। কাজ শেষ করে ফিরল বিকেলে, ইউনিয়ন হাউসে গিয়ে দেখা করল ম্যাকগিন্টির সঙ্গে।

বলল, আসছে।

চমৎকার! বলে ম্যাকগিন্টি। আস্তিন গুটিয়ে বসে আছে দানব। প্রশস্ত ওয়েস্টকোটের ফঁক দিয়ে ঝকমক করছে চেন আর স্টিল। খাড়া খাড়া দাড়ির ফাঁকে রোশনাই ছড়াচ্ছে একটা হিরে। মদ আর কূটনীতি বসকে কেবল ধনবানই করেনি, শক্তিমানও করেছে। সেইজন্যেই গতকাল রাতে কল্পনায় জেগে ওঠা গারদ বা ফাঁসিকাঠকে আরও বেশি ভয়ংকর মনে হচ্ছে।

শুধোয় উদবিগ্ন কণ্ঠে, কী মনে হল তোমার? খুব বেশি জেনে ফেলেছে?

মুখ কালো করে মাথা নাড়ে ম্যাকমুর্দো।

বেশ কিছুদিন এ-অঞ্চলে ও রয়েছে–ছ-সপ্তাহ তো বটেই। নৈসর্গিক দৃশ্য দেখবার জন্যে নিশ্চয় সে আসেনি। রেল কোম্পানির টাকার জোরে এতগুলো দিন আমাদের মধ্যে যে কাজ করেছে, আমার তো মনে হয় নিশ্চয় সে কাজ হাসিল করেছে–খবর পেয়েছে, পাঠিয়েছে।

চিৎকার করে বলে ম্যাকগিন্টি, লজে নরম ধাতের লোক তো কেউ নেই। প্রত্যেকেই খাঁটি স্টিল। তবে হ্যাঁ, জঘন্য ওই মরিসের কথা আলাদা। দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে, ভোঁদড় কোথাকার! যদি কেউ আমাদের পথে বসিয়ে থাকে, তবে সে ওই মরিস। আমার ইচ্ছে ছিল সন্ধের আগেই দু-জন বয় পাঠিয়ে ওকে রামধোলাই দিয়ে পেট থেকে কথা বার করে নেওয়া।

ম্যাকমুর্দো জবাব দেয়, তাতে ক্ষতি অবশ্য কিছু নেই। মরিসকে আমি আবার একটু পছন্দ করি–মারধর খেলে আমারই মন খারাপ হবে। লজের ব্যাপারে দু-একবার আমার সঙ্গে কথা বলেছে! দেখেছি, চিন্তাধারা আমার বা আপনার মতো ঠিক নয়। না-হলেও, বেইমানি করার পাত্রও সে নয়। যাই হোক, আপনাদের দুজনের মাঝে আমি দাঁড়াতে চাই না।

খিস্তি দিয়ে বলে ম্যাকগিন্টি, ওকে আমি শেষ করব। সারাবছর চোখে চোখে রেখেছি।

ম্যাকমুর্দো বললে, যাই করুন না কেন, কালকের আগে করবেন না। পিনকারটন ঝামেলা–মিটানো পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই মঙ্গল। এতদিন গেল, আর আজকেই যদি শহরের সমস্ত পুলিশকে চাঙা করে তুলি, ক্ষতি আমাদেরই।

বলেছ ঠিক, বলে ম্যাকগিন্টি। এই বার্ডি এডোয়ার্ডসের পেট থেকেই কথা টেনে বার করব–দরকার হলে হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে আনব কিন্তু বলিয়ে ছাড়ব কার মুখে শুনেছে এত কথা। ফাঁদ পেতেছি সন্দেহ করেনি তো?

হেসে ওঠে ম্যাকমুর্দো।

বলে, ঘা দিয়েছি ওর দুর্বল জায়গায়। স্কোরারসদের ঠিকানার লোভে ঠিকই দৌড়ে আসবে। টাকাও নিয়েছি। দাঁত বার করে এক বান্ডিল ডলার নোট পকেট থেকে বার করে–সব কাগজ দেখালে এ-রকম বান্ডিল আর একটা পাওয়া যাবে।

কী কাগজ?

কাগজ আবার কী? কিচ্ছু নেই। সমিতির সংবিধান, নিয়মের বই আর সদস্য পদের দরখাস্ত দিয়ে লোভটাকে বাড়িয়ে তুলেছি। মনে খুব আশা, যাওয়ার আগে স্কোরারস-দের নাড়ি নক্ষত্র জেনে তবে যাবে।

কুটিলকণ্ঠে ম্যাকগিন্টি, এখুনি যদি পেতাম হাতের কাছে! কাগজপত্র নিয়ে যাওনি কেন জিজ্ঞেস করেনি?

এসব কাগজ সঙ্গে নিয়ে ঘোরা যায় নাকি? পুলিশের সন্দেহ আমার ওপর? আজকেই ডিপোতে গায়ে পড়ে কথা বলে যায়নি ক্যাপ্টেন মার্ভিন?

শুনেছি সে-কথা। ঝক্কিটা শেষ পর্যন্ত দেখছি তোমাকেই পোহাতে হবে। মার্ভিনকে এখুনি ড্রেনে ঢুকিয়ে দিতে পারি। কিন্তু হবসন্স প্যাঁচ-এ তোমাকে দেখা গেল যেদিন, সেদিনই খুন হয়ে গেল সেখানকার একজন–এ-ঘটনা তো চাপা দেওয়া যাবে না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে ম্যাকমুর্দো বললে, ঠিকমতো কাজ সারতে পারলে খুন যে করা হয়েছে সেইটাই তো প্রমাণ করতে পারবে না। অন্ধকারে এ-বাড়ি ঢুকলে কারুর চোখে পড়ার কথা নয়। বেরিয়ে যাওয়াটাও কারুর চোখে পড়ার কথা নয়। কাউন্সিলর, এবার শুনুন আমার প্ল্যান। প্ল্যানমাফিক যাকে যা কাজ দেবার আপনি দেবেন। ঠিক সময়ে আপনারা আসবেন সবাই। বেশ, বেশ। সে আসবে দশটায়। তিনবার দরজায় টোকা দিলেই পাল্লা খুলব আমি। তারপরেই আমি চলে যাব ওর পেছনে বন্ধ করে দেব দরজা। মুঠোর মধ্যে পাবেন বার্ডি এডোয়ার্ডকে।

এ তো দেখছি জলের মতো সোজা ব্যাপার।

হ্যাঁ, কিন্তু এর পর কী করবেন, সেইটাই ভাববার কথা। লোকটা কিন্তু আস্ত গুলবাজ বললেই চলে। তার ওপর দারুণভাবে সশস্ত্র। আমি বোকা বানালেও যেকোনো পরিস্থিতির জন্যে সে তৈরি থাকবে, এইটাই স্বাভাবিক। যে-ঘরে আমার একলা থাকার কথা, সে-ঘরে যদি সাতজন লোককে সে দেখে, গুলি চালাবেই–কেউ-না-কেউ জখম হবে।

তা ঠিক।

শহরে যত টিকটিকি আছে, আওয়াজ শুনে দৌড়ে এসে ধরে ফেলবে আমাদের।

কথাটা ঠিকই বলেছ।

আমাদের কাজ হাসিল করা উচিত এইভাবে। আপনারা সবাই থাকবেন বড়ো ঘরে যে-ঘরে বসে আমার সঙ্গে গল্প করেছিলেন। দরজা খুলে ওকে আমি নিয়ে গিয়ে বসাব দরজার ঠিক পাশেই বৈঠকখানায়–কাগজ খুঁজতে যাচ্ছি বলে বসিয়ে রাখব সেখানে। তাতে আমার পক্ষে একটা সুবিধে হবে। আপনাদের এসে বলতে পারব অবস্থা কীরকম। তারপর কিছু জাল কাগজপত্র নিয়ে ফিরে যাব বৈঠকখানায়। যেই পড়তে শুরু করবে, লাফিয়ে পড়ে চেপে ধরব পিস্তল ধরার হাতটা। আমার চিৎকার শুনলেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বেন ঘরের মধ্যে। যত তাড়াতাড়ি আসবেন, ততই মঙ্গল। কেননা সে আমার মতোই শক্তি ধরে। তবে আপনারা না-আসা পর্যন্ত ধরে রাখতে পারব।

ম্যাকগিন্টি বললে, প্ল্যানটা ভালো। লজ ঋণী রইল তোমার কাছে। আমার পর এ-চেয়ারে কে বসবে, চেয়ার ছাড়বার আগে তার নাম আমি বলে যেতে পারব আশা করছি।

সামান্য সদস্য ছাড়া আমি কিছুই নয়, কাউন্সিলর, বলে ম্যাকমুর্দো। কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যায় বিখ্যাত ব্যক্তিটির অভিনন্দনে কী ধরনের চিন্তা ঘুরছে তার মাথায়।

বাড়ি ফিরে আসন্ন সান্ধ্য কর্মকাণ্ডের প্রস্তুতি শুরু করে সে। প্রথমেই নিজের স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন রিভলবার পরিষ্কার করে, তেল মাখিয়ে, গুলি ভরে রাখল। তারপর, যে-ঘরে ফাঁদে ফেলা হবে ডিটেকটিভকে, খুঁটিয়ে দেখল সেই ঘরের চেহারা। ঘরটা বড়ো, মাঝে সাদা পাইন কাঠের একটা টেবিল, এক প্রান্তে বড়ো স্টোভ। দু-দিকে জানলা। জানলায় খড়খড়ি নেইটেনে সরানোর মতো হালকা পর্দা দিয়ে ঢাকা। মন দিয়ে এইসব পরীক্ষা করল ম্যাকমুর্দো। এ ধরনের অত্যন্ত গোপনীয় কাজের পক্ষে ঘরটা যে বড়ো বেশি খোলামেলা–তা নজর এড়াল নাস। তবে রাস্তা থেকে অনেক দূরে থাকার ফলে খোলামেলা হলেও কারো টনক নড়বে না। সবশেষে, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করল দোস্ত স্ক্যানল্যানের সঙ্গে। স্ক্যানল্যান স্কোরারস হলেও নিরীহ মানুষ। দুর্বলচিত্ত। কমরেডদের মতের বিরুদ্ধে কথা বলার শক্তি তার নেই। বহু রক্ত ঝরানো কুকর্মে তাকে বাধ্য হয়ে সহযোগিতা করতে হয়েছে। ভেতরে ভেতরে তাই সে। শিহরিত। ম্যাকমুর্দোও সংক্ষেপে তাকে বলে কী ঘটতে চলেছে এই ঘরে।

মাইক স্ক্যানল্যান, আমি যদি তুমি হতাম, তাহলে রাতটা অন্য কোথাও কাটাতাম। ভোরের আলো ফোঁটার আগেই রক্তস্রোত বইবে এখানে।

স্ক্যানল্যান বললে, ম্যাক, আমার মধ্যে ইচ্ছের অভাব নেই, অভাব কেবল স্নায়ু আমার সইতে পারে না। কয়লাখনির ম্যানেজার ডানকে ধরাশায়ী হতে দেখে কী কষ্টে যে দাঁড়িয়েছিলাম, তা শুধু আমিই জানি। তোমার বা ম্যাকগিন্টির মতো আমি নই–এসব কাজের জন্য তৈরি হইনি। লজ যদি কিছু মনে না করে তাহলে তোমার কথা মতোই চলব, রাত্রে আর বাড়ি ফিরছি না–যা খুশি করো তোমরা।

যথাসময়ে সবাই উপস্থিত। বাহ্যত প্রত্যেকেই মানী নাগরিক। বেশবাস পরিপাটি এবং পরিচ্ছন্ন। মুখের চেহারা খুঁটিয়ে দেখলেই কেবল বোঝা যায় বার্ডি এডোয়ার্ডসের বাঁচবার আশা খুব একটা নেই। প্রত্যেকটা মুখ ইস্পাতকঠিন, চোখ অনুতাপহীন। কম করেও বারোবার নররক্তে হাত রাঙায়নি, এমন ব্যক্তি এক জনও নেই ঘরের মধ্যে। কশাই যেমন চোখের পাতা না-কাঁপিয়ে মেষ জবাই করে, এরাও তেমনি নিষ্কম্প চিত্তে মানুষ জবাই করে। চেহারা এবং কুকীর্তির দিক দিয়ে পুরোধা অবশ্য ভয়ংকর দর্শন বস ম্যাকগিন্টি। সেক্রেটারি লোকটা শীর্ণকায়, উগ্র। ঘাড়খানা লম্বা, অস্থিসার। হাতপায়ে অনবরত স্নায়বিক খিচের টান। সঙ্গের টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে তার বিশ্বস্ততা অতুলনীয়–কিন্তু এই আওতার বাইরে কারো প্রতি সুবিচার বা সততার লেশমাত্র তার মধ্যে নেই। কোষাধ্যক্ষ কার্টার মাঝবয়সি, মুখখানা আবেগহীন উদাসীন–কেমন যেন একটু অপ্রসন্ন ভাব, গায়ের চামড়া হলদে পার্চমেন্ট কাগজের মতো। দক্ষ সাংগঠনিক হিসেবে তার জুড়ি নেই, বহু প্রকাশ্য কুকীর্তির নিখুঁত পরিকল্পনা বেরিয়েছে তারই উর্বর মস্তিষ্ক থেকে। উইলাবাই ভ্রাতৃদ্বয় কাজের লোক হাতের কাছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী–লম্বা, ছিপছিপে তরুণ–মুখ দৃঢ়সংকল্পে সুকঠিন। টাইগার করম্যাক আকারে একটু ভারী, মলিন–জিঘাংসাবৃত্তির জন্যে কমরেডরা পর্যন্ত ভয় পায়। পিনকারটন ডিটেকটিভ নিধনের সংকল্প নিয়ে এহেন ব্যক্তিরাই সেই রাতে জমায়েত হল ম্যাকমুর্দোর বাড়িতে।

টেবিলে হুইস্কি রেখে দিয়েছিল নিমন্ত্রণকারী ম্যাকমুর্দো–আসন্ন কাজের জন্যে গা এবং মন তাতিয়ে নিল সবাই সুরায় চুমুক দিয়ে। বলডুইন আর করম্যাক আগে থেকেই চুর চুর হয়ে এসেছিল–হুইস্কি পেটে পড়ায় জিঘাংসার করাল রূপ পুরোমাত্রায় প্রকট হয়ে

উঠেছিল চোখে-মুখে। স্টোভের ওপর ক্ষণকের জন্যে হাত রাখল করম্যাক–খুব ঠান্ডা পড়ায় আগুন দেওয়া হয়েছিল স্টোভে।

খিস্তি দিয়ে বললে, এতেই হবে!

অর্থ বুঝল বলডুইন। বলল, ঠিক বলেছ। স্টোভের গায়ে কষে বেঁধে রাখলেই ভুর ভুর করে কথা বেরিয়ে আসবে বাছাধনের পেট থেকে।

ম্যাকমুর্দো বললে, ঘাবড়াও মাত, আসল কথাটা পেট থেকে ঠিক বার করে নেবখন। সত্যিই স্নায়ুর জোর আছে বটে ম্যাকমুর্দোর। সমস্ত ঝক্কি তার একার মাথার ওপর তা সত্ত্বেও কথাবার্তা ঠান্ডা যেন কিছুই হয়নি। ইস্পাতকঠিন স্নায়ু না-থাকলে এমন নির্বিকার থাকা যায় না। নার্ভের এই জোর লক্ষ করেছে সবাই। এখন মুখর হল সবার প্রশংসায়।

অনুমোদনসূচক স্বরে বললে ম্যাকগিন্টি, ওর ভার তোমার ওপর রইল। গলাটা টিপে ধরার আগে যেন কিছু টের না-পায়। জানলাগুলোয় খড়খড়ি থাকলে ভালো হত।

একে একে প্রত্যেকটা জানলার সামনে গিয়ে পর্দা টেনে এঁটে দিল ম্যাকমুর্দো।

আড়াল থেকে কেউ দেখতে পাবে না। সময় হয়েছে আসবার।

সেক্রেটারি বললে, নাও আসতে পারে। হয়তো হাওয়ায় বিপদের গন্ধ পেয়েছে।

ম্যাকমুর্দো বললে, ভয় নেই, আসতে তাকে হবেই। আসবার জন্যে ছটফটিয়ে মরছে– এলেই বুঝবেন। চুপ!

মোমের পুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল প্রত্যেকে কয়েকজনের হাতের গেলাস দাঁড়িয়ে গেল ঠোঁটের কাছে এসে। সজোরে তিনবার টোকা মারার শব্দ হল দরজায়।

চুপ!

হাত তুলে হুঁশিয়ারি দেয় ম্যাকমুর্দো! বিকট উল্লাসে চোখ চক চক করে ওঠে ঘরসুদ্ধ প্রত্যেকের, হাত নেমে আসে লুকোনো হাতিয়ারের ওপর।

খবরদার! একদম শব্দ না হয়! ফিসফিস করে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ম্যাকমুর্দো, যাবার সময়ে দরজাটি বন্ধ করে দেয় সাবধানে।

কানখাড়া করে ওত পেতে থাকে মানুষখুনির দল। সিঁড়ি বেয়ে কমরেডের নেমে যাওয়ার শব্দ ভেসে আসে মনে মনে গোনে ক-ধাপ নামা হল। তারপর শুনল দরজা খুলছে ম্যাকমুর্দো! স্বাগত সম্ভাষণের দু-চারটে কথা ভেসে আসে কানে। এরপর বাড়ির ভেতরে শোনা যায় অদ্ভুত পদধ্বনি এবং একটা অচেনা কণ্ঠস্বর। মুহূর্তকাল পরেই দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে চাবি ঘুরোনোর আওয়াজ। ফাঁদের মধ্যে ঢুকেছে শিকার

আর ভয় নেই। বিকটভাবে হেসে ওঠে টাইগার করম্যাক–বিরাট থাবা-হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে বস ম্যাকগিন্টি।

বলে চাপা গলায়, চুপ, গাধা কোথাকার! কাঁচিয়ে ছাড়বে নাকি?

বিড়বিড় স্বরে কথাবার্তা শোনা যায় পাশের ঘরে। একঘেয়ে একটানা। যেন অনন্তকালেও ফুরোবে না। তারপরেই খুলে গেল দরজা, ঘরে ঢুকল ম্যাকমুর্দো–আঙুল ঠোঁটের ওপর।

টেবিলের প্রান্তে এসে ঘুরে দেখল সবাইকে। সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন এসেছে চোখে-মুখে। বিরাট একটা কাজের জন্যে যেন দেহমন প্রস্তুত, এমনি হাবভাব। গ্রানাইট দৃঢ়তায় কঠিন মুখচ্ছবি। চশমার আড়ালে দু-চোখ জ্বলছে প্রচণ্ড উত্তেজনায়। নেতৃত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে সর্বাঙ্গে। সাগ্রহে তাকায় সবাই কিন্তু একটি কথাও বলে না ম্যাকমুর্দো। একইরকম বিচিত্র অসাধারণ চাহনি বুলিয়ে যায় পর্যায়ক্রমে সবার মুখের ওপর।

শেষকালে আর থাকতে না-পেরে বলে বসে ম্যাকগিন্টি, কী হল, এসেছে সে? বাড়ি ঢুকেছে বার্ডি এডোয়ার্ডস?

হ্যাঁ, এসেছে আস্তে আস্তে বলে ম্যাকমুর্দো। বার্ডি এডোয়ার্ডস এখানেই আছে। আমিই বার্ডি এডোয়ার্ডস।

সংক্ষিপ্ত এই ভাষণের পর দশ সেকেন্ড এমন অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করতে লাগল ঘরের মধ্যে যেন কেউ নেই ঘরের মধ্যে একদম খালি। স্টোভের ওপর চাপানো কেটলির ফেস ফেঁস শব্দটাই কেবল তীক্ষ্ণতর হয়ে কানের পর্দার ওপর যেন বিষাণ বাজিয়ে চলল বিরামবিহীন ভাবে। নিঃসীম আতঙ্কে কাঠ হয়ে বসে সাতজনে সাতটি সাদা মুখ তুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল এমন একটি মানুষের দিকে যার প্রবল প্রতাপের প্রভাবে প্রত্যেকেই যেন সম্মোহিত, পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তারপরেই আচম্বিতে ঝনঝন শব্দে ভেঙে ঠিকরে গেল জানলার শার্সি, ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে প্রত্যেকটা জানলায় আবির্ভূত হল একটি করে রাইফেলের চকচকে নলটান মেরে ফেলে দেওয়া হল পর্দাগুলো। দেখেই জখম ভাল্লুকের মতো গর্জন করে আধখোলা দরজার দিকে ঠিকরে গেল বস ম্যাকগিন্টি। কিন্তু থমকে যেতে হল একটা উদ্যত রিভলবারের সামনে–নলচের মাছির ঠিক পেছনে জ্বলছে কোল অ্যান্ড আয়রন পুলিশের ক্যাপ্টেন মার্ভিনের পাথর-কঠিন নীল চোখ। কেঁচোর মতো গুটিয়ে পেছনে হেঁটে এসে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বস।

ম্যাকমুর্দো নামে এতদিন নিজের পরিচয় দিয়ে এসেছে যে, এবার সে বলে, কাউন্সিলর, যেখানে আছেন ওইখানেই থাকুন–নিরাপদে থাকবেন। বলডুইন, রিভলবারের ওপর থেকে হাত না-সরালে কিন্তু ফাঁসির জল্লাদকে কলা দেখাবে মনে হচ্ছে। হাত সরাও বলছি, তবে রে–ঠিক আছে, ওতেই হবে। চল্লিশজন সশস্ত্র পুলিশ বাড়ি ঘিরে আছে খেয়াল থাকে যেন। পালাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। মার্ভিন, ওদের পিস্তলগুলো কেড়ে নাও।

অতগুলো রাইফেলের সামনে বাধা দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। অনায়াসেই নিরস্ত্র করা হল প্রত্যেককে। মুখ ভারী করে ভিজে বেড়ালের মতো ভীষণ অবাক হয়ে টেবিল ঘিরে বসে রইল সাতটি নরপশু।

ফাঁদে যে ফেলেছে, এবার সে বললে, ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই। আদালতের কাঠগড়ায় ফের আমাদের দেখা হবে, তার আগে আর নয়। এই সময়টুকু যাতে ভেবে কাটাতে পারেন, সেইরকম ভাবনার খোরাক আমি এখনই দিয়ে যাচ্ছি। আমি কে এখন জেনেছেন। তুরুপের তাস ফেলে গেলাম আজ রাতে। আমিই পিনকারটনের বার্ডি এডোয়ার্ডস। আপনাদের দল ভাঙাবার জন্যে নির্বাচন করা হয়েছিল আমাকে। বড়ো কঠিন আর বিপজ্জনক খেলায় নামতে হয়েছিল আমাকে। ক্যাপ্টেন মার্ভিন আর আমার অন্নদাতারা ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানে না আমি কী খেলায় নেমেছি আমার প্রাণের মানুষ, কাজের মানুষরাও জানে নাআগুন নিয়ে খেলে গিয়েছি এতদিন। ঈশ্বর সহায়। তাই খেল খতম হল আজ রাতে জিতলাম আমিই।

আড়ষ্টমুখে সাতজন চেয়ে রইল। আত্যন্তিক ঘৃণায় বিকৃত প্রতিটি মুখ–কোনো কথাতেই সে-ঘৃণা মুছবার নয়। রক্ত-হিম-করা সে-চাউনির অর্থ বুঝল বার্ডি এডোয়ার্ডস–ইহজীবনে পরিত্রাণ নেই তার।

বলল, খেল এখনও খতম হয়নি ভাবছেন। নিলাম সেই ঝুঁকি। আপনাদের কয়েকজনকে ইহজীবনে আর কোনো খেলাই খেলতে হবে না। আপনারা ছাড়াও আরও ষাটজন আজ রাতেই শ্রীঘরের চেহারা দেখবে। যাবার আগে বলে যাই, এ-কাজে বহাল হওয়ার সময়ে

বিশ্বাসই করিনি যে সত্যিই এ-রকম একটা সমিতি থাকতে পারে। ভেবেছিলাম স্রেফ কাগুঁজে গুজব, প্রমাণও করব সেইভাবে। শুনেছিলাম, ফ্রিম্যানদের সঙ্গে আমাকে চলতে হবে। তাই শিকাগো গিয়ে ফ্রিম্যান হয়েছিলাম। পুরো ব্যাপারটা যে কাগুঁজে গুজব ছাড়া সত্যিই কিছু নয়, সমিতির সদস্য হওয়ার পর তা বদ্ধমূল হল। কেননা, বদান্যতা আর জনহিতৈষণা ছাড়া সমিতির কার্যকলাপে খারাপ কিছু দেখলাম না। কিন্তু কাজ শেষ না-করলে তো চলবে না, তাই এলাম এই কয়লা উপত্যকায়। পৌঁছোনোর পর বুঝলাম, যা ভেবেছি তা নয়। সত্যিই এই সমিতির অস্তিত্ব আছে এবং তা নিছক রোমাঞ্চ কাহিনি নয়। তাই থেকে গেলাম সুলুক সন্ধানের জন্যে। আমি শিকাগোয় জীবনে কখনো নরহত্যা করিনি। জীবনে কখনো টাকা জাল করিনি। আপনাদের যা দিয়েছিলাম, এগুলো আসল ডলার–দু-হাতে এভাবে ডলার কখনো ওড়াইনি কিন্তু আপনার মনের মানুষ হওয়ার জন্যে সব করতে হয়েছে। এমন ভান করেছি যেন পুলিশ ঘুরছে আমার পেছনে। কাজও হয়েছে। যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই ঘটেছে।

ঢুকে পড়লাম আপনাদের নরককুণ্ডে এই লজে। মিটিংয়ে বসলাম। হয়তো শুনবেন আমিও বদ হয়ে গিয়েছিলাম আপনাদের মতো। যে যাই বলুক, আপনাদের খাঁচায় পোরাই ছিল আমার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সত্যিই কি আমি বদ হয়ে গিয়েছিলাম? যে-রাতে যোগ দিলাম লজে, সেই রাতেই আপনারা বৃদ্ধ স্ট্যানজারকে ঠ্যাঙালেন। ভদ্রলোককে হুঁশিয়ার করার সময় পাইনি, কিন্তু বলডুইন, তোমার মনে আছে নিশ্চয়, তোমার হাত চেপে না-ধরলে নির্ঘাত সেদিন তাকে খুন করে ফেলতে। আপনাদের ভেতরে মিশে থাকার জন্যে অনেক সময়ে পরামর্শ আপনাদের দিয়েছি কিন্তু দিয়েছি তখনই, যখন জেনেছি সেসব চক্রান্ত বানচাল করার ক্ষমতা আমার আছে। যথেষ্ট খবর

পাইনি বলেই ডান আর মেনজিসকে বাঁচাতে পারিনি কিন্তু তাদের হত্যাকারীরা যাতে ফাঁসিকাঠে ঝোলে, সে-ব্যবস্থা আমি করব। চেষ্টার উইলকক্সকে আমিই সাবধান করে দিয়েছিলাম। তাই বোমার বারুদ দিয়ে বাড়ি উড়িয়ে দেওয়ার আগের দিন সপরিবারে পালিয়েছিল সে। অনেক কুকর্ম আমি নিরোধ করতে পারিনি। কিন্তু যদি একটু মনে করতে চেষ্টা করেন তাহলেই দেখবেন আমার কাজ কখনো বন্ধ থাকেনি। বহুবার দেখেছেন আপনাদের শিকার যেখানে থাকার কথা সেখানে থাকেনি। যে-রাস্তা দিয়ে আসার কথা সে-রাস্তা দিয়ে না-এসে অন্য পথে বাড়ি ফিরেছে অথবা তোড়জোড় করে খুন করতে গিয়ে দেখেছেন শহরে গিয়ে বসে আছে। এসবই জানবেন আমার কীর্তি।

বিশ্বাসঘাতক! দাঁতে দাঁত পিষে গর্জে ওঠে ম্যাকগিন্টি।

জন ম্যাকগিন্টি, আমাকে বিশ্বাসঘাতক বললে যদি প্রাণটা ঠান্ডা হয় বলতে পারেন। আপনি আর আপনার মতো যারা এ-অঞ্চলে আছে তারা প্রত্যেকে ঈশ্বর আর মানুষের শত্রুরূপে কাজ চালিয়ে গেছেন। অসহায় নরনারী আর আপনাদের মাঝে এসে দাঁড়ানোর দরকার ছিল একজনের টুঁটি টিপে রেখেছিলেন যাদের, তাদের রক্ষে করার জন্যেই দরকার ছিল একজনের আবির্ভাবের। এ-কাজ করার রাস্তা একটাই ছিল, সেই রাস্তায় গিয়েছি আমি। আপনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছেন, কিন্তু আমার তো মনে হয় হাজার হাজার লোক আমাকে ত্রাতা বলে মাথায় নিয়ে নাচবে। নরকে ঢুকতে হয়েছে তাদের বাঁচানোর জন্যে। দীর্ঘকাল নরকবাস করেছি এইভাবে। ওয়াশিংটনের খাজাঞ্চিখানা আমার সামনে হাট করে ধরলেও এইরকম আর তিনটে মাসের মধ্যে যেতে রাজি নই। প্রত্যেকটা লোক আর প্রতিটা গুপ্তকথার নাড়িনক্ষত্র না-জানা পর্যন্ত আমাকে থাকতে

হয়েছে নরককুণ্ডে, আমার সিক্রেট ফাঁস হতে বসেছে কানে আসতেই তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে নিলাম—নইলে থাকতাম আরও কিছুদিন। এমন একটা চিঠি এসেছিল এই শহরে যা ফাঁস হয়ে গেলে আপনাদের টনক নড়ত—হুঁশিয়ার হয়ে যেতেন। তাই খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হয়েছে। আর কিছু বলার। নেই—একটা কথা ছাড়া। এ-পৃথিবী থেকে আমার বিদায় নেওয়ার মুহূর্ত যখন আসবে, এই উপত্যকায় যা করে গেলাম, তা ভেবে শান্তিতে মরতে পারব। মার্ভিন আর তোমাকে আটকাব না। নিয়ে যাও এদের।

আর বেশি কিছু বলার নেই। স্ক্যানল্যানের হাতে একটা মুখবন্ধ খাম দেওয়া হয়েছিল! মিস এট্টি শ্যাফটারকে খামটা যেন পৌঁছে দেয়। মুচকি হেসে চোখ টিপে খাম নিয়ে গিয়েছিল সে। নিশুতি রাতে একটা স্পেশাল ট্রেন পাঠিয়ে দিল, রেল কোম্পানি। পরমাসুন্দরী এক মহিলা এবং আপাদমস্তক আচ্ছাদিত এক ব্যক্তি উঠে বসল সেই ট্রেনে। নক্ষত্রবেগে, কোথাও—থেমে, বিপদ এলাকা পেরিয়ে গেল ট্রেনটা। ভ্যালি অফ ফিয়ারে জীবনে আর ফিরে যায়নি এট্রি আর তার প্রিয়তম। দশ দিন পর শিকাগোয় বিয়ে হল দু-জনের, বিয়ের সাক্ষী রইল বৃদ্ধ জ্যাকব শ্যাফটার।

স্কোরারসদের অনুগামীরা যাতে আইনরক্ষকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে না-পারে, তাই তাদের বিচার্য পর্ব অনুষ্ঠিত হল ভ্যালি অফ ফিয়ার থেকে অনেক দূরে। ওরা লড়ল বটে, কিন্তু বৃথাই। বৃথাই ব্ল্যাকমেল এবং নানা অসৎ উপায়ে সারাতল্লাট থেকে শোষিত লজের অর্থ জলের মতো ব্যয় করা হল। বৃথাই বিবাদীপক্ষ প্রচণ্ড মনোবল দেখিয়ে গেল কিন্তু সব প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হল মাত্র একজনের আবেগহীন, স্পষ্ট, নিরুত্তাপ বিবৃতির কাছে সে যে সব দেখেছে, সব শুনেছে, সব জেনেছে, বিবাদীদের সঙ্গে থেকেই প্রত্যেকের

কুকীর্তির প্রমাণপঞ্জি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সংগ্রহ করেছে; প্রত্যেকের জীবনযাত্রা, সংগঠনের বৃত্তান্ত এবং অপরাধের বিবরণ খুঁটিয়ে নথিভুক্ত করে রেখেছে। শেষকালে, বহু বছর পরে ভেঙে গেল ওদের মনোবল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল নানাদিকে। চিরকালের জন্যে আতঙ্ক মেঘ সরে গেল উপত্যকা থেকে। নাকিসুরে ঘ্যানঘ্যান করতে করতে, কাঁদুনে গলায় তোষামোদ করতে করতে ফাঁসিকাঠে নিয়তির সম্মুখীন হল ম্যাকগিন্টি। আটজন পালের গোদারও হল একই হাল। পঞ্চাশ জনকে কারাবরণ করতে হল বিভিন্ন মাত্রার। সম্পূর্ণ হল বার্ডি এডোয়ার্ডসের কীর্তি।

কিন্তু ওর অনুমান বৃথা হল না। খেল খতম হল না। আরও অনেক হাত খেলতে বাকি তখনও! দুবৃত্তদলের ভীষণতম কয়েকজন ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে গেল। এদের মধ্যে ছিল টেড বলডুইন আর উইলবি ভ্রাতৃদ্বয়, এবং আরও কয়েকজন। দীর্ঘ দশবছর কারার অন্তরালে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর ফের এসে দাঁড়াল মুক্ত আকাশের নীচে সেইদিনই বার্ডি এডোয়ার্ডস বুঝল শান্তি বিঘ্নিত হল তার শেষ জীবনের। একবাক্যে ওরা শপথ নিলে রক্ত দিয়েও কমরেডদের শোচনীয় পরিণতির প্রতিহিংসা নেবে। শপথ অনুসারে বেরিয়ে পড়ল বিরাট এই পৃথিবীতে। শিকাগোতে দু-দুবার অনিবার্য মৃত্যুর খপ্পর থেকে বেঁচে পালাল এডোয়ার্ডস। বেশ বোঝা গেল, তৃতীয় বারে আর রক্ষে নেই! শিকাগো ত্যাগ করে ছদ্মনামে এল ক্যালিফোর্নিয়ায়। এট্টি এডোয়ার্ডস দেহ রাখল এইখানে চোখে অন্ধকার দেখল বার্ডি এডোয়ার্ডস। আর একবার খুন হতে হতেও কোনোমতে বেঁচে গেল সে! আবার নাম পালটাল। ডগলাস ছদ্মনামে একটা নিরালা গিরিখাতে বার্কার নামে একজন ইংরেজ অংশীদারের সঙ্গে কারবার করে অনেক পয়সা করল। আবার খবর এল রক্তপিশাচ কুকুরের দল গন্ধ শুকে শুকে হাজির হয়েছে

তল্লাটে। আর একটু দেরিতে খবর পেলে আর বাঁচতে হত না এডওয়ার্ডসকে। ক্যালিফোর্নিয়া ছেড়ে পালাল ইংলন্ডে। মনের মতো মহিলা পেয়ে আবার বিয়ে করল জন ডগলাস, সাসেক্সে শান্তিতে সংসার করল দীর্ঘ চার বছর–তারপরেই যা ঘটল, অদ্ভুত সেই কাণ্ডকারখানা আগেই শোনা গেছে আমাদের।

উপসংহার

পুলিসকোর্ট জন ডগলাসের কেস পাঠিয়ে দিল উচ্চতর আদালতে। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারের সাময়িক অধিবেশনে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল ডগলাস–আত্মরক্ষার জন্যে গুলি ছুঁড়ে গিয়েছে হাত থেকে সুতরাং সে নিরপরাধ। মিসেস ডগলাসকে চিঠি লিখল হোমস। যেভাবে পারেন এখুনি ওঁকে ইংলন্ডের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যান। যাদের খপ্পর থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এত বছর, তাদের চাইতেও ঢের বেশি ওত পেতে আছে এখানে। আপনার স্বামী ইংলন্ডে নিরাপদ নয় জেনে রাখবেন।

মাস দুয়েক পরে কেসটা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছিল আমাদের মনের মধ্যে। তারপর একদিন সকালে একটা প্রহেলিকাময় চিঠি পাওয়া গেল লেটারবক্সে। অসাধারণ সেই পত্রের বয়ান অতিশয় সংক্ষিপ্ত : আহা রে! বেচারা মি. হোমস! চিঠিতে সম্বোধন নেই, স্বাক্ষর নেই। কিম্ভুতকিমাকার বার্তাটি পড়ে হেসে ফেললাম আমি। কিন্তু অস্বাভাবিক সিরিয়াস হয়ে গেল হোমস।

ওয়াটসন, শয়তানির গন্ধ পাচ্ছি, বলে মেঘাচ্ছন্ন ললাটে বসে রইল দীর্ঘক্ষণ।

সেইদিন একটু রাতে ল্যান্ডলেডি মিসেস হাডসন একটা খবর নিয়ে ওপরে এল–এক ভদ্রলোক নাকি এখুনি দেখা করতে চাইছে হোমসের সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি একটা বিষয়

সম্পর্কে। পেছন পেছন ঘরে ঢুকে পড়ল পরিখা-বেষ্টিত ম্যানর হাউসের পুরোনো বন্ধু মি. সিসিল বার্কার। চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্ত, বিহ্বল।

মি. হোমস, খুবই খারাপ খবর নিয়ে এসেছি অত্যন্ত ভয়ংকর সংবাদ।

আমি জানতাম, বললে হোমস।

ডগলাসের খবর জানেন? শুনলাম ওর আসল নাম নাকি এডোয়ার্ডস। আমি কিন্তু চিরটাকাল ওকে বেনিটো ক্যানিয়নের জ্যাক ডগলাস নামেই জানব। আপনাকে বলেছিলাম না, তিন সপ্তাহ আগে পালমিরা জাহাজে সাউথ আফ্রিকা রওনা হয়েছে স্বামী-স্ত্রী?

বলেছিলেন।

গতরাতে কেপটাউন পৌছোয় জাহাজ। আজ সকালে পেলাম এই কেলটা। মিসেস ডগলাস পাঠিয়েছেন—

সেন্ট হেলেনায় ঝড়ের সময়ে জাহাজ থেকে পড়ে নিখোঁজ হয়েছে জ্যাক। কেউ জানে কখন ঘটল দুর্ঘটনা–আইভি ডগলাস।

চিন্তান্বিত স্বরে হোমস বললে, আচ্ছা! শেষটা তাহলে এইভাবে করা হল। সাজানোটা ভালোই হয়েছে মানতে হবে। ত্রুটি কোথাও নেই।

আপনার কী মনে হয়? দুর্ঘটনা নয়?

কখনোই নয়।

খুন?

নিশ্চয়!

আমারও তাই মনে হয়। শয়তানের বাচ্চা এই স্কোরারস... ক্রিমিন্যালদের এই নাটকীয় প্রতিহিংসা—

আরে না, মশাই, না। এ-ব্যাপারে ওদের চেয়ে বড়ো একজনের হাত রয়েছেস্কোরারসদের গুরু হওয়ার মতো ক্ষমতা সে রাখে। করাত দিয়ে কাটা শট গান বা জবরজং ছ-ঘরা রিভলবারের কেস এটা নয়। নামি শিল্পীর তুলির টান দেখেই বোঝা যায়। ক্রাইমের ধরন দেখলে আমিও চিনতে পারি মরিয়ার্টিকে। এ-কাজ লন্ডনের আমেরিকার নয়।

কিন্তু কেন? এ-খুনে তার কী মোটিভ?

মোটিভ একটাই–সে কখনো ব্যর্থ হয় না–যে-কাজে হাত দেয় সে-কাজ শেষ না-করে ছাড়ে না। অপ্রতিদ্বন্দ্বী সে এই কারণে। একটিমাত্র লোককে নিকেশ করার জন্য বিরাট একটা মস্তিষ্ক ও বিশাল একটা সংগঠন সক্রিয় হয়েছিল খেয়াল রাখবেন। হাতুড়ির এক ঘায়ে বাদাম গুঁড়িয়ে দেবার মতো এরা সমস্ত শক্তি সংহত করে আঘাত হানবার সময় তাই কখনো ব্যর্থ হয় না–নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ হাসিল করে প্রতিবারে!

কিন্তু এ-ব্যাপারে সে নাক গলাচ্ছে কেন?

এ-ব্যাপারে প্রথম খবরটাই তো পেয়েছিলাম তারই এক শাকরেদের কাছ থেকে। বিদেশ বিভুঁয়ে খুনখারাপি করতে গেলে সেখানকার ক্রিমিন্যালের শরণ নিতে হয়–অংশীদার হয়ে কাজ সারতে হয়। এ-পরামর্শ আমেরিকানরা পেয়েছিল বলেই ক্রাইমের এই বিরাট কনসালট্যান্টের শরণ নিয়েছিল। সেই মুহূর্ত থেকেই কিন্তু আয়ু ফুরিয়েছিল জন ডগলাসের। প্রথম সংগঠনের লোকজন লাগিয়ে হদিশ বার করা হয়েছিল জন ডগলাসের। এজেন্ট ব্যর্থ হয়েছে, খবরের কাগজে এ-খবর পড়েই কিন্তু সে ঠিক করেছিল এবার হাত লাগাবে নিজে ওস্তাদের খেল দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেবে দুনিয়াকে। মনে পড়ে বির্লস্টোন ম্যানর হাউসে বলেছিলাম আপনার বন্ধুকে, এরপর যে-বিপদ আসছে তা ফেলে-আসা বিপদের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক? কি, ঠিক বলেছিলাম কিনা?

নিষ্ফল ক্রোধে হাতের মুঠোয় কপাল ঠুকতে ঠুকতে বার্কার বললে, এইভাবেই কি এর রাজত্বে থাকতে হবে আমাদের? শয়তান শিরোমণির সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ কি নেই?

আরে না, সে-রকম কথা আমি বলি না, যেন দূর ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে বললে হোমস। কেউ ওকে হারাতে পারবে না, এমন কথা আমি বলব না। কিন্তু আমাকে সময় দিন–আরও সময় দিন!

নীরবে বসে রইলাম আমরা প্রত্যেকেই কয়েক মিনিট। শার্লক হোমস কিন্তু চেয়ে রইল দুরের পানে–সাংঘাতিক ওই চোখজোড়ায় চূড়ান্ত চাহনি দিয়ে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলতে চাইল দূরবিস্তৃত প্রহেলিকার দুর্ভেদ্য অবগুণ্ঠন।